রাইফেল, রোটি, আওরাত
আনোয়ার পাশা

রাইফেল, রোটি, আওরাত

আনোয়ার পাশা

স্টুডেন্ট ওয়েজ
বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশনার ছয় দশকে
স্টুডেন্ট ওয়েজ

প্রকাশক
মোহাম্মদ লিয়াকতউল্লাহ
স্টুডেন্ট ওয়েজ
'লিয়াকত প্লাজা'
৯ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
দূরালাপ : [+৮৮] ০২৭১২১ ৫৬৮
ই-মেইল : studentways@hotmail.com
ওয়েব : www.studentways.info

প্রথম প্রকাশ
জুন, ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ

চতুর্থ সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
কাইয়ুম চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস
হৃদয় কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে
মৌমিতা প্রিন্টার্স
প্যারীদাস রোড ঢাকা ১১০০

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা

ISBN : 978 984 406 621 2

RIFEL ROTI AURAT : A Bengali Novel by Shaheed Anwar Pasha. Assistant Professor of Bengali University of Dhaka. Dhaka during the period of independence war of bangladesh in 1971. The writer was brutally killed by the pakistani collaborators on the 14th December 1971. Published by Mohammad Liaquatullah of Student Ways. 9 Banglabazar, Dhaka-1100. Fourth Edition February Two thousand Twelve. Price: Taka Two Hundred Fifty only.

ভূমিকা

মানুষ এবং পশুর মধ্যে বড় একটা পার্থক্য হচ্ছে, পশু একমাত্র বর্তমানকেই দেখে, মানুষ দেখে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে এক সঙ্গে বিবেচনা করে। যখন কোন ব্যক্তি এবং সমাজ একমাত্র বর্তমানের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকে তখন সর্বনাশের ইশারা প্রকট হতে থাকে।

বাঙালির সুদীর্ঘ ইতিহাসের বোধ করি সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় হচ্ছে তার সংগ্রামের কালগুলো। এবং এক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম ঘটনা হচ্ছে, ১৯৭১-এ পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অসাধারণ লড়াই। এ ছিল সমগ্র জাতির একতাবদ্ধ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম। আমাদের পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য, আমাদের বর্তমানের গৌরব এবং আমাদের ভবিষ্যতের প্রেরণা বাঙালির এ সংগ্রামের ইতিহাস।

অত্যন্ত শঙ্কিত চিত্তে লক্ষ্য করার মত ব্যাপার হচ্ছে, আমরা এটাকে যেন ভুলে যেতে বসেছি। যেসব লক্ষ্য নিয়ে আমাদের লড়াই তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যর্থতা থেকেই এ বিস্মৃতির সূত্রপাত হচ্ছে। কিন্তু ব্যর্থ বর্তমান তো কোন জাতিরই চিরকালের সত্য ইতিহাস নয়, সত্য অনুভূতিও নয়। যে আবেগ এবং অনুভূতি চক্রান্তের ধূর্তচক্রে আচ্ছন্ন হচ্ছে, তাকে উজ্জীবিত করার জন্যই দরকার সংগ্রামের কালের মানুষের মহান ত্যাগ এবং নিষ্ঠাকে বারংবার স্মরণ করা। তার থেকেই আসবে কুশায়াকে দূর করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। আমাদের চিত্তের পবিত্রতা রক্ষা পাবে।

সেকালের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে বসে লেখা আমাদের সমগ্র ইতিহাসে একটি মাত্র উপন্যাসই পাওয়া যায়—এ উপন্যাসই হচ্ছে "রাইফেল রোটি আওরাত"। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাস এর রচনাকাল। লেখক শহীদ আনোয়ার পাশা নিহত হলেন ১৯৭১ সালেরই ১৪ই ডিসেম্বর। স্বাধীনতা লাভের মাত্র দু'দিন আগে তিনি যে অমর কাহিনী উপন্যাসে বিধৃত করেছেন নিজেই হয়ে গেলেন তারই অঙ্গ চিরকালের জন্য।

আনোয়ার পাশার উপন্যাসটি একদিক দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বসে একজনের প্রতিটি মুহূর্তের কাহিনী। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে সৃষ্ট এ শিল্পকর্ম কতটা সত্যনিষ্ঠা লেখকের জীবনের পরিণতিই তার মহান সাক্ষ্য হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—জীবনে জীবন যোগ করা

না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

আনোয়ার পাশার উপন্যাস, তাঁর শেষ উচ্চারণ ঃ "নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভা। সে আর কতো দূরে। বেশি দূর হতে পারে না। মাত্র এই রাতটুকু তো। মা ভৈঃ। কেটে যাবে।" তাঁর এবং আমাদের সকলের কামনা ও প্রত্যাশারই অভিব্যক্তি। শিল্পী তাঁর জীবনকে আমাদের জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। 'রাইফেল রোটি আওরাত' আনোয়ার পাশার শহীদ আত্মার আকাঙ্ক্ষাকেই যেন আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে চলেছে নিরন্তর এবং অম্লান।

কাজী আবদুল মান্নান

বৈশাখ, ১৩৯৪
রাজশাহী।

প রি চি তি

এ গ্রন্থের লেখক আনোয়ার পাশা আজ আমাদের মধ্যে নেই, হারিয়ে গেছেন তিনি চিরকালের জন্য। অসহ্য এক বেদনার ভার বুকে নিয়ে তার নামের আগে এখন কিনা যোগ করতে হচ্ছে 'শহীদ' কথাটা। আনোয়ার পাশাত শহীদ হতে চাননি, অমন 'পবিত্র' শব্দাবলীর প্রতি তাঁর বিন্দু মাত্রও লোভ ছিল না। জীবনকে তিনি ভালোবাসতেন, তাঁর সমস্ত ভালোবাসা নিবেদিত ছিল জীবন আর শিল্পের প্রতি। তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে জীবন প্রেমিক শিল্পী। জীবনকে ভালোবাসা ছাড়া শিল্পী হওয়া যায় না এ তিনি জানতেন, মানতেনও। চেয়েছিলেন জীবনকে সুন্দর করে গড়তে এবং সে সঙ্গে শিল্পোত্তীর্ণ করে প্রকাশ করতে—এ ছিল তার জীবনের ব্রত। আনোয়ার পাশা বাঁচতে চেয়েছিলেন শিল্পী হিসেবে। জীবনের সে দুর্মর পিপাসা, তার আকুল ব্যাকুলতা তার এ অন্তিম রচনায়ও ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে এ অসামান্য বইটি তিনি লিখে রেখে গেছেন আমরা যারা বেঁচে আছি তাদের জন্য। মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মৃত্যু-বিভীষিকার এমন ছবি আঁকা সত্যই দুঃসাধ্য। আনোয়ার পাশা তেমন এক দুঃসাধ্য কাজ করে গেছেন। তাঁর শিল্পী-প্রতিভার এ এক নিঃসন্দেহ প্রমাণ। বাংলাদেশের মাটিতে আগামীতে যারা জন্মগ্রহণ করবে, তারা এ দেশের ইতিহাসের এক দুঃসহ ও নৃশংসতম অধ্যায়ের এ নির্ভেজাল দলিল পাঠ করে নিঃসন্দেহে শিউরে উঠবে। অবশ্য সে সঙ্গে আত্মত্যাগ আর দেশপ্রেমের নজীরহীন দৃষ্টান্তে সগৌরব আনন্দও যে তারা বোধ করবে তাতেও সন্দেহ নেই। নিজের দেশ আর দেশের মানুষের সম্বন্ধে তাদের আস্থা, এ বই পড়ার পর দৃঢ়তর না হয়ে পারে না।

এ শুধু একাত্তরের বাংলাদেশের হাহাকারের চিত্র নয়, তার দীপ্ত যৌবনেরও এ এক প্রতিচ্ছবি। এ গ্রন্থের নায়ক সুদীপ্ত শাহিন বাংলাদেশ আর বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প-প্রত্যয় আর স্বপ্ন-কল্পনারই যেন প্রতীক। একাত্তরের মার্চের সে ভয়াবহ ক'টা দিন আর এপ্রিলের প্রথমার্ধের কালো দিনগুলির মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ পরিধিটুকুতেই এ বই-র ঘটনাপ্রবাহ সীমিত, কিন্তু এর আবেদন আর দিগন্ত এ সময়-সীমার আগে ও পরে বহু দূর বিস্তৃত। বাঙালির দুঃখ-বেদনা আর আশা-এষণার এ এমন এক শিল্পরূপ যা সব সময় সীমাকে ডিঙিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী অপরূপ সাহিত্য-কর্ম হয়ে উঠেছে।

ভেবে অবাক হতে হয় নির্মম ঘটনাবলীর উত্তপ্ত কড়াইয়ের ভিতর থেকেও লেখক কি করে তার উর্ধ্বে উঠে এতখানি নির্লিপ্ত হতে পারলেন। রাখতে পারলেন মনকে সংযত ও সংহত যা শিল্পীর জন্য অপরিহার্য। সদ্য এবং সাক্ষাৎ ঘটনার এমন অপরূপ শিল্পরূপ কদাচিৎ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ যে একবার লিখেছিলেনঃ "কোন সদ্য আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে তখন যে লেখা ভালো হইবে এমন কোন কথা নাই। তখন গদগদ বাক্যের পালা।" সুখের বিষয় আনোয়ার পাশার এই বই কোন অর্থেই 'গদগদ বাক্যের পালা' হয় নি। এ এক সংহত সংযত, নির্লিপ্ত শিল্পী মনেরই যেন উৎসারণ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এ সাবধান বাণীটুকুও উচ্চারণ করেছিলেনঃ "প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে—কিছু পরিমাণে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা আপনার জায়গাটি পায় না।" কথাটা সত্য, কিন্তু আনোয়ার পাশা এ আশ্চর্য দক্ষতায় এ সত্যকে অন্তত এ গ্রন্থে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছেন। 'প্রত্যক্ষের জবরদস্তির' শিকার তিনি হন নি, সে জবরদস্তির শাসন কাটিয়ে তিনি তাঁর শিল্পী-কল্পনার যথাযথ স্থান খুঁজে নিতে পেরেছেন এ বইতে। চোখের সামনে ঘটা

টাটকা ঘটনাবলীর উত্তাপ তাঁর শিল্প-সত্তাকে কেন্দ্রচ্যুত করেনি কোথাও, লেখকের জন্য এর চেয়ে প্রশংসার কথা আর হতে পারে না।

উচ্চতর শিল্প-কর্মের জন্য স্থান-কালের দূরত্বের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। আশ্চর্য, আনোয়ার পাশার জন্য তার প্রয়োজন হয় নি। যথার্থ শিল্পী বলেই এ হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ঘটনাকে ছাড়িয়ে পৌঁছতে পেরেছেন ঘটনার মর্মলোকে।

এ তাঁর শেষ বই, জীবনের শেষ বই—প্রত্যক্ষ আর সাক্ষাৎ ঘটনাবলীকে তিনি উপন্যাসের রূপ দিয়েছেন এ গ্রন্থে। ঢাকায়, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে, যে বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের সব রকম প্রগতি আন্দোলনের উৎস, তার এমন নিখুঁত ছবি, এমন শিল্পোত্তীর্ণ রূপায়ণ আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ইতিহাসের দিক দিয়েও এ বই-এর মূল্য অপরিসীম।

এ বই-র ভাষা আর রচনাশৈলী এমন এক আশ্চর্য শিল্পরূপ পেয়েছে যে পড়তে বসে কোথাও থামা যায় না। এ কারণেও, আমার বিশ্বাস বইটি দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আনোয়ার পাশার জন্ম পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায়। লেখাপড়া করেছেন উভয় বঙ্গে। তিনি বি. এ. পাস করেছেন রাজশাহী কলেজ থেকে এবং বাংলায় এম. এ. পাস করেছেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। জীবিকার জন্য বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতা। বেশ কয়েক বছর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা করার পর চলে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিবেদিত, পরিশ্রমী ও দক্ষ শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম শুনেছি অনেকেরই মুখে। ছাত্র শিক্ষকদের কাছে তিনি শুধু প্রিয় ছিলেন না, শ্রদ্ধেয়ও। আজকের দিনে যা দুর্লভ সৌভাগ্য! শিক্ষকতার বাইরে তার প্রধানতম নেশা ছিল সাহিত্য। কবিতা আর গদ্যে তাঁর সমান দক্ষতা দেখে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারতাম না। সমালোচনায় তিনি যে অসাধারণ গ্রহণশীলতা আর বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তারও নজির খুব বেশি নেই। বিশেষ করে তাঁর 'রবীন্দ্র ছোট গল্প সমীক্ষা' আমাদের সামালোচনা সাহিত্যের মানকে যে উন্নত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। 'নীড় সন্ধানী' আর 'নিষুতি রাতের গাঁথা' নামে তার দুটি উপন্যাস আর 'নদী নিঃশেষিত হলে' নামে একটি কবিতার বই বহু আগেই প্রকাশিত হয়েছে। তদুপরি বহু পরিশ্রমে তিনি আমার মতো নগণ্য লেখকের উপরও একটি বড় বই লিখেছেন। এতে অন্য যা প্রমাণিত হোক না কেন, অন্তত স্বদেশের সাহিত্য আর সাহিত্যিকের প্রতি তাঁর যে আন্তরিক অনুরাগ আর আস্থা রয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি।

আলোচ্য গ্রন্থের আগাগোড়া যে স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন, যার প্রতীক্ষায় তিনি প্রহর গুণছিলেন, সে স্বাধীনতার শুভলগ্নের মাত্র দিন দুই আগে পাক হানাদারদের দোসরেরা নিজের পেশা আর আদর্শে আত্মনিবেদিত প্রাণ এ নিরলস শিল্পীকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তবুও মনে জিজ্ঞাসা জাগেঃ শিল্পীকে কি হত্যা করা যায়? যায়। শিল্পীকে হত্যা করা যায় কিন্তু শিল্পকে হত্যা করা যায় না। শিল্পকে হত্যা করা মানে মানুষের আত্মাকে হত্যা করা, তা করা দুনিয়ার কোন ঘাতকের পক্ষেই সম্ভব নয়। লাইফ ইজ সর্ট আর্ট ইজ লং—ঘাতকের অস্ত্র আনোয়ার পাশার মর-জীবনকে সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে সত্য কিন্তু তাঁর রচিত গ্রন্থের পাতায় পাতায় ফুল হয়ে ফুটে রয়েছে। তাকে হত্যা করবে কে? শিল্পীকে হত্যা করা যায়—শিল্পকে হত্যা করা যায় না তার অবিসম্বাদিত প্রমাণ এ বই — 'রাইফেল রোটি আওরাত'। এর প্রতি ছত্রে ঘাতকদের প্রতি ধিক্কার ধ্বনি যেমন আমরা

শুনতে পাই তেমনি শুনতে পাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্যের উদয় মুহূর্তে নব জীবনের আগমনীও।

"পুরোনো জীবনটা সেই পঁচিশের রাতেই লয় পেয়েছে। আহা তাই সত্য হোক। নতুন মানুষ নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাত। সে আর কত দূরে ? বেশি দূর হতে পারে না। মাত্র এ রাতটুকু তো। মা ভৈঃ। কেটে যাবে।"

এ অমোঘ ভবিষ্যৎ বাণীটি উচ্চারণ করেই তিনি তাঁর জীবনের শেষ লেখাটি শেষ করেছেন। যে নব প্রভাতের জন্য এত দুর্ভোগ, এত আশা, এতখানি ব্যাকুল প্রতীক্ষা তা সত্য সত্যই এলো কিন্তু আনোয়ার পাশা তা দেখে যেতে পারলেন না। তাঁর অন্তিম রচনার সঙ্গে দেশবাসীর এ বেদনাটুকুও যুক্ত হয়ে থাক।

এ বই একাধারে ঐতিহাসিক দলিল আর সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি। এ বই পড়ে অভিভূত হবেন না এমন পাঠক আমি কল্পনা করতে পারি না।

সাহিত্য নিকেতন
চট্টগ্রাম।

আবুল ফজল
২৮শে মে, ১৯৭৩

প্র কা শ কে র ক থা

শহীদ আনোয়ার পাশা ১৩৩৫ সালের ২রা বৈশাখ মুর্শিদাবাদ জেলার কাজী শাহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বাংলায় এম. এ. পাস করেন। ঐ বছরেই তিনি নদীয়া জেলার পালিতবেঘিয়া গ্রামের জনাব হেকমত আলী মণ্ডলের কন্যা মসিনা বেগমকে বিয়ে করেন।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২রা মার্চ পাশা সাহেব পাবনা জেলার এডওয়ার্ড কলেজে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন এবং শহীদ হওয়ার আগে পর্যন্ত ঐ বিভাগেই অধ্যাপনা করে গেছেন। কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, সমালোচনা প্রভৃতি সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে তিনি আমৃত্যু অনলস লেখনী চালনা করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তিনি আল-বদর বাহিনী কর্তৃক অপহৃত ও নিহত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর। তিনি স্ত্রী এবং দুই ছেলে রেখে গেছেন। এদের নাম মাসারুল আফতাব ও রবিউল আফতাব।

"রাইফেল রোটি আওরাত" উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে জুন মাস। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা এবং একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাসও রচনা করেন।

আমাদের জন্য এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য "রাইফেল রোটি আওরাত" একটি অতি মূল্যবান দলিল। এ গ্রন্থ প্রকাশনার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। মহান আল্লার কাছে আমি তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

বাংলাদেশে নামল ভোর। ভোরেই ঘুম ভাঙ্গে সুদীপ্তর। আজো তার ব্যতিক্রম হ'ল না। হ'তে পারতো। কতো রাত অবধি ঘুম হয় নি। আজো তো সারারাতেই মাঝে মাঝেই গুলির আওয়াজ শোনা গেছে। আর ভয় হয়েছে। মৃত্যুভয় নয়। মৃত্যুকে ভয় আর লাগে না। তবে যদি বেঁচে থাকতে হয় তখন? এমনি আগুন আর গুলি-গোলা নিয়ে কি মানুষ বাঁচে। অতএব এলোমেলো নানা চিন্তা হয়েছিলো মনে, ঘুম এসেছিলো অনেক দেরিতে। ঘুমের আর দোষ কি? শুধুই আগুন আর গুলি-গোলা আর আতঙ্ক? এর কোনোটা না থাকলেও তো নতুন জায়গায় সহসা ঘুম আসার কথা নয়। তবু সুদীপ্তর ঘুমের ব্যাঘাত যেটুকু হয়েছিলো তা ঐ গুলি-গোলার জন্যই। নতুন জায়গার কথা মনেই ছিলো না। সে কথা মনে হ'ল এখন, ঘুম ভাঙ্গার পর। তেইশ নম্বরের সেই পরিচিত মুখ চোখে পড়ল না। সেই সাজানো বইয়ের শেল্‌ফগুলি, সেই টেবিল-চেয়ার-আলনা—কেউ একটি নতুন দিনের সূচনায় সুদীপ্তকে অভ্যর্থনা জানাল না। অবশ্যই তাদের মুখ মনে পড়ল সুদীপ্তর। এবং মনে পড়ল ফিরোজের কথা। তিনি এখন বন্ধু ফিরোজের বাড়িতে। মহীউদ্দিন ফিরোজ। এককালে পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় নামটি চালু ছিল। কবিতা লিখতেন।

এই প্রথম রাত্রি তাঁর কাটল বন্ধুর বাড়িতে। উনিশ শো একাত্তর খৃষ্টাব্দের সাতাশে মার্চের দিনগত রাত্রি পার হয়ে আটাশে মার্চের ভোরে এসে পৌঁছলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন। ঠিক এর আগের দু'টো রাত? পঁচিশ ও ছাব্বিশ তারিখের দিন পেরিয়ে যে-দুই রাতের সূচনা হয়েছিলো তাদের কথা সুদীপ্ত স্মরণ করলেন। সে কি মাত্র দু'টো রাত। দু'টো যুগ যেন। পাকিস্তানের দুই যুগের সারমর্ম। বাংলাদেশ সম্পর্কে পাকিস্তানীদের বিগত দুই যুগের মনোভাবের সংহত প্রকাশমূর্তি। শাসন ও শোষণ। যে কোন প্রকারে বাংলাকে শাসনে রাখ, শোষণ কর। শোষণে অসুবিধা হ'লে? শাসন তীব্র কর। আরো তীব্র শাসন। আইনের শাসন যদি না চলে? চালাও রাইফেলের শাসন, কামান-মেশিনগানের শাসন। কামান-মেশিনগানের সেই প্রচন্ড শাসনের রাতেও তিনি বেঁচে ছিলেন।

আশ্চর্য, এখনো তিনি বেঁচে আছেন। কিন্তু ম'রে যেতে পারতেন।

অনেকেই অনেক কাজ আমরা পারি নে। যেমন ইচ্ছে করলেই সুদীপ্ত সি. এস. পি. হতে পারতেন না। ব্যবসায়ে নেমে বড়ো লোক হ'তেই কি পারতেন? না। অনেকে এমন কি একটা বিয়ে করতেও পারে না। তবে ঐ একটা ব্যাপার আছে যা সকলের জন্যই নিশ্চিত—সকলেই মরে। তাই সুদীপ্ত ভাবতেন—একটা কাজ সকলেই পারে, সকলেই মরে। একটুও চেষ্টা করতে হয় না—দিব্যি খেয়ে দেয়ে ফূর্তি ক'রে বেড়াও, একবারও কিছু ভাববার দরকার পর্যন্ত নেই, অথচ সেই কাজটি এক সময় নির্ঘাৎ সম্পন্ন ক'রে ফেলবে তুমি! কেমন দিব্যি তুমি ম'রে যাবে। তোমার আত্মীয় বন্ধুদের সামনে তখন অনেকগুলো কাজ এসে পড়বে। কাফন-দাফন, ফাতেয়াখানি, শোক-প্রকাশ, গুণকীর্তন, শেষাবধি তোমার পরিত্যক্ত বিষয় সম্পদের হিসেব-নিকেশ–কতো কাজ। কিছুদিন অন্ততঃ তোমার প্রিয়জনদের কাজ নেই ব'লে আফসোস করার কিছুই থাকবে না। তুমি একাই অনেক কটি চিত্তকে কয়েকটা দিন আচ্ছন্ন ক'রে থাকবে। এতো সব তোমার দ্বারা সম্ভব হবে সেরেফ্ বিনা চেষ্টায়।

কিন্তু না। সুদীপ্তর এতো সব ধারণা সেদিন মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিলো। মৃত্যু অত্যন্ত সহজ এবং স্পর্শযোগ্য ছিল, তা হ'লেও সেদিন তাঁর মৃত্যু হয় নি। কেন তিনি মরলেন না, তিনি জানেন না। অমন সহজ মৃত্যুটি তাঁর ভাগ্যে ছিল না বোধ হয়। কত হাজার হাজার লোক সেদিন কত সহজে কাজটি করতে পারল—পারলেন না সুদীপ্ত। তিনি মরতে পারলেন না। অতএব সুদীপ্তকে এখন ভাবতেই হচ্ছে—ম'রে যাওয়াটা অত সহজ নয়।

সহজ নয়? সুফিয়া মরে নি? তোমার হাজার হাজার ভাই বন্ধু সেদিন কেমন ক'রে ম'রে গেল তুমি দেখ নি? হ্যাঁ, তিনি দেখেছেন। কিন্তু নিজের জীবনে তো এটাও তিনি দেখলেন যে, ম'রে যাওয়া অত সোজা নয়। মেরে ফেলা তো আরো কঠিন। তুমি কাকে মারবে? বিশ্বাসকে কখনো মারা যায় না। হ্যাঁ তো, সহস্র প্রাণের সেই দীপ্ত পাপড়ি—সেই প্রেম—ভালোবাসা–বিশ্বাস—এক চুলও মরেনি।

এবং মরেন নি সুদীপ্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ঐ নামের কোনো অধ্যাপক আছেন নাকি! কখনো ছিলেন না।

হাঁ ছিলেন না। এবং নেই, তাও ঠিক। তবে এ-ও ঠিক যে, সুদীপ্ত শাহিন নামে যে ভদ্রলোক বন্ধু মহলে পরিচিত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক এবং ইংরেজি বিভাগেই। কিন্তু অন্য নামে। কেননা পাক ওয়াতানে ওই নাম চলে না। সুদীপ্ত শাহিন!—এই নাম নিয়ে বহাল তবিয়তে বিরাজিত থাকবেন পাক ওয়াতানে? এই জন্যেই পাকিস্তান বানানো হয়েছিলো নাকি! ও সব চলবে না।

সুদীপ্ত শাহিন নাম পাকিস্তানে চলবে না। পাকিস্তানে পা দিয়ে কিছু দিনের

মধ্যেই সুদীপ্ত কথাটা বুঝেছিলেন। পঞ্চাশের দাঙ্গার পর পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে ঢাকায় এসেছিলেন সুদীপ্ত। প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন এবং তাঁর দল মুসলিম লীগ তখন বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাচ্ছিলেন।

একটা পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল বটে উনিশ শো সাত-চল্লিশের চৌদ্দই আগষ্ট। সেটা পাকিস্তানের রাজনৈতিক সত্তা, সেটা দেহ। রাষ্ট্রের প্রাণ হচ্ছে তার অর্থনীতি, এবং তাঁর চিন্ময় সত্তার অভিব্যক্তি সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্যে। ঐখানেই ছিল গন্ডগোল। হাজার মাইলের ব্যবধানে বিরাজিত দু'টো অংশের মধ্যে একটা অর্থনীতি গ'ড়ে উঠলে তাতে একটা অংশের দ্বারা অন্য অংশের শোষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেই,—অর্থনীতির ক্ষেত্রে একাংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে অন্য অংশের উপর। মুসলিম লীগ প্রাণপনে সেই অর্থনীতিক প্রাধান্য দেশের পশ্চিমাংশে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগেছিল। মুসলমান হিসেবে সেইটেই কর্তব্য ব'লে বিবেচিত হয়েছিল তাঁদের কাছে। কেননা মুসলমানের দৃষ্টি সব সময়ে হ'তে হবে কেবলাহ্‌মুখি, আমাদের কেবলাহ্‌ পশ্চিমদিকে। অতএব দেশের পশ্চিমাংশ অধিকতর পবিত্র অংশ। সেটা যে কা'বাশরীফের নিকটতর এটা তো অস্বীকার করতে পারে না। মুসলিম লীগ বাংলার নাদান মুসলমানদের দৃষ্টি পশ্চিমমুখি করার জন্যে দেশের আর্থনীতিক প্রাণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন পশ্চিম পাকিস্তানে। আর বাঙলার গঞ্জে, রেল ষ্টেশনে সর্বত্র তারা একটা ক'রে দিকনির্দেশক খুঁটি পুঁতে দেয়, তার তীরের মতো ছুঁচলো মুখটা থাকে পশ্চিম দিকে—তাতে উর্দু ও বাংলা হরফে লেখা 'কেবলাহ্‌'। তোমরা কেবলাহ্‌মুখি হও। কেবল অর্থনীতি ক্ষেত্রেই নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এতো বিশাল ব্যবধানে অবস্থিত ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন দু'টি দেশের একই সংস্কৃতি কোনো বাতুলেও চিন্তা করবে না। কিন্তু, একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আমরা—এ কথা সত্য না হ'লে পাকিস্তানের চিন্ময় সত্তার অস্তিত্ব থাকে কোথায়? লোকে শুনলে বলবে কী? অতএব বল, আমাদের সাংস্কৃতিক সত্তা অভিন্ন। এক ধর্ম, এক ধ্যান, এক প্রাণ, এক ভাষা। এ সব না হ'লে একটা আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্র হয় কী করে? অপূর্ব সব কান্ড সুদীপ্ত দেখেছিলেন প্রথম পাকিস্তানে এসে। হাজার মাইলের ব্যবধানে দুটি দেশকে সর্বাংশে এক ক'রে তোলার জন্য একটা দেশের আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে মুছে ফেলার চক্রান্ত তখন সবে শুরু করেছে মুসলিম লীগ সরকার, সেই তখনি সুদীপ্ত এসেছেন পাকিস্তান। হয়ে গেল একুশ বছর। সেদিনের সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুরা আজ অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীপ্তর ছাত্র।

ছাত্র অবস্থায় সুদীপ্তর অসুবিধা খুব একটা হয় নি। হ'তে পারত। তখনি কথাটা উঠতে পারত—সুদীপ্ত শাহিন নাম মুসলিম সমাজে চলবে না। কিন্তু সে সময় ইংরেজি বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল একজন ইংরেজ অধ্যাপিকার উপর। ইংরেজ অধ্যাপিকা পাকিস্তানের রহস্য ঠিক জানতেন না। অতএব সুদীপ্ত

ইংরেজি বিভাগের ছাত্র হ'তে পেরেছিলেন। এবং এম. এ. ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে কিছুকাল একটা ইংরেজি পত্রিকায় চাকরিও করেছিলেন। তার পরেই শুরু হয়েছিল সেই কান্ডটা। পাস করে সুদীপ্ত কলেজে চাকরির চেষ্টা করলে তখনি উঠেছিল কথাটা—

'আপনি সুদীপ্ত শাহিন? এমন নাম তো শুনি নি।'

না শুনে থাকলে এখন শোন—বলতে ইচ্ছে করেছিল সুদীপ্তর। কিন্তু বলেন নি। কারণ চাকরিটার দরকার ছিল তাঁর। অতএব ঐ বেয়াড়া প্রশ্নটাকে তিনি হজম করেছিলেন। তবু রেহাই মেলে নি। আবার একটা প্রশ্ন হয়েছিল—

'কি জাতের মানুষ? হিন্দু? না ক্রিশ্চান?'

'আমার দরখাস্তেই সে কথার উল্লেখ আছে।'

খুব ছোট ক'রে একটা উত্তর দিয়ে সুদীপ্ত থেমেছিলেন। কিন্তু সে কথায় প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো অনেকখানি—

'মনে তো লয় যে, দরখাস্তে আপনি মিছা কথা বানাইছেন। সুদীপ্ত কি কখনো মুসলমানের নাম হয়?'

কথা হচ্ছিল ইন্টারভিউয়ের সময়। ইন্টারভিউ বোর্ডের অন্য এক সদস্য দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—

'সুদীপ্ত কথাডার মানেডা কি?'

ততক্ষণে সুদীপ্ত বুঝে ফেলেছেন তার চাকরিটা হচ্ছে না। তিনি বললেন–

"উত্তমরূপে দীপ্যমান যাহা।'

'এ তো তবে বাংলা কথা হৈল সাব। আপনি তবে হিন্দু হইবার চান?'

'কেন? হিন্দু হব কেন?'

'তা নয়ত কি হইবেন? বাংলা হৈলে তো সব হিন্দু হৈয়া গেল। আর হিন্দু হৈলে দ্যাশও তো হিন্দুস্তান হৈয়া যাইব। আপনারা পাকিস্তানে সব হিন্দুস্তানের চর আইছেন।'

'ঠিক কইছ হাওলাদার বাই। এই যে ভাষা-আন্দোলন হৈল, এ সব তো এনাদের জন্যই। এনারাই আমাগো ছাওয়ালদের মাথা বিগরাইয়া দিছে।'

মাথা বিগড়ে গিয়েছিল সুদীপ্তরও। পর পর তিনবার ইন্টারভিউ দেবার সময় প্রতিবারই নামের জন্য নিন্দা হ'ল তার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি তিনি পেলেন। ঢাকা থেকে বহু দূরের একটি মফঃস্বল কলেজে কোনো ইংরেজির অধ্যাপক পাওয়া যায় না। সেখানেই সুদীপ্তর অধ্যাপক জীবনের সূত্রপাত। সেই কবে ১৯৫৩-র কথা সেটা। আজ সুদীপ্ত সুদীর্ঘ আঠারো বছরের অভিজ্ঞ অধ্যাপক। ধাপে ধাপে উন্নতিও অনেক হয়েছে তার। সেই মফঃস্বল কলেজ থেকে ঢাকা শহরের জগন্নাথ কলেজ। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

একটা যেন নেশায় পেয়ে বসেছিল সুদীপ্তকে। উপরে উঠার নেশা। আরো উপরে। আরো উপরের নেশা সংক্রামক। ঐ সংক্রামক নেশাটা ক্রমে ক্রমে

তখন সারা পাকিস্তানকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। সদ্য তখন হিন্দু মধ্যবিত্তের একটা বিপুল অংশ দেশ ত্যাগ ক'রে চলে গেছেন। মাঠ ফাঁকা। ফাঁকা মাঠে গোল দিতে পারলে কে আর কষ্ট ক'রে খেলা শেখে? এবং কোন খেলা না শিখেই খেলায় জয়লাভ চাইলে চরিত্র হারাতে হয়। চরিত্রহীনের সম্বল তোষামোদ, আর দালালি। পাকিস্তানে এখন দালালির জয়জয়াকার, প্রচন্ড নির্লজ্জ দালালি—তোষামোদ আর উৎকোচ। সুদীপ্তর এখন প্রবল আফসোস হয়। তিনি কেবলি কবিতা লিখতে শিখেছিলেন। গল্প লিখতে পারলে? তোষামোদ ও দালালির যতো বিচিত্র চেহারা তিনি দেখেছেন তা সব যদি তিনি গল্পে লিখতে পারতেন। বিশ্ব সাহিত্যে তার দ্বিতীয় মেলা ভার হ'ত। বেশি দূরে যাবার দরকার তাঁর ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কয়েক জন সহকর্মীর জীবনবৃত্ত নিছক ইতিহাসের মতো ব'লে গেলেও বিস্ময়কর উপন্যাসের কাহিনী হয়ে যাবে। সবি জানেন সুদীপ্ত। কিন্তু উপায় নেই। তিনি গল্প কিংবা উপন্যাস লিখতে পারেন না।

দালালিও পারেন না। তবে একটি কাজ তিনি করেছিলেন। তা করেছিলেন ঐ উন্নতির নেশাতেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে ঢোকার জন্য এফিডেভিট ক'রে নাম পালটিয়েছিলেন। কিন্তু তা কেবল ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতাপত্রের জন্যেই। অন্য সর্বত্রই তিনি এখনো সুদীপ্ত শাহিনই আছেন। ঐ নামেই এখনো কবিতা লেখেন।

পাক মুলুকে তরক্কির জন্য সুদীপ্তকে নাম লুকোতে হয়েছিল। এবং সেই রাতে বাঁচার জন্য লুকোতে হয়েছিল খাটের নীচে। কখনো খুব একজন সাহসী ব'লে সুনাম ছিল না সুদীপ্তর। তা হ'লেও জীবনে কখনো খাটের নিচে শুয়েছেন এমন কোন দ্বিতীয় উদাহরণ সুদীপ্তর জীবনে নেই। ভয়ের রাত কখনো কি তাঁর জীবনে আসে নি? সেই পঞ্চাশের দাঙ্গায়? না। সেদিন তাঁদের পাড়া আক্রান্ত হ'লে কোন অন্ধকার কোণে লুকোবার কথা মনে হয়নি তো। বরং মনে পড়েছিল বন্ধুদের কথা। সেদিন তাই বন্ধু-গৃহের আশ্রয় প্রত্যাশায় পথে বেরিয়েছিলেন তাঁরা। এবং আশ্রয় পেয়েছিলেন। কিন্তু এবার ? এবারও সুদীপ্ত সেই কালো রাতে কোন বন্ধুর মুখ মনে করতে চেষ্টা করেছিলেন। কোন বন্ধুর উজ্জ্বল প্রীতি সেই রাতের ভয়ের মুখ ফ্যাকাশে ক'রে দেবে—এমন একটা

আশাকে লালন করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু কোনো আশা সেই রাতের ত্রিসীমানা ঘেঁসতে সাহস করে নি। কেউ আশা করেনি যে, ছাব্বিশে মার্চের সূর্যোদয় দেখবার জন্য এই রাতটুকু সে বেঁচে থাকবে। তবু অনেকে বেঁচে ছিল। এবং অনেকেই যে বেঁচে আছেন সেটা সুদীপ্তর কাছে পরম বিস্ময় ব'লে মনে হয়েছিল। অনেকে যাঁরা মরেছিলেন তাঁরা যেন খুব স্বাভাবিক একটি কর্ম করেছেন। অতএব সকলেই তাঁদের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত অসাড়তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু জীবিতদের নিয়ে বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।

'আপনি বেঁচে আছেন!'

'ভাই আল্লাহ্ বাঁচিয়েছেন। আপনি?'

'আমাদের বিল্ডিংয়ে পাঁচজন গেছেন। আমি যে কী ক'রে বাঁচলাম আল্লাহ্ জানে।'

সুদীপ্তর এখনো মন হয়, কি ক'রে তিনি যে বেঁচে আছেন তা তিনি জানেন না। আল্লাহ্ জানেন। তবে হাঁ, যাঁরা ম'রে গেছেন, তাঁরা ঠিকই গেছেন, ওটা কোনো সংবাদ নয়।

সংবাদ হয় কোন্‌টা? স্বাভাবিক ঘটনাধারার মধ্যে যেটা খাপ খায় না, যা হয় কিছুটা অস্বাভাবিক কিংবা সাধারণের গন্ডিকে যা অতিক্রম করে তাকেই মানুষ গ্রহণ করে একটা সংবাদ ব'লে। কিন্তু সেই পঁচিশের রাত থেকে মৃত্যুটা কি কোনো সংবাদ? মৃত্যু এখন তো অতি সাধারণ অতি স্বাভাবিক আটপৌরে একটি ঘটনা মাত্র। অমন যে অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব বা অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মারা গেলেন, নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন, অন্য সময় হ'লে তা খবরের কাগজের কতো বড়ো একটা খবর হ'ত ভাবুন দেখি!

সুদীপ্ত পাশ ফিরে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'তে চেষ্টা করলেন। চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। একে একে কয়েকটি মুখ এসে দাঁড়াল সুদীপ্তর সামনে—তাঁর শিক্ষক এবং পরে সহকর্মী অধ্যাপক ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, তেইশ নম্বর বিল্ডিংয়ে তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী ডঃ ফজলুর রহমান, বন্ধু প্রতিম ডঃ মুকতাদির। ডঃ মুকতাদিরের সংঙ্গে পরিচয় খুব দীর্ঘ দিনের নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবে আড্ডা দিতে গিয়ে পরিচয়। ভারি সুন্দর একটি মন ছিল ভদ্রলোকের। এমন মানুষকেও মারে! কিন্তু কাকে মারাটাই বা ঠিক হয়েছে। ঐ ভাবে নৃশংস সৈনিকের হাতে পরম শত্রুর মৃত্যুও তো মানুষ কামনা করে না। ছী-ছি তারা কি মানুষ যারা ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবকেও গুলি ক'রে মারে।

সেই মহিলাকে ফিরোজ নাকি দেখেছেন কাল। ফিরোজ গিয়েছিলেন মেডিক্যাল কলেজে। তার দলের এক ভদ্রলোককে পৌছে দিতে গিয়েছিলেন। এবং সেই সঙ্গে দেখতে। কিন্তু বেশি কিছু দেখা হয়নি কাল। মেডিক্যাল কলেজ থেকে গিয়েছিলেন গুলিস্তান পর্যন্ত, অতঃপর ঐ পথেই ফিরে এসেছেন।

পথের দু'পাশে বহু মৃতদেহ তখনও ছিল। এবং সেই সকল মৃতদেহের পাশ মাড়িয়ে চলেছে জীবিতদের মিছিল। কোনমতে কপালের গুণে যারা বেঁচে গেছে সেই সকল জীবিত হতভাগ্যের দল। সেই জীবিতদের মধ্যেই একজন ছিল সেই শিশুটি। বয়স হবে বছর খানেক। তার কাহিনী কাউকে বলা যায়! সুদীপ্তর কাছে বলতে গিয়ে ফিরোজ তো কেঁদেই ফেলেছিলেন। একটা বড়ো গাছের বিশাল গুঁড়ি প'ড়েছিল রাস্তার পাশে—সম্ভবতঃ ব্যারিকেড সৃষ্টির জন্যই ওটার আমদানি হয়ে থাকবে। সেই গুঁড়ির আড়ালে হয়ত লুকিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত অসহায় রমণী। হয়ত ঘরে আগুন জ্বললে পথের বুকে নিরাপত্তা সন্ধান করেছিলেন। বাঁচাতে চেয়েছিলেন বুকের শিশুকে। ফিরোজ দেখলেন, মৃত জননীর স্তন চুষে তখনও বাঁচতে চাইছে সেই অবোধ অলৌকিকভাবে বেঁচে-থাকা শিশু। এ ঘটনা ফিরতি পথের। যাবার পথে দেখেছিলেন সে মহিলাকে। কোলের একমাত্র শিশুকে বুকে চেপে পাশে একটা সুটকেশ এক হাতে ধ'রে রিক্সায় যাচ্ছিলেন এক ভদ্রমহিলা। ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবের বিধবা পুত্রবধূ। চিরকুমার ডঃ দেবের পালিত পুত্রের স্ত্রী। কলি যুগের দেবতা দেখতে চাও? ডঃ দেবকে দেখ। একজন প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কত উপার্জন ছিল তাঁর? যা ছিল তাঁর এক দশমাংশও বোধ হয় নিজের জন্য তাঁর খরচ হত না। বাকিটা? বাকি টাকা ব্যয় হত দান-ধ্যানে, এবং পালিত পুত্রদের পেছনে। বহু দরিদ্র সন্তানকে তিনি পালন করেছেন—তারা কেবলি যে হিন্দুই এমন নয়, হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদটা কি আর এযুগে মানবার বিষয়? বিনয়দা, সুতপাদি, সুকান্ত কিংবা মন্দিরাকে কখনো কি বিশেষভাবে কোনো ধর্মের লোক ব'লে সুদীপ্তর মনে হয়েছে? ডঃ দেব বিশেষ কোনো ধর্মের লোক ছিলেন না। বোধ হয়, সব ধর্মেরই লোক ছিলেন তিনি। মনে প্রাণে যিনি দার্শনিক, তিনি বিশেষ একটা ধর্ম বিশ্বাসের দ্বারা আবদ্ধ হবেন—এটা হয় কখনো?

'কী হে, ঘুম ভেঙ্গেছে?'

ফিরোজের সাড়া পাওয়া গেল। পাশের ঘরে সন্তানাদিসহ মহিলারা ছিলেন এবং এ ঘরে ছিলেন তারা দুই বন্ধু। ইচ্ছে ছিল, অনেক রাত অবধি দুই বন্ধুতে গল্প করবেন। কিন্তু গল্প জমে নি। গল্পের মেজাজ সুদীপ্তরও ছিল না। এবং সারা দিনের ক্লান্তিতে ফিরোজ অতি শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জাগলেন এখন। এবং জেগে উঠতেই কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল তাঁর। সুদীপ্ত ইতিবাচক সাড়া দিয়ে পরে শুধালেন—

'আচ্ছা, কাল তুমি যে ডঃ দেবের পুত্রবধূর কথা বলছিলে তুমি কি তাঁকে আগে থেকে চিনতে?'

'না। আমি চিনতাম না। আমার গাড়িতে যে ভদ্রলোক ছিলেন, তিনিই চিনিয়ে দিলেন। তাঁর এক বন্ধুর নাকি বোন। স্বামীর নাম মোহাম্মদ আলি

কিংবা ঠিক ঐ ধরনের কিছু একটা হবে। শুনেছিলাম, এখন মনে আসছে না।

অর্থাৎ মুসলমান। ডঃ দেবের মুসলমান পুত্রকে তাঁর সঙ্গে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছে পাকিস্তানি সৈন্যেরা। দুটি লাশ পাশাপাশি পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আর দেখা গেছে মধুবাবুর লাশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রিয় মধুদা। সুদীপ্তও ছাত্র জীবনের কথা স্মরণ করলে সেখানে মধুদার একটি উজ্জ্বল স্মৃতিকে বুকের মধ্যে লালিত দেখতে পান। জীবনের কতো আনন্দের, কতো বিষণ্নতার, কতো বিতর্কের স্মৃতি ঐ মধুদার ক্যান্টিন! সেই প্রিয় মধুদা। মধুদা, তোমাকে ওরা মারলে! কিন্তু কেন? পঁচিশের রাতে সুদীপ্তর বুকের মধ্যে লুকিয়েও যেন বেলা যথেষ্ট ভয় পাচ্ছিল। তখনি সেই কন্যার কণ্ঠে একটি প্রশ্ন শুনেছিলেন সুদীপ্ত, মর্মভেদী প্রশ্ন—আব্বা, ওরা আমাদের মারবে কেন? কন্যা-কণ্ঠের সেই প্রশ্নই আবার যেন সুদীপ্ত শুনতে পেলেন মধুদার কথা মনে হতেই—ওরা মধুদাকে মারবে কেন? হ্যাঁ রে অবোধ কন্যা, উত্তর একটাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ওরা ধ্বংস করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের যা কিছু প্রিয় সবি ওরা শেষ ক'রে দেবে। অন্ততঃ শেষ করতে চায়। মারতে চায়, ধ্বংস করতে চায়।

কেন করবে না শুনি! স্বাধীন চিন্তার নামে যতো সব ডেঁপোমি। ছেলে পড়াচ্ছ পড়াও। আমরা কি ভাবে শাসন করি, না করি তা নিয়ে তোমাদের ফাদারের কি? আমরা কোন্ দিক দিয়ে উড়োজাহাজ চালাই, কোন ঘাঁটি থেকে তেল নেই, সে আমরা বুঝব। সাহেবদের বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনে গিয়ে ধন্না দেওয়া হ'ল-মালদ্বীপ থেকে আমরা বিমানের জ্বালানি সংগ্রহ করতে পারব না। কী আবদার! বলি, দেশের ভালো মন্দ চিন্তাটা কি তোমাদের? না, আমাদের? কি বললে? দেশের ভাল-মন্দ তোমরাও বুঝতে চাও?

ঐ রোগেই তো মরেছে বাঙালি। বাবা, দেশের ভালো-মন্দ পশ্চিমা জওয়ানদের হাতে ছেড়ে দাও। আর নিজেরা ঘাস-বিচালি খেয়ে ঘুমাও, দেশের উন্নতির জন্য খুব ক'রে চা-পাট উৎপাদন কর, কিংবা ভদ্রলোক হ'লে দেশের সংহতি রক্ষার জন্য কাজ ক'রে বা থিসীস লিখে তমঘা নাও। এ সব পছন্দ না হ'লে? তোমাদেরকে ওরা মারবে। মারাটা তখন হবে জায়েজ।

এই সহজ কথাটি পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত অনেকেই জানতেন না।

মধুদা জানতেন না যে, ছাত্রদের প্রিয় হওয়া অপরাধের। শুধুই মধুদা কেন, পৃথিবীর কোন মানুষেরই তা জানার কথা নয়। মধুদার ঋণ আমরা কী করে শোধ করব! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই শুধু মধুদার কাছে ঋণী? আক্ষরিক অর্থে তাই! বহু ছাত্রই তাঁর ক্যান্টিনের ঋণ শোধ করতে পারে নি। কেউ কেউ তার মধ্যে ইচ্ছে করেও বটে। সব ছাত্রই কি ভাল থাকে। কিন্তু মধুদা সব ছাত্রকেই ভাল জানতেন। ছাত্রদের তিনি কি দৃষ্টিতে দেখতেন?

তোমরা দেশকে বাঁচাবে, আর আমি তোমাদের বাঁচাব না?

হ্যাঁ'তা বাঁচাতেই তো হবে। ছেলেরা তাকে মধুদা বলে না! দাদা তো ছোট ভাইদের ভালোবাসবেই। ছোট ভাইদের ছোট-খাটো অপরাধ কি ধরলে চলে?

না যদি চলে তা হ'লে তুমিই অপরাধী।

অতএব মধুদাকে মারতে হবে। আর ডঃ দেবকে? তিনি পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী নন। অতএব তাঁকেও মারতে হবে বৈ কি!

ডঃ দেব যে পাকিস্তান বিরোধী ছিলেন এমন কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের মুখেই শুনেছেন! তিনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডঃ আব্দুল খালেক। ডঃ খালেককে অবশ্য একটু চেনা কঠিন, কিন্তু মিঃ মালেকের ভাই বললে সকলেই তাকে চিনবে। স্ত্রীর অর্থে বিলেত গিয়েছিলেন। সেখানে থেকে পি-এইচ.ডি. হয়ে এসে একটা হলের প্রভোষ্ট হয়েছেন, বেনামীতে দু'খানা দোকান চালাচ্ছেন নিউ মার্কেটে, এবং সমাজ সেবার মানসে সদস্য হয়েছেন রোটারি ক্লাবের। সুদীপ্তর সঙ্গে জানাশোনা মোটামুটি হলেও সকলের সঙ্গে তিনি বড়ো একটা মেশেন না। তাই তার নাম যত পরিচিত, তিনি নিজে তত পরিচিত নন। কিন্তু মিঃ মালেক এদিক থেকে একজন প্রথিতযশা ব্যক্তি। পাস করেছেন পলিটিক্স নিয়ে। কিন্তু পলিটিক্স করেন না। ও সম্পর্কে পড়াশুনাও করেন না। লেখেন কবিতা। নিয়মিত ক্লাবে আসেন। এদিক থেকে তিনি ছোট ভাই খালেকের ঠিক বিপরীত। এবং প্রচুর আড্ডা জমাতে পারেন। আর বিস্তর মিথ্যা বলা ভদ্রলোকের অভ্যাস। ক্লাবে কোন দিন মালেকের পাশে বসলে সুদীপ্ত সেদিন সহস্র গ্যালন মিথ্যার ধারাজলে স্নান ক'রে ঘরে ফেরেন। মিছে কথা ভদ্রলোক বলতেও পারেন ভারি সুন্দর ক'রে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই সে মিছে কথা নিরীহ গোছের হয় না। অন্যের প্রচন্ড ক্ষতি হ'তে পারে এমন মিছে কথাও তিনি অবলীলাক্রমে ব'লে যেতে পারেন। চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে দিয়ে ফিরোজের কণ্ঠস্বর এল—

'আমার কি মনে হয় জান, এই যে কান্ডটা এহিয়া করল, এক হিসাবে এতে আমাদের লাভই হবে।'

'কিন্তু আমি তো দেখছি, তোমার লোকসান। আমরা পাঁচজন এসে চেপেছি তোমার ঘাড়ে। একি সোজা কথা।'

মোটেই সোজা কথা নয়। ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে। তবে মনে রেখো, এহিয়ার ঘাড়ে যে বোঝা এবার আমরা চাপাব তাতে ঐ সব ব্যথা-বেদনা কিছু নয়, ঘাড়টাই ভেঙ্গে যাবে।'

'ঐ কাজটা করো না ভাই, অনেকে এতিম হয়ে যাবে।'

'তুমি দালালদের কথা ভাবছ তো। না, তাদেরকে এতিম করে দুঃখ আর দেব না। এতিম হওয়ার আগেই তাদেরকে খতম করে দেব।'

মালেক-খালেক ভ্রাতৃদ্বয়ও এই দালালদের পর্যায়ে পড়ে। বিশেষ ক'রে মালেক সাহেব এ ব্যাপারে তুলনাহীন। বয়সেও বেশ প্রবীণ। কিন্তু ছেলে-

মানুষীতে এখনও অদ্বিতীয়। ঐটুকুই আকৃষ্ট করে সুদীপ্তদের।

এই ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা মনে ক'রেই সুদীপ্ত এখানে বললেন,

'কয়েক জন দালালের কথা মনে এলে আমার কি ইচ্ছে ক'রে জান!'

'কী? দেশত্যাগ ইচ্ছে করে? না প্রাণ ত্যাগ'

'আমার ইচ্ছে করে অন্ততঃ এক ঘন্টার জন্য ইয়াহিয়ার একটি বর্বর সৈনিক হয়ে যাই।'

'এই তো ভুল করলে অধ্যাপক। এহিয়ার বর্বর সৈনিকরা কখনো দালাল মারতে পারে না। তারা ভালো মানুষ মারে।'

তাই তো। কথা তো ফিরোজ ঠিকই বলেছে। পশু কি কখনো পশু মারে? পশুর ধর্ম মানুষ মারা। মানুষ মারে পশুকে। হাঁ, তা হ'লে তাকে একটি মানুষই হ'তে হবে। শক্ত সমর্থ মানুষ। কিন্তু পঁচিশের রাতে কি ওরা কেবলি ভাল মানুষ মেরেছে। প্রায় তাই-ই। কেবল ভুল করে দু একটা সেম সাইড হয়ে গেছে।

কীর্তিমান পুরুষ বটে মালেক সাহেব। এম. এ. পাস করেছেন ১৯৪৫-এর দিকে। সে সময়ে তিনি কমিউনিস্টদের গাল দিয়ে মাসিক 'মোহাম্মদী'তে কবিতা লিখতেন। কেন না ঐটেই সবচেয়ে নিরাপদ ছিল সেই সময়। দেশ স্বাধীন হ'লে মুসলিম লীগ অথবা কংগ্রেসের রাজত্বে বাস করতে হবে। অতএব তাদের কাউকে ঘাঁটানো নিরাপদ নয়। আবার একান্তই দেশ যদি স্বাধীন নাই হয় তা হ'লে বাস করতে হবে বৃটিশ রাজত্বে। অতএব বৃটিশের বিরুদ্ধেও কিছু লেখা যায় না। অথচ সেকালে পলিটিক্যাল বিষয়ে কবিতার বেশ বাজার দর ছিল। এবং বৃটিশ-কংগ্রেস-মুসলিম লীগ সকলকেই খুশি করা যায় এমন বিষয় ছিল কমিউনিস্ট-বিরোধিতা। তাই লিখলেন "লাল বন্দুকের গান।" স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানে শুরু করলেন মুসলিম তাহজীব ও তামুদ্দুন নিয়ে গবেষণা। সেই সময় তিনি একটি প্রবন্ধ লিখলেন। তার আরম্ভটা এইরকম– "মাঝে মাঝে কবিতা লিখিয়া থাকি। কবিতা আমি ভালবাসি কিন্তু তদপেক্ষাও আমি বেশি ভালোবাসি আমার দেশকে। দেশ আগে। তারপরে সাহিত্য। দেশের স্বার্থ অগ্রে বিবেচনা করিতে হইবে পরে সাহিত্যের কথা আসিবে। আমি সাহিত্যের ছাত্র নহি। অতএব সাহিত্য সম্পর্কে সকল তত্ত্ব আমার না জানা থাকিতেও পারে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু পড়িয়াছি (এম.এ. পাস করার

পর রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্পর্কিত একখানি গ্রন্থও তিনি পড়েন নি)।–রাষ্ট্র বিজ্ঞানের মধ্যে লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা এই দৃঢ় প্রতীতী আমার মধ্যে জন্মিয়াছে যে...।" এই ভাবে শুরু ক'রে সেই প্রবন্ধে মালেক সাহেব প্রমাণ করেছিলেন—নব গঠিত রাষ্ট্রের স্বার্থেই পাকিস্তানি জাতির জন্য রবীন্দ্র-চর্চা বিপজ্জনক। বিগত শতাব্দীর পুঁথি সাহিত্যের আদর্শ হবে আমাদের পাকিস্তানি সাহিত্যের আদর্শ। আহা, পাক সরকার কী খুশিই তখন হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মালেক সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়ে গিয়েছেন। প্রথমে লেকচারার, পরে তিন বছরের মধ্যেই পাঁচ জনকে ডিঙ্গিয়ে হয়েছিলেন রীডার। কিন্তু হায়! রীডার হওয়ার ছ'মাসের মধ্যেই এ কী কান্ড। অভূতপূর্ব সেই কান্ড ঘটল ১৯৫৪-তে। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের ঘটল ভরাডুবি। পাকিস্তানের রজিনীতিক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের প্রাধান্য শুরু হল। না, সে জন্য কপাল চাপড়ে লাভ নেই। বুদ্ধি থাকলে সব নদীতেই পার হওয়া যায়। বুদ্ধিখাটাতে শুরু করলেন মালেক সাহেব। কিছুক্ষণ ভাবলেন, আওয়ামী লীগের মনের কথাটি কী?–পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের মধ্যে থেকেও আমাদের বঙ্গীয় সত্তাটিকে আমরা ভুলতে পারি নে। ভুলব না। ব্যাস, মালেক সাহেব পূর্ব বাংলা নিয়ে ভাবে গদ গদ হয়ে একটা প্যানপেনে কবিতা লিখে ফেললেন। একুশে ফেব্রুয়ারির উপর গানও লিখে ফেললেন একটা। একটা প্রবন্ধে লিখেই ফেললেন–' পাকিস্তানের প্রথম রুদ্র (লেখক বোধ হয় 'রুদ্র' শব্দের মানে জানতেন না) আবির্ভাবে অনেকেই আমরা বিমূঢ় হইয়াছিলাম। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে আমরা সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছি। ..."একটু মিছে কথা লেখা হয়ে গেল—লিখতে লিখতেই মালেক সাহেব ভেবেছিলেন, সত্যিকার জ্ঞানোদয়টা তার বায়ান্নতে হয় নি, হয়েছিল চুয়ান্নতে। তা হোক, যাহা বায়ান্ন তাহা চুয়ান্ন। এ ধরনের এক-আধটু মিথ্যা জায়েজ। এটা কলি যুগ না? কলি যুগে ষোল আনা সত্য অচল। এইভাবে কিছু সত্য কিছু মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রে মালেক সাহেব ভারি সুন্দর সচল রইলেন চুয়ান্ন-পরবর্তী দিন গুলিতে। এমন সময় কী ভাগ্যের পরিহাস! আয়ুব খানের সেই মারশাল ল' (গ্রাম্য উচ্চারণে মারশালা) জারি করলেন। আয়ুব খান এসে মারশাল ল' জারি হওয়ার দিন মালেক সাহেব সারাদিন রোজা থেকে খোদার কাছে কেঁদেছিলেন। হায় হায়, এমনি ক'রে কি কেউ নিজের পায়ে কুড়াল মারে। কোন কুক্ষণে কেন এইসব কবিতা-গান লিখেছিলাম! আল্লার কাছে বিস্তর কাঁদাকাটা করলেন মালেক সাহেব। নামায আগে থেকেই পড়তেন, এবার নফল নামাযের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। আগে দাড়ির সঙ্গে গোঁফও কিছুটা রাখতেন। এখন খুর দিয়ে গোঁফও চেছে ফেললেন, দাড়ি রয়ে গেল বহাল তবিয়তে। গুম্ফবিহীন দাড়িতে মুখের চেহারাটা এবার খাঁটি মুসলমানের মতো দেখতে হ'ল। কিন্তু দিলে তবু ভরসা হয় না। নির্জনে একা থাকলেই আল্লাহ্‌কে ডাকেন।

তখন আল্লাহ্ তাঁর উপর কৃপা করলেন। হঠাৎ একদিন আইয়ুব খানের কাছে ডাক পড়ল মালেক সাহেবের। খান সাহেব মালেক সাহেবকে সরাসরি জানিয়ে দিলেন—

'আমি অযথা কাউকে দুঃখ দেব না। আপনাদের আগেকার সকল গুনা মাফ ক'রে দেওয়া হ'ল। এখন আমি চাই যে, আপনারা সকলে জাতি-গঠনের কাজে আমার হাত শক্ত করুন।'

জাতি গঠনের মহান দায়িত্বের কথাগুলি আইয়ুব খান সাহেব সামনে রাখলেন। পেছনে রইল রাইফেল। চোখ বন্ধ ক'রে যারা সেই মহান দায়িত্ব পালনে পা বাড়াল সেই রাইফেল কখনো তারা দেখতে পায় নি। তারা ভাগ্যবান। কিন্তু অনেক হতভাগা একটু ইতস্তত করেছিলেন, এবং অনেকেই তারা সিধে হয়েছিলেন দু-একটা রাইফেলের গুতো খেয়ে। অনেকে তাও হন নি। তাঁদের মধ্যে ছিল দেশদ্রোহিতার শিরোপা।

বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও রাজনীতিকদের একটা তালিকা তৈরি করে তাঁদেরকে তিনটে ভাগে বিভক্ত করেছিলেন খান সাহেব।—এক দল সাদা, এক দল কালো এবং এক দল হলুদ। এই ভাগ কিন্তু অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবেই করা হয়েছিল। এবং সাদা তালিকার নিষ্পাপ বোকা ভালো মানুষগুলিকে অত্যন্ত সম্মান দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। অত ভালো মানুষ দিয়ে দেশের কাজ হয় না। তবে তোমাদের কিছু বলাও হবে না। হাজার হ'লেও তোমরা বোকা ভালো মানুষ। হলুদ তালিকায় ছিলেন দুই ধরণের মানুষ—এক, নিষ্পাপ বটে, তবে বোকা নয়, এবং সঙ্কল্প সাধনে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। দুই, অল্প পরিমাণে দাগধরা। শয়তানীতে নেমেও বিবেকটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা যাঁদের আছে। এই হলুদ তালিকার মানুষগুলি ছিলেন আইয়ুব খানের কাছে অত্যন্ত ডেন্‌জারাস্, ভয়াবহরূপে বিপজ্জনক। এদের হাত-পা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে খান সাহেব মাঠে নেমেছিলেন। তাঁর সহায়ক হয়েছিলেন কালো তালিকার মানুষগুলি। কালো তালিকায় ছিল খুব বাছা বাছা নামগুলি— পাকা চরিত্রহীন, পাকা শয়তান, পাকা বদমায়েশ, কিন্তু সেই সঙ্গে অতি ধুরন্ধর ও প্রচন্ড রকমের বুদ্ধিমান। ভাগ্যক্রমে এই কালো তালিকায় মালেক সাহেব পড়েছিলেন। খান সাহেবের দরকার ছিল বুদ্ধিমান চরিত্রহীন মানুষ। ওদের দিয়েই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভব। তাই ওদের কাছেই নিজেকে ব্যক্ত করলেন খান সাহেব—দেখ হে, তোমাদের সর্বপ্রকার অতীত দুষ্কর্মের তালিকা আমার হাতে আছে। আমি তা ঠিক মতো রেখেই দেব। কিছু বলব না তোমাদের। কিন্তু তার বিনিময়ে আমি যতো দুষ্কর্ম করব সে সবের সাফাই তোমাদের গাইতে হবে। নেশান বিল্ডিংয়ের (জাতিগঠনের) কন্ট্রাকটরি তোমাদের দেব। তা থেকে তোমরা ক'রে খেতে পারবে কিন্তু সাবধান, বেঈমানী করার চেষ্টা করো না। মনে রেখো, আমি পাঠান। পাঠান কখনো বেঈমানী সহ্য করে না।

মালেক সাহেব শুনেই সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করেছিলেন–

'তওবা তওবা কী যে বলেন স্যার। যা বলবেন তাই করব স্যার।'

'তোমরা বাঙালিরা তো সব হিন্দুদের গোলাম ছিলে। ছিলে না?'

'হাঁ স্যার। ঠিক স্যার। ছিলাম বৈ কি স্যার।'

"অত স্যার স্যার করবে না। শোনো। গোলাম তোমরা যেকালে ছিলে, সেকালে ছিলে এখন তোমরা আজাদ। এই আজাদী তোমাদের জন্যে কে এনেছে বলতে পার? এই আমি—আয়ুব খান।'

নিজের বুকে বুড়ো আঙুলের টোকা মেরে দেখিয়েছিলেন খান সাহেব। আর অমন যে চালু মাল মিঃ আব্দুল মালেক তিনিও খান সাহেবের কথা শুনে কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা, আমাদের আজাদী কায়েদে আজমের অবদান । সে কথা ভুলে গিয়ে বলতে হবে তা এনেছেন এই পাঠান খান সাহেব? মিঃ মালেককে চুপ থাকতে দেখে খান সাহেব ব'লে চললেন—

'আমি তোমাদের আজাদী এনে দিয়েছি, আমি তোমাদের মুক্তিদাতা। কিন্তু মুক্তি দিলেই তা কি সকলে নিতে পারে? বল, পারে?'

'না হুজুর। বহু কাল খাঁচার ভেতরে থাকার পর পাখিকে ছেড়ে দিলে সে উড়তে পারে না।'

'ঠিক। তোমাদের বাঙালিদের অবস্থা হয়েছে খাঁচার পাখির মতো। দীর্ঘকাল হিন্দুয়ানীর খাঁচায় তোমরা পোষা ছিলে। এখন ছাড়া পেলেও তাই উড়তে পারছ না। মানে, হিন্দুয়ানী ত্যাগ করতে পারছ না। তোমাকে এই কাজের ভার আমি দিতে চাই বুঝতে পারছ?'

মালেক সাহেব বুঝতে চেষ্টা করলেন। খান সাহেব ব'লে চললেন—

'আমি একটা সংস্থা গড়ব মনে করছি। কী নাম দেব বলতে পার?'

হুজুর তার কাছে সাজেশন চেয়েছেন, আহা কী সৌভাগ্য! গৌরবে ও গর্বে মালেক সাহেব স্ফীত হয়ে উঠলেন। একটু মাথা নত করে ভেবে বললেন—

'ন্যাশনাল ইন্‌স্‌টিটিউট্ ফর দি প্রটেক্‌শান অফ্ দি বেঙ্গলিজ ফ্রম দি কাফির্‌স্'

'রাসকেল।'

খান সাহেব রাগে ফেটে পড়লেন। আর একটু হ'লে লাথিই মেরে বসতেন। বুট সুদ্ধ পাটা লাফিয়েও উঠেছিল ফুট খানেক। মালেক সাহেব ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু না। খান সাহেব আর বেশি কিছু করলেন না। একটুও না ভেবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—

'ওটার নাম হবে একাডেমি ফ্‌র দি ডেভেলপমেন্ট অফ্ ন্যাশনাল ইন্টেগ্রিটি এ্যান্ড মিউচুয়্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তোমাকে এর ডিরেক্টর করব, বুঝেছ।'

আনন্দে হাত কচলাতে কচলাতে মালেক সাহেব তখন গ'লে জল হবার উপক্রম।

'হুজুরের মেহেরবানি।'

খান সাহেব অর্থাৎ আয়ুব খান সোফা ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করলেন। অগত্যা মালেক সাহেবও উঠে দাঁড়ালেন। হুজুর দাঁড়িয়ে থাকলে তিনি ব'সে থাকেন কী ক'রে? কিন্তু হুজুর বাঁ হাতের একটা ইঙ্গিতে মালেককে বসতে বল-লেন। হুজুরকে একটু চিন্তান্বিত দখাচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ সেকেন্ড পর তিনি বল-লেন—

'তোমাদের অধঃপতনের মূলটা কোথায় জান! তোমাদের ঐ ভাষা। ঐ ভাষা তোমাদের যতদিন থাকবে ততদিন হিন্দুদের গোলামী থেকে তোমরা মুক্ত হ'তে পারবে না।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নাই হুজুর।'

'সামনে তো সবি স্বীকার কর তোমরা। কিন্তু পেছনে গেলেই উল্‌টো সুর ধরবে। তোমাদের বিশ্বাস আছে কিছু! তোমরা সব মোনাফেক আদমী আছ!'

'এটা হুজুর হক কথা বলেছেন। কিন্তু এই বান্দা আপনার সাথে কখনো মোনাফেকী করবে না।'

'করলেও বাঁচবে না। যতো গুনার কাম করেছ সবের তালিকা আমার ফাইলে আছে। দরকার হ'লে সেগুলি বের করা হবে। কিন্তু আশা করি তার প্রয়োজন হবে না।'

মালেক সাহেব কিছু বলার না পেয়ে মাথা নত করে চুপ ক'রে রইলেন।

খান সাহেব ব'লে চললেন—

'তোমার একাডেমির কাজ হবে মাশরেকী পাকিস্তানে উর্দু চালু করা,আর একদল বুদ্ধিজীবী তৈরী করা যারা আমার শাসনের গুণগান করবে।'

'মসজিদে আপনার নামে খুৎবা চালু করে দেব হুজুর।'

'আহ্ সেটা তো বড়ো হক্ কথাই বলেছ হে। কিন্তু কথা কি জান। আরবি ভাষায় কে কী বলবে তা তো লোকে বুঝবে না। লোকে যা বুঝবে না তা আর ব'লে লাভ কী!'

'না হুজুর, উর্দুতে খুৎবা চালু ক'রে দেব। উর্দু তো শিখতেই হবে সকলকে।'

'শুধু শিখতে হবে মানে কী? অফিসে অন্দর মহলে সবখানে ঐ এক উর্দুই থাকবে। বাংলা বিলকুল হারাম হয়ে যাবে। কেননা বাংলা থাকা মানেই তো হিন্দুয়ানী থাকা। পাকিস্তানে আমি তো হিন্দুয়ানী চলতে দিতে পারি নে। বল, পারি?

'তা বটে। তবে হুজুর, ওখানে উর্দু যে কারো মাতৃভাষা নয়।'

বহু সাহস বুকে নিয়ে মালেক সাহেব এই একটিবার কিঞ্চিৎ প্রতিবাদের সুরে কথা বললেন। আর যায় কোথায়। গর্জে উঠলেন খান সাহেব—

'হোয়াট ননসেন্স্। উর্দু এখানেই বা কার মাতৃভাষা? কারো না। তবু সকলে

আমরা দেশের ঐক্য বজায় রাখার খাতিরে উর্দুকে মেনে নিয়েছি। তোমরা এমন কি নবাবের বাল এসেছ যে মানবে না।'

এই পাঠানী যুক্তির কাছে মিঃ আব্দুল মালেক হার মানলেন। তাই তো তিনিও তো একদা জাতীয় সংহতির খাতিরে রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তা'হলে? এখন তা হ'লে জাতীয় সংহতির জন্য বাংলা ভাষাকে বাদ দিতে আপত্তি থাকবে কেন? না তাঁর আপত্তি নেই। আপত্তি হবে দেশের ওই বেকুব জনসাধারণের। ভাষার প্রশ্নে কোন যুক্তি ওরা মানতে রাজী নয়। একটু ভেবে মালেক সাহেব বললেন—

'হুজুর, আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে কিছু চালাকির আশ্রয় নিতে হবে। প্রথমেই উর্দুর কথা বললে দেশে হট্টগোল হৈ-চৈ শুরু হয়ে যাবে।'

'না-না, হৈ-হাঙ্গামা বাধাতে পারবে না। বাঙালি বড়ো হুজুগপ্রিয়। হৈ-হাঙ্গামা পেলে আর কিছু চায় না। তখন তাকে শান্ত করাই মুশকিল হবে। শান্তিপূর্ণভাবে কাজ হাসিল করতে হবে।'

'হুজুর সে জন্যই বলছিলাম—প্রথমেই ওদেরকে বাংলা ভাষা ভুলিয়ে দিতে হবে। তারপর একটু একটু করে দিতে হবে উর্দু।'

বাহ্, ভারি চমৎকার প্ল্যান তো! বাঙালিকে বাঙলা ভুলিয়ে দেওয়ার একটা প্ল্যান দিলেন মালেক সাহেব। খান সাহেব তাতে উল্লসিত হলেন। কোনো হৈ-চৈ নেই। ন্যাশনাল ইন্টেগ্রিটি রক্ষার জন্য একাডেমি হয়ে গেল। মালেক সাহেব তার ডিরেক্টর হলেন। কিন্তু ঐ একাডেমির কী যে কাজ, কেউ তা জানল না। ঐ একাডেমির কথা লোকে ভুলেই গেল। তবে যথাক্রমে একদা বাংলা একাডেমি এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা হরফ সংস্কারের প্রস্তাব পাশ ক'রে বসল। মালেক সাহব কোথায় কি কলকাঠি নাড়লেন দেশবাসী তার বিন্দু-বিসর্গ কিছু জানল না। জানলেন খান সাহেব। তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল–কেল্লা ফতে। এমনভাবে হরফ সংস্কারের প্রস্তাব পাস করানো হয়েছে যে, ঐ ভাবে হরফের সংস্কার সাধন হ'লে প্রচলিত বাংলা হরফে ছাপানো বই এ দেশে ভবিষ্যতে একখানিও কেউ পড়তে পারবে না। তার মানেই কলকাতার বই পাকিস্তানে সম্পূর্ণ অচল হয়ে যাবে। তার বদলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উর্দু বইয়ের সাপ্লাই দিতে হবে। অবশ্যই প্রথমে বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে। দরকার হ'লে এই অনুবাদ করা বইগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের পাঠ্য করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে কেবলি বাংলা বই পড়তে হবে তার কি মানে আছে? বাংলা বইয়ের নামে পড়াচ্ছো তো খালি হিন্দুয়ানীতে ভরা কলকাতার বই। কেন, লাহোরের উর্দু বই বাংলাতে তরজমা ক'রে বাংলা অনার্সে পাঠ্য করতে পার না? এমন একটা বিতর্কও কে বা কারা বাজারে চালু ক'রে দিল। মালেক সাহেব তাঁর হুজুর আয়ুব-মোনায়েমকে জানিয়ে দিলেন –কাজ চলছে ভালো। বাংলার সিলেবাসে এইভাবে উর্দু বই চালু হয়ে গেলে

বাঙালির মস্তিষ্কশুদ্ধির কাজ কিছুটা এগোবে, কলকাতার বইয়ের মারফতে যে সকল হিন্দুয়ানী ভাবধারা এসে আমাদের পাক মস্তিষ্ককে অনবরত না-পাক করছে তার এবার সমাপ্তি ঘটবে। এ সব হ'ল নেপথ্য কথা। প্রকাশ্যে যেটা দেশবাসীকে জানানো হ'ল তা হচ্ছে—বাংলা হরফ অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক। যেহেতু আমরা সমাজের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে চাই সেই হেতু এই অবৈজ্ঞানিক বাংলা হরফকে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞানসম্মত করতেই হচ্ছে। এর ফলে বাংলা ভাষার প্রসার দ্রুত হবে। ইত্যাদি....।

এইভাবে কীর্তিমান মালেক সাহেব আউয়ুব খানের আমলেও বহাল তবিয়তে উন্নতির মই বেয়ে উপরে উঠে যেতে লাগলেন। ইতিমধ্যে এল ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান। আউয়ুবখান বিদায় নিলেন। যে দিন সন্ধ্যায় আউয়ুব খানের বিদায়বার্তা রেডিওতে ঘোষিত হ'ল সেদিন মালেক সাহেব, অন্য কেউ না জানলেও সে কথা তাঁর স্ত্রী জানেন, সারারাত কেঁদে বালীশ ভিজিয়েছিলেন। হায় হায়, এই তো ক'মাস আগেই আউয়ুব খানের বইয়ের, Friend not Master গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করে কয়েক হাজার টাকা কামাই করেছিলেন। এখন উপায়! সকলেই যে বলে, আব্দুল মালেক হচ্ছে আউয়ুব খানের নাম্বার ওয়ান দালাল। হায় খোদা, এখন কী হবে! মালেক সাহেবকে চান্স খোদা ঠিকই মিলিয়ে দিলেন। প্রায় দু'বছর তিনি সময় পেলেন হাতে। ১৯৬৯-এর মার্চে ইয়াহিয়া খান শীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রতিশ্রুতি জাতিকে দিয়েছিলেন কোনোদিনই তা পালিত হয় নি—আজ-কাল ক'রে কেটে গেছে দুটি বছর। সেই দু বছরে অতি বুদ্ধিমান আব্দুল মালেক ধীরে ধীরে কাজ গুছিয়ে ফেলেছেন। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে গদ গদ কণ্ঠে বক্তৃতা করে প্রচার করেছেন—রবীন্দ্রনাথ আমাদের সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ছাত্রদের এক সাংস্কৃতিক সভায় বলেছেন, দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ও দেশের ভাষাই হচ্ছে জাতি-গঠনের মৌল উপাদান, জাতীয় সত্তার কোন অপরিহার্য অঙ্গরূপে ধর্মের কোনো স্থান থাকতেই পারে না। একদা প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তান থেকে নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন। এবার তিনি বই লিখে তা জীবনানন্দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন। নজরুল ইসলাম হাজার হ'লেও গান লিখে মুসলমানিত্ব জাহির করেছেন, অতএব কঠোর ভাষায় তাঁর সমালোচনা ক'রে সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর জোর দিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন। যে গোঁফ খুর দিয়ে চাঁছা শুরু করেছিলেন এবার আবার তাকে কিছুটা বাড়তে দিলেন। কিন্তু এতো সব করেও হালে পানি পাচ্ছেন না দেখে আওয়ামী লীগ রিলিফ ফান্ডে এক হাজার টাকা চাঁদা দিলেন। দেখাই যাক, এবার ভাইসচ্যান্সেলর যদি হওয়া যায়!

এ হেন মালেক সাহেব সেদিন প্রবন্ধ লিখছিলেন। সেই পঁচিশের রাতে। রাত নটার দিকে খাওয়া শেষ ক'রে লিখতে বসেছিলেন। বিষয়—পূর্ব বাংলার আধুনিক কবিতা। লিখতে বসেই কথাটা মালেক সাহেবের মনে হ'ল। এক

ঢিলে দু'টি পাখি মারতে হবে। সকলেই কবি হিসাবে জনাব আব্দুল কাসেমকে বর্তমান পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি বলে থাকেন। তাঁর চেয়েও বড়ো! অসহ্য। ছোকরা কটা দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে খালি ঘোরাফেরাই করেছিল। পাস করতে পেরেছিল একটা পরীক্ষায়? হ'তে পেরেছে তাঁর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার? মূর্খ দেশবাসীর কাছে মূর্খরাই সম্মান পাবে। কিন্তু হায়, ছোকরার কবিতার কোনো দোষ যে ধরা যায় না। তখন কবিতা রেখে দিয়ে তিনি চোখ বুঁজে চিন্তা করতে শুরু করলেন। এক হাতে কলম, সামনে খাতা খোলা, চোখ বন্ধ করে মালেক সাহেব চিন্তা করছেন। দৃশ্যটা দেখলে সেই সময় মালেক সাহেবকে ধ্যানী বুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে না হয়ে যায় না। ধ্যানী মালেক সাহেব হঠাৎ ধ্যান ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন—ইউরেকা। আবুল কাসেমের কবিতায় যে সকল চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহার আছে তা যথেষ্ট বঙ্গীয় নয়, বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্য দেশীয়। কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতার মধ্যে কি এটা দোষের? তা ছাড়া, ছোকরার সব কবিতাই যে ঐ রকম তাও তো নয়। ধূত্তোর, এ দেশীয় গবেট পাঠকেরা অতসব বুঝবে না। কথাটা যে তাঁর মাথায় এসেছে সেটা আল্লাহর রহমতের ফলেই। লাভ দু'দিক থেকে সেটা বুঝতে পারছ না। প্রথমতঃ, আবুল কাসেমকে পাঠকের মন থেকে কিছুটা সরাতে পারলে যে ফাঁক সৃষ্টি হবে, সেই ফাঁকে কোনো মতে নিজেকে একটু গলিয়ে দিতে পারলে! আহ্ কী মজা। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে তাঁর চিন্তার সর্বস্তরে একজন বিশুদ্ধ বাঙালি এটাও প্রমাণিত হবে। অতএব চোখ খুললেন মালেক সাহেব। দ্রুত বেগে কলম চলতে শুরু করল। রাত প্রায় বারোটার দিকে মালেক সাহেবের হুশ হ'ল—বাইরে গুলি-গোলা চলছে। ওরে, বাবা, কী প্রচন্ড আওয়াজ! বারান্দায় পা দিয়ে এ-পাশ ও-পাশের দৃশ্য দেখেই ব্যাপারটা তিনি বুঝে ফেললেন। তা হ'লে কি তার ছোট ভাইয়ের কথাই ঠিক হ'ল। ক'দিন থেকে দু'ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল।

এখন থেকে পাকিস্তান, মুসলমান প্রভৃতি বুলি ভুলে গিয়ে বাংলা ও বাঙালির কথা বলতে হবে। নইলে আমাদের গোলামী ও দুর্গতি রোধ করা যাবে না!— মালেক সাহেবের মত।

ছোট ভাই খালেক সাহেবের মত হচ্ছে—পাকিস্তানের সংহতি সকলের আগে। সেজন্য আছে আমাদের সেনাবাহিনী। এই সেনাবাহিনী আমাদের গৌরব ও গর্বের বস্তু। যে-কোনো মূল্যে তারা পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করবে। দেশকে তারা বিচ্ছিন্ন হ'তে কিছুতেই দেবে না।

কিন্তু সংহতি রক্ষা পাবে কিসে? ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দুই অংশের মধ্যে সমতা রক্ষায়? না প্রবল গায়ের জোরে একটা অংশকে পদতলে রেখে শোষণ করায়?

শোষণ পদানত প্রভৃতি শব্দগুলি মালেক সাহেবের মুখে ইদানীং শোনা

যাচ্ছিল। এতে মনে মনে খুব বিক্ষুব্ধ ছিলেন খালেক সাহেব। আপন ভ্রাতার এ হেন পদস্খলন তাঁর কাছে গভীর মর্মপীড়ার কারণ ছিল। পাকিস্তান ও ইসলামকে বাঁচাতে গিয়ে আমরা যদি কিছুটা শোষিত হয়েই থাকি সেটা সহ্য হবে না? আমাদের ঈমান এতোই দুর্বল? কিন্তু বড় ভাইকে কী আর বলবেন! নিজে তিনি বৈজ্ঞানিক মানুষ; হলের প্রভোষ্টগিরি, ব্যবসা ও রোটারী ক্লাব নিয়ে আছেন। রাজনীতি এমন কিছু তিনি বোঝেন না। অথচ তার বড় ভাই সরাসরি রাজনীতির ছাত্র। তবু তিনি বলবেন, বড়ো ভাইয়ের ওটা ভুল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা নেই। একদিনে, হাঁ, মাত্র একদিনে আওয়ামী লীগের এই সব চ্যাংড়ামি সেনাবাহিনী ঘুচিয়ে দিতে পারে। দরকার হ'লে দেবে।

'কিন্তু কত দিনে? গায়ের জোরে কতদিন অন্যকে পদানত রাখা সম্ভব?

'ধরুন এক শো বছর।'

এইটেই খালেক সাহেবের মত। ইসলামের স্বার্থে, পাকিস্তানের সংহতির স্বার্থে দরকার হ'লে আমাদের সেনাবাহিনী এক শো বছর পূর্ব পাকিস্তানকে পদানত রাখবে, দেশে সামরিক শাসন চালাবে। ইসলাম ও পাকিস্তানের স্বার্থে তা হবে বিলকুল জায়েজ।

খালেকের সঙ্গে সেই সব বিতর্কের কথা মালেক সাহেব এখন স্মরণ করলেন। খালেকের ধারণাই তা হ'লে ঠিক। গায়ের জোরে দরকার হ'লে বাংলাদেশকে পদানত রাখার অভিযান শুরু হয়েছে; মালেক সাহেব তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে লিখিত প্রবন্ধটাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিড়ে ফেললেন। খুর বের ক'রে গোঁফ চেঁছে নিলেন। অতঃপর চটপট ওজু করে মাথায় টুপি দিয়ে কোরান নিয়ে বসলেন।

কোরান শরীফের সামনেই পাওয়া গিয়েছিল মালেক সাহেবের লাশ। পাঁচ বছরের ছোট ছেলেটিকে পাওয়া গিয়েছিল বাপের পাশেই গুলিবিদ্ধ অবস্থায়। কিন্তু পাওয়া যায়নি দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে। অবশ্য মালেক সাহেব অভিনয়ে খুব একটা ভুল করেন নি। ওদের তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন—

'আমরা খাঁটি মুসলমান। সেনাবাহিনীর সমর্থক। আওয়ামী লিগের দুশমন।'

'বেশ ঠিক আছে। আমাদেরকে তবে সাহায্যকর।'

শোনা মাত্র মালেক সাহেব সাহায্যের জন্য তৎপর হয়েছিলেন।

'নিশ্চয় আপনাদেরকে সাহায্য করব। এক শো বার করব। বলুন কী করতে হবে। কোন দুশমনকে ধরিয়ে দিতে হবে। সব দুশমন আমার নখদর্পণে।'

'ও সব নেহি। দুশমনের সাথে মোকাবেলা আমরাই করতে পারব। তোম রুপেয়া নিকালো।'

সঙ্গে সঙ্গে মালেক সাহেব আলমারি খুলে টাকা যা ছিল, মাত্র পাঁচ শো

ছিল, সব দিয়েছিলেন। মোটেই পাঁচ শো টাকা ! জওয়ানরা খুশি হয় নি। নিজেরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল সারা আলমারি। স্ত্রী কন্যাদের গহনা ছিল প্রায় চল্লিশ ভরি হবে। সেগুলো তারা হাতে নেওয়া মাত্র মালেক সাহেব ব'লে উঠেছিলেন—

'যদি কিছু মনে না করেন তা হলে এগুলো আমি আপনাদেরকে সামান্য উপহার হিসেবে দিতে চাই।'

বহুত শুকরিয়া! আগার জেওয়ার তো মিলা, লেকিন আওরাত কাঁহা?'

গয়না তো দোস্ত দিলে, কিন্তু গয়না যে পরবে সে মেয়ে মানুষ কোথায়?

'আওরাত কাঁহা?'- প্রচন্ডভাবে ধমক দিয়ে উঠল একটি জওয়ান।

পাশেই বাথরুমে মেয়েরা লুকিয়েছিল। তাদের বের করা কঠিন ছিল না। দুবার জোরে লাথি মারতেই কপাট খুলে গেল। পাওয়া গেল দুই মেয়ে, এক মা! মায়ের বয়স চল্লিশ, কিন্তু ভারি মজবুত দেহের গড়ন। এখনো স্বচ্ছন্দে তিরিশ ব'লে চালিয়ে দেওয়া যায়, মেয়ে দুটির একটি উনিশ, একটি সতেরো। জওয়ানরা ভারি খুশি। এই বাড়িটাতে ঢোকা তোদের খুবই সার্থক হয়েছে। তিন তিনটে খুবসুরৎ আওরাত, চল্লিশ ভরি জেওয়ার, পাঁঞ্চ শো রুপেয়া। এ সবি মালে গণিমাৎ, অতএব হালাল।

'তুমি বলেছ, তুমি আমাদের দোস্ত আদমী আছ। তবে এখন দোস্তের কাম কর। এই আওরাত তিনটাকে আমাদের দরকার। আমরা নিয়ে যাব। লেকিন কুচ ঘাবড়াও মাৎ, তিন দিন বাদে রেখে যাব।

'এতোটা সহ্য করার ক্ষমতা মালেক সাহেবের ছিল না। তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—

'ইয়া আল্লাহ, এই জালেমের হাত থেকে বাঁচাও। লা ইলাহা......

আর বলতে পারেন নি মালেক সাহেব। বলতে চেয়েছিলেন লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা......। 'লা ইলাহা' অর্থাৎ 'আল্লাহ নেই' পর্যন্ত বলতে পেরেছিলেন, বাকি অংশ ' ইল্লা আন্তা' অর্থাৎ 'তুমি ছাড়া' আর বলা হয়নি। এমন সময় খটা খট খটা খট—স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের কাজ শুরু। অতএব মালেক সাহেবের জীবনের শেষ কথা হলো—'আল্লা নেই'। 'আল্লা নেই' বলতে বলতেই ভুলণ্ঠিত হল মালেক সাহেবের নশ্বর দেহ। তাঁর পাশে লুটিয়ে পড়ল পাঁচ বছরের ছোট ছেলেটি।

মালেক সাহেবের এই পরিণতির কথা সুদীপ্ত জেনেছিলেন পরে। প্রায় দিন দশেক পরে। সকল কথা ডঃ খালেকের কাছে শুনে আঁতকে উঠেছিলেন সুদীপ্ত।

' ইস কী বর্বর নর পিচাশের দল।'

'না না, ঐ সব বলবেন না। যে-কোনো দেশের সৈনিকদের তুলনায় আমাদের পাকিস্তানি সৈন্যদের নীতিবোধ অনেক উন্নত। ঐ একটা কাজ তারা বাই চান্‌স ক'রে ফেলেছে। তাও দেখুন না, ঐ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে

আমার কাছে চিঠি দিয়েছে ওরা। এবং ক্ষমা চেয়েছে।'

'তাই ন্যাকি! – সামান্য একটু ফোড়ন কেটে থেমে গিয়েছিলেন সুদীপ্ত। এবং এই খালেকের সঙ্গে কখনো যে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সে কথা মনে হয়ে গভীর ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল তার মনে! কী অবাক! সংবাদটা দেবার সময় তাঁর একটু লজ্জাও কি হয় নি! ছী-ছী! অবলীলা-ক্রমে মরহুম আব্দুল মালেকের ভাই ডঃ আব্দুল খালেক বলে গেলেন—'

'আর্মির জেনারসিটি দেখুন, মেয়েদের ফেরৎ পাঠাবার সময় চিকিৎসার জন্য তিন শো টাকাও দিয়েছে। দে আর কোয়াইট সেন্সিবল ফেলো।'

তা বটে। মনে মনে পরে সান্তনা পেতে চেষ্টা করেছিলেন সুদীপ্ত। গণি-মাতের মাল তো ফেরত দেবার কথা নয়। কিন্তু ওরা দিয়েছে। সেই সঙ্গে তিন শো টাকাও ও দিয়েছে। এই বদান্যতার কি তুলনা আছে! হাজার হ'লেও মিঃ মালেক ও ডঃ খালেক তাদের নিজেদের লোক। সাধারণ জওয়ান চিনতে না পেরে একজনকে না হয় মেরেই ফেলেছে এবং তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের সাথে কিছুটা খারাপ কাম করেই ফেলেছে, তা ব'লে কি ব্যাপারটাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে না? রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এ ধরনের দু চারটে দুষ্কর্ম তো ঘটেই থাকে। তা ব'লে কি রাগ করে থাকলে চলে। ডঃ খালেক সেনাবাহিনীর উপর রাগ করেন নি। ভাবী ও ভাইঝিদের নিজের বাসায় এনে তাদের প্রত্যেককে এক বোতল ক'রে ভাইব্রোনা কিনে দিয়েছিলেন।

এ হেন ডঃ খালেক এক দিন ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে পাকিস্তান-বিরোধী বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন।

সে প্রায় এক বছর আগের ঘটনা। তখন ডঃ খালেকের সাথে সুদীপ্তর পরিচয়ের সবে সূত্রপাত। সুদীপ্ত তখনও জানতেন না যে, ডঃ খালেক আধুনিক পাকিস্তানি মুসলমান। সে জন্য কথায় কথায় ভারত-বিদ্বেষ প্রচার করে থাকেন। কখনো নামাজ-রোজা করেন না। তার বিনিময়ে হিন্দুদের মালাউন বলেন। এবং একাধিক রমণী-সংসর্গকে জায়েজ বিবেচনা করেন। এমনিতে লোকের সাথে মেশেন কম। কিন্তু মেয়েদের সাথে অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়েও গল্প করতে পারেন ঘন্টার পর ঘন্টা। সে ক্ষেত্রে তিনি পরম অসাম্প্রদায়িক। মেয়েদের জাতি-ধর্ম নিয়ে কোনো প্রশ্ন কখনো তাঁর মনে জাগে না। এবং কেবলি যে মেয়েদের সাথে

তিনি গল্পই করেন এমন নয়। সেই সঙ্গে কুমারীত্ব মোচনের পটুত্বের নাহি তার সীমা।

'একাধিক রমণী-সম্ভোগ কোন্ নবী করেন নি শুনি?'—ডঃ খালেক তর্ক করে থাকেন, ' তাঁরা তৎকালিন যুগের রীতি অনুসারে একাধিক বিবাহ করতেন অথবা একাধিক ক্রীতদাসী রাখতেন। এখনকার সমাজে ঐ সব অচল। অতএব এখন যেটা জায়েজ আমরা তাই করবো। গোপনে প্রেম করবো আমরা।'

এ সব কথা অসার যতোই হোক, শুনতে ভালো লাগে। এবং সেই ভালো লাগার জন্যই সুদীপ্ত কখনো তর্ক করেন না। কেবল শুনেন। কথা ব'লে লাভ কী? ডঃ খালেকের মেজাজটাকে সুদীপ্ত ক্রমে ক্রমে চিনেছিলেন।

অতএব তিনি বেশি কিছু না বলে মাঝে মাঝে কেবল নিরীহ প্রশ্ন তুলে তাঁর কথা বলার ধরাটাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করেন। সুদীপ্ত যে তাঁকে কেবলি তাতিয়ে তুলে কিছু কথা বলিয়ে নিতে চান এটা ডঃ খালেক টের পান না। বরং সুদীপ্তর মধ্যে তাঁর একজন অনুরক্ত ভক্তকে লক্ষ্য ক'রে পুলকিত হন। আর সুদীপ্ত প্রশ্নও করেন ভারী চমৎকার। ঐ প্রশ্ন কানে শুনেও সুখ আছে।

'আচ্ছা ডঃ খালেক, মেয়েদের আপনি ভোলান কি করে?'

'কথা দিয়ে। সেরেফ কথার কায়দা।'

'বুঝতে পারলাম না? একটু নমুনা শুনিয়ে দিন।'

'বুঝলেন না। তবে একদিনের ঘটনা বলি শুনুন। একদিন একজনকে বললাম, 'বাসায় আজকাল একা আছি। আজ বিকেলে এসো বেড়াতে।'

'বললেন এ কথা! মেয়েটি চটল না।'?

'চটতে পারত। কিন্তু চটে নি। আর চটলেই বা কী? বুঝতাম এখানে সুবিধা হবে না। অন্য মেয়ের খোঁজ করতাম। আরে সাহেব, এ সব ব্যাপারে সেন্টিমেন্টাল হ'তে নেই, বুঝলেন। রাস্তার পাশে বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন। দেখলেন, বাসটা খালি নেই। সে জন্য তখন মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে যাবেন নাকি! পরবর্তী বাসের জন্য একটু অপেক্ষা করুন। শিগগিরই পেয়ে যাবেন।'

'এ তো হক কথা ! আচ্ছা তারপর? মেয়েটি কি বলেছিল?'

'হাঁ, সেই মেয়েটি। মেয়েটি আমার কথা শুনে কী রকম একটা ভঙ্গি করেছিল চোখ মুখের। তা বর্ণনার অসাধ্য। অনুকরণ করে দেখাতেও পারব না, মেয়েরাই পারে ঐ রকম করে চোখ মুখ বাঁকাতে। বাঁকা চোখে আমার পানে তাকিয়ে সে বলেছিল—বলছেন যেতে? গেলে কী হবে টা শুনি?—আচ্ছা এবার বলুন তো, এ কথার উত্তরে আপনি হ'লে কী বলতেন?'

কী বলা যায় এ ক্ষেত্রে? সুদীপ্ত যেন ভেবে পেলেন না। তবু বললেন—

'আমি হ'লে বলতাম কী আর হবে, গেলে ভালো লাগবে।'

'রাবিশ্! আপনি নাকি কবিতা লেখেন। ঐ কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে সে রেগে

স'রে যেত আপনার কাছ থেকে। আমি কী বলেছিলাম জানেন?সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠেছিলাম—তুমি গেলে আমার সাইবেরিয়ার শীতে একহাঁটু ফাল্গুনের উদয় হবে।'

এই হচ্ছেন ডঃ খালেক। নিজেকে তিনি বৈজ্ঞানিক বলে প্রচার করে থাকেন। প্রায়ই কথায় কথায় বলে থাকেন—

'আমরা পলিটিক্সের কি বুঝি! আর সাহিত্যেরই বা কি বুঝি! আমরা কাঠখোট্টা বৈজ্ঞানিক মানুষ .....ইত্যাদি।

ঠিকই তো। এম. এস-সি. ক্লাসে যখন বিজ্ঞান পড়ান তখন বৈজ্ঞানিক বৈ কি। এই বৈজ্ঞানিক সাহেব সাহিত্য কিংবা পলিটিক্স বোঝেন না।

কিন্তু একটি জিনিস বোঝেন, অন্ততঃ বোঝেন ব'লে দাবী করেন। সেটা ইসলাম। ইসলামের খেদমতের জন্য পাকিস্তান হয়েছে। আর পাকিস্তান বানিয়েছেন কায়েদে আযম, এবং পাকিস্তানের রক্ষক হচ্ছে সেনাবাহিনী। অতএব ইসলাম কায়েদে আযম, পাকিস্তান ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী—এদেরকে বিনা বিতর্কে মেনে নিতে হবে। ঈমানদার হ'তে হবে। খালেক সাহেবের মতে–

'পাকিস্তানী মুসলমানের ঈমানের পাঁচ স্তম্ভ হচ্ছে–আল্লাহ, আল্লাহর রসুল, কায়েদে আযম, পাকিস্তান আর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী।'

এই পাঁচের উপর অগাধ আস্থা স্থাপন করে খালেক সাহেব খাঁটি মুসলমান। অবশ্যই পাকিস্তানি মুসলমান। এই পাঁচের বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা, খালেক সাহেবের মতে, বিলকুল হারাম। সুদীপ্ত প্রথম দিকে এতো জানতেন না। তাই, প্রথম পরিচয়ের দিনই বেধেছিল একটা গন্ডগোল। তার আগের দিন একটি কান্ড ঘটে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। জামাতে ইসলামের এক দল ছাত্র অন্য একটি ছাত্র-প্রতিষ্ঠানের আয়োজিত একটি সভা পন্ড করতে গিয়ে মারামারি বাধিয়েছিল। সেই মারামারিতে মারা গেছে জামাতে ইসলামেরই একটি ছাত্র। জামাতে ইসলামের ছাত্র মারা গেছে! পাকিস্তানের পাক মাটিতে ইসলামের এতো অপমান! ডঃ খালেক যে কি পরিমাণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বেচারা সুদীপ্ত সেটা জানতেন না। অতএব আপন অজ্ঞাতেই সুদীপ্ত একটি গুনা ক'রে ফেলেছিলেন, ডঃ খালেকের একটি উক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন। ডঃ খালেকের বক্তব্য ছিল—

'শহীদের রক্ত যেখানে পড়েছে সেখানে মসজিদ বানাতে হবে।'

'ছেলেরা তো নিজেদের মধ্যে মারামারি ক'রে মরল ! ঐ ভাবে কেউ মরলে তাকে শহীদ বলা যায় নাকি! শহীদ মানে তো..... ।'

কথা শেষ করতে পারেন নি সুদীপ্ত। কথার মাঝখানে খালেক সাহেব ব'লে উঠেছিলেন—

আলবাৎ শহীদ বলা যায়। পাকিস্তানের সংহতি যারা নষ্ট করতে চায়

তাদেরকে রুখতে গিয়েই তো মরতে হ'ল ছেলেটাকে। তা হ'লে সে শহীদ হবে না কেন?"

'তাও হবে না।' সুদীপ্ত তর্ক তুললেন, 'তর্কের খাতিরে যদি ধ'রেও নিই যে বিপক্ষ দল পাকিস্তানকে দু'টুকরো করতে যাচ্ছিল, তা হলেও সে শহীদ হয় না। কেননা শহীদ মানে...

'আপনার মানে রাখুন। পাকিস্তান মানেই ইসলাম, ইসলাম মানেই পাকিস্তান। অতএব যে ছেলে ইসলামের সংহতি বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। সে শহীদ।'

না, এগোনো আর ঠিক নয়। সুদীপ্ত দেখলেন, অনেক অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে। সেটাকে এড়াবার জন্যই তিনি এবার ডঃ খালেকের কথায় সায় দিয়ে বললেন—

'হাঁ, ঐ ভাবে ভাবলে ছেলেটি অবশ্যই শহীদ হয়েছে। ওখানে এখন আপনারা আর একটা শহীদ মিনার তুলতে পারেন।'

ইতিপূর্বেই যে ডঃ খালেক সেখানে মসজিদ বানাবার কথা তুলেছেন সেটা তখন আর সুদীপ্তর মনে ছিল না। বেচারা সুদীপ্ত! বিতর্কের বদ্ধ ডোবাটাকে এড়াবার জন্য যেদিকে পা বাড়ালেন সেদিকেই ছিল সেই গর্ত। গর্তে পড়ে গেলেন সুদীপ্ত। ডঃ খালেক চিৎকার করে উঠলেন—

'শহীদ মিনার? আমরা বানাবো শহীদ মিনার! এতোই মালাউন ভাবলেন আমাদের? জেনে রাখুন, তেমন দিন এলে আপনাদের ঐ শহীদ মিনারকে ভাঙ্গব আমরা।'

'শহীদ মিনার ভেঙ্গে দেবেন!'— বিস্ময় প্রকাশ করেন সুদীপ্ত।

'এক শো বার ভাঙব। আপনারা সেখানে কুফরী কাম করবেন, শেরেক করবেন, আর সেটা আমরা ভাঙব না। ভেঙ্গে সেখানে বানাব মসজিদ।'

সুদীপ্ত আর নিজেকে সামলাতে পারেননি। আপনিই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—

'মধ্যযুগে শোনা যায় মুসলমানেরা মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ বানাত, সেটা তা হ'লে মিথ্যা নয়।'

হোয়াট? মুসলমানের নামে কাফের-প্রদত্ত এই কলঙ্কে বিশ্বাস করতে আপনার রুচিতে বাধল না?

'আপনি তা বলে চটবেন না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়। কথা হচ্ছে ঢাকা শহরে এতো মসজিদ। সেখানে আবার মসজিদ বানালে.......'

আলবৎ মসজিদ বানাতে হবে। দরকার হলে সারা ঢাকা শহরকেই আমরা মসজিদ বানিয়ে ছাড়বো।'

'সেটা অবশ্য একটা কীর্তি হবে।'— খুব আস্তে বলেছিলেন সুদীপ্ত। এবং মৃদু হেসেছিলেন।

'কীর্তি? আপনি ঠাট্টা করছেন?'

'একটুও না। সারা ঢাকা শহর যদি একটা মসজিদ হয় তা হ'লে বিশ্বের মধ্যে সেটা কীর্তি হবে না! কী যে বলেন!'

সহসা কি ভেবে ডঃ খালেক উত্তেজনা দমন ক'রে নিয়েছিলেন। তা দেখে অবাক হয়েছিলেন সুদীপ্ত। কী ঘটল আবার! নাকি ইচ্ছে করে রঙ বদলাচ্ছেন! ক্ষণে ক্ষণে এমন করে যারা পালটাতে পারে তারা কী ধরনের মানুষ? না, মানুষ তারা নয়। হয় শয়তান, না হয় ফেরেশতা। ডঃ খালেক কোনটা? হয়ত শেষেরটাই হবেন। ডঃ খালেক সম্পর্কে ভালো ধারণাই মনে পোষণ করতে চেষ্টা করলেন সুদীপ্ত। খালেক সাহেব খুব খাটো গলায় ব'লে উঠলেন—

'যাক, এ নিয়ে আমি আর তর্ক করব না আপনার সাথে। কেউই আমরা পরস্পরকে এখনো ভালোভাবে জানি নে। তবে বন্ধুভাবে একটা উপদেশ আপনাকে দিতে পারি। হিন্দুস্থান থেকে তাড়া খেয়ে এসেছেন কেন?—এ প্রশ্নটা কখনো যেন মুছে দেবেন না মন থেকে।'

কিন্তু মুছতেই হবে যে। দূরের একটা মানুষ সম্পর্কে মনে বিরূপতা পোষণ ক'রে হয়ত বাঁচা যায়। কিন্তু প্রতিবেশী সম্পর্কে? একেবারে বেঁচে থাকার স্বার্থেই পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বোঝাপড়া গ'ড়ে তুলতেই হবে। সুদীপ্ত একথা অকপট ভাবেই বিশ্বাস করেন। তা ছাড়াও একটা প্রশ্নকে তিনি কখনো এড়াতে পারেন না—মানুষের সাথে কি অন্তরঙ্গতা জমে ওঠে কেবলি ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে? প্রশ্নটাকে তিনি মনেই চেপে রেখে সেদিনের মতো খালেক সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় ইতি টেনে দিলেন।

কিন্তু খালেক সাহেবকে কোন দিনই আর প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারেন নি সুদীপ্ত। বিশেষতঃ হিন্দু হলেই তাকে মুসলমানের শত্রু মনে করতে হবে—এটা কি ধরনের মানসিকতা? সেখানে বিনয়দারা ছিলেন না? এখানে প্রফেসর দেবকে এরা দেখতে পায় না। একদিন প্রফেসর দেবকে সুদীপ্ত দেখেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে। মসজিদে হজরত মোহাম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠান হচ্ছিল। বিশ্বের একজন মহামানবের জন্ম দিন। তাতে যোগ দেবার অধিকার সকলেরই আছে না? সেখানে হজরত মোহাম্মদের জীবনী আলোচনা হল, মিলাদ হ'ল- সবেই যোগ দিলেন ডঃ দেব। সুদীপ্ত দেখলেন। এবং ডঃ খালেকের পেড়াপীড়িতে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসার জন্য মনে মনে যে ক্ষোভটা ছিল তা ভুলে গেলেন। এই ধরনের অনুষ্ঠানে সুদীপ্ত কখনো যান না। এবং নামাযের জন্য কখনো মসজিদে না গেলেও এ ধরনের অনুষ্ঠানে খালেক সাহেব সর্বদাই যোগ দিয়ে থাকেন। আজ তিনি একা নিজে আসেন নি, সুদীপ্তকেও ডেকে এনেছেন। অগত্যা সুদীপ্ত এসেছেন। এবং এসেই ডঃ দেবকে দেখে প্রথমে বিস্মিত হয়েছেন, পরে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েছেন। হাঁ সত্যিকার একজন দার্শনিকের পক্ষেই এ পোড়া দেশে এমন উদার মানসিকতাকে লালন করা সম্ভব। কিন্তু ডঃ দেবের এই উদার মানসিকতাকে ডঃ

খালেকেরা কী দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিলেন?

ফেরবার পথে ডঃ খালেকই তুললেন কথাটা—

'মালাউনের কান্ডটা দেখলেন, কেমন ক'রে মসজিদের ইজ্জত নষ্ট করে দিলে।'

সুদীপ্তর সমস্ত চিত্ত ঘৃণায় রি-রি করে উঠল। মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললেন,এই লোকটার সাথে কখনো আর মেশা হবে না। গাড়িতে না হলে এই মুহূর্তেই লোকটাকে এড়িয়ে উলটো পথে হাঁটা শুরু করতেন। আপাততঃ এড়াবার পথ না পেয়ে,এবং এক সাথে চলতে বাধ্য হয়ে,সুদীপ্ত বললেন—

'আমার তো মনে হল মসজিদের ইজ্জত আরো বেড়ে গেল।'

'কিভাবে? আমাকে বুঝান।'—কী ভেবে যেন ডঃ খালেক আজ চটলেন না। হয়ত তিনি জানেন গাড়ি চালাবার সময় চটতে নেই, কোনো বিপত্তি ঘটতে পারে। হয়ত বা অন্য কোন কারণ ছিল। যাই হোক, এদিকে সুদীপ্তও কিন্তু বাঁকা পথ ধরলেন। খালেকের কথার সরাসরি কোনো জবাব না দিয়ে বললেন—

'বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে আপনিই তো অন্যকে বোঝাবেন। অন্যে আপনাকে বোঝাবে এটা হয় কি ক'রে?'

'ও সব চুটকি কথা দিয়ে আমাদের ভোলাতে পারবেন না সাহেব। ফাজলামো ক'রে আসল কথাটা এড়াতে চাইছেন তো! কিন্তু আমাদের কাছে সোজা কথাটা শুনুন। ঐ ডঃ দেব পাকিস্তানের একটা দুশমন।'

নাহ, এখানে আর কোনো কথা বলাই উচিত নয়। সুদীপ্ত চুপ করে গেলেন। কিন্তু খালেক সাহেব বোধ হয় চুপ থাকতে জানেন না। তিনি চেপে ধরলেন সুদীপ্তকে—

'এ কথা আপনি স্বীকার করেন?'

হাঁ, এবার কিছু একটা বলতেই হয়। খুবই গম্ভীর স্বরে সুদীপ্ত বললেন—

ড: দেব সম্পর্কে যখন অন্য কিছু জানিনে তখন—'

'তখন? থামলেন কেন, বলুন।'

'বলছি। আজকে যে উদরতা তাঁর মধ্যে দেখলাম সেটা....'

'সেটা পাকিস্তানের পক্ষে বিপজ্জনক,' সুদীপ্তকে বাক্য শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠলেন ডঃ খালেক, 'ধর্মের জগাখিচুড়ি পাকিস্তানে চলবে না। বিশুদ্ধ ইসলামের থেকে এক ইঞ্চি স'রে গেলেই পাকিস্তান মারা পরবে—এই আপনাদের আমি ব'লে থুলাম।'

ডঃ খালেকের গাড়ি ততক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাব-প্রাঙ্গণে এসে ঢুকেছে। গাড়ি থেকে নামতে নামতেই সুদীপ্ত প্রশ্ন করলেন—

'কিন্তু ডঃ দেব যে আপনাদেরকে বিশুদ্ধ ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে চাইছেন তার প্রামাণটা কী?'

'আমাদেরকে? আমাদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে কেটা? ইসলাম থেকে বিচ্যুত করবে আপনাদেরকে। বিচ্যুত করবে ঐ উদারতার টোপ গিলিয়ে। মুসলমান ছেলেকে পালিত পুত্র করেন কেন-কোন দিন ভেবে দেখেছেন সেই কথাটা?'

'এতে ভাবার কি আছে। বাঁচার দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমান সত্য নয়। সত্য হচ্ছে মানুষ। তিনি পালিত পুত্র হিসাবে গ্রহন করেন মানব-সন্তানকে, মুসলমানকে বা হিন্দুকে নয়।'

'ঐ সবই হচ্ছে হিন্দুস্থানী চালবাজি। হিন্দু বা মুসলমানের ভেদাভেদটাই যদি না থাকল তা হলে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের ভেদাভেদটাই বা থাকল কোনখানে? অতএব হিন্দু বা মুসলমানের ভেদাভেদ যারা মানবেন না তাঁরা পাকিস্তানি আদর্শের বরোধী। পাকিস্তানের শত্রু তাঁরা।'

এই ভাবে ডঃ খালেক সেদিন ডঃ দেবকে পাকিস্তানের শত্রু বানিয়ে ছেড়ে ছিলেন। ডঃ খালেকের দৃষ্টিভঙ্গিই কি তবে সঞ্চারিত হয়েছে পাকিস্তানি সামরিক চক্রের মধ্যে? নাকি সামরিক চক্রের কণ্ঠস্বরই সেদিন শোনা গিয়েছিল খালেক সাহেবের মধ্যে? খালেক সাহেব কি তবে সামরিক চক্রের হিজ মাষ্টারস ভয়েস? অন্ততঃ ডঃ দেব সম্পর্কে খালেক সাহেব ও সামরিক চক্রের চিন্তাধারা একই দিকে প্রবাহিত বলে মনে হয়—উভয়েই সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ডঃ দেব পাকিস্তানের শত্রু। তাই যদি হয়, সুদীপ্তর মনে হল তা হলে আমরাও পাকিস্তানের শত্রু। ডঃ দেবের আদর্শ ও পাকিস্তানি আদর্শ (অবশ্য ডঃ খালেকদের পাকিস্তান)-এই দুয়ের মধ্যে আমাদের নিকট বরণীয় হবে কোনটি? নি:সন্দেহে প্রথমটাই।

ডঃ দেবকে ও তার পুত্রকে একই সারিতে দাঁড়িয়ে দিয়ে ওরা গুলি করে। পাশাপাশি লুটিয়ে পড়ে দুটি দেহ। ওরা পিতা-পুত্র। কিন্তু রক্তের মিল ছিল কোথায়? ওদের রক্তের মিল হয়েছে ওদের মৃত্যুর পর। এমনি রক্তের মিল হয়েছিল আরো দুজনের। দুজন প্রখ্যাত অধ্যাপক পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান ও ইংরেজি বিভাগের রীডার ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। চৌত্রিশ নম্বর বিল্ডিংয়ের দুটি ভিন্ন ফ্ল্যাটে তাঁরা থাকতেন। নিজ নিজ ধর্মে দু'জনেরই নিষ্ঠা ছিল প্রবল। পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দুজনকে গুলি করা হলে রক্তের ধারা মিশে গিয়েছিল। সিমেন্ট বাঁধনো মেঝেতে সেই মিশে যাওয়া রক্তের জমাটবদ্ধতা অনেকেই তো দেখেছিলেন। দেখেছিলেন সুদীপ্ত কিন্তু সে রক্তের কোন্ অংশ মুসলমানের, আর কোন টুকুই বা হিন্দুর তা কি চেনা গিয়েছিল? আর কতো মর্মান্তিক ছিল সেই দৃশ্য—সেই রক্তমাখা পায়ের ছাপ। একাধিক পায়ের অনেক ছাপ পড়েছে কংক্রিট-বাঁধানো আসা-যাওয়ার পথের উপর। সে যেন দেখা যায় না। কিন্তু যা দেখা যায় না তা-ই যে ঘুরে ঘুরে দেখতে হচ্ছে সারাক্ষণ।

শহীদ মিনারের সামনে এতো কী দেখার ছিল সুদীপ্তর? চৌত্রিশ নম্বর বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ দিকে রাস্তার ওপাশে শহীদ মিনার। বিচূর্ণীকৃত শহীদ মিনারের সামনে সুদীপ্ত কাল সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল ফিরোজের আহবানে। মাত্র গত কালের কথা। কিন্তু সুদীপ্তর এখন মনে হচ্ছে সে কথা কত কালের। গাড়িতে উঠবার সময় সুদীপ্ত কোনো কথা বলেন নি। কেবল ফিরোজ বলেছি-লেন–

'যাক, তোমাকে পেলাম তা'হলে।'

সুদীপ্তকে যে পাওয়া যাবে ফিরোজ সে আশা করেন নি। ফিরতি পথে তিনি তখন সুদীপ্তর সন্ধানেই যাচ্ছিলেন। আর ভাবছিলেন, ওরা কি আছে! কী অবস্থায় না জানি দেখতে হবে ওদেরকে! ভাবতে ভাবতেই সুদীপ্তকে সামনে পেয়েছিলেন। শহীদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

এই জন্যই পাগলটার সাথে এতো বন্ধুত্ব ফিরোজের। কী কান্ড দেখ দেখি। ছত্রিশ ঘন্টা কারফিউয়ের পর কোথায় বৌ-ছেলে ফেলে শহীদ মিনারের সামনে এখন কাঁদতে এসেছে। শহীদ মিনারের শোকটাই তার কাছে বড়ো হয়েছে। কিন্তু অস্বাভাবিক হয়েছে কি? একটুও না। শুধু সুদীপ্ত কেন। কোন্ বাঙালি আজ এই পথে যেতে চোখের পানি মুছছে না? মেডিক্যাল কলেজের পথে এইখানে ফিরোজও তো কেঁদে গিয়েছেন তখন।

'চল, গুহঠাকুরতা স্যারের দু:সংবাদ শুনলাম। একটু দেখি গিয়ে।'

–গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ফিরোজ বললেন।

কিন্তু কি আর দেখবেন তারা। কিছুই দেখার ছিল না। ছিল শুধু রক্ত, রক্তের ছাপ, রক্তের বন্যা। প্রবেশ-পথের প্রশস্ত চাতালের মধ্যে এক চুল স্থানও পাওয়া গেল না যা রক্ত প্লাবিত নয়। সদর রাস্তা থেকে প্রবেশ-দ্বার পর্যন্ত পথটুকু সবটাই রক্ত-চিহ্নিত। রক্তের ধারা গড়িয়ে গেছে নর্দমায়।

ফিরোজের দুর্ভাগ্য। গুহঠাকুরতা স্যারের পুরো সংবাদ পান নি। পেলে এখানে আসতেন না। যেতেন হাসপাতালে। হাসপাতালে ঢুকলে দেখতেন, স্যার তখন দিব্যি কথা বলছেন। শরীরের এক অংশ অবশ হয়ে গেছে, কিন্তু কথা বলতে পারছেন এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা ব্যক্ত করছেন—

'বোধহয় উঠতে আর পারবো না। শুয়ে বসে কাটাতে হবে। ঠিক আছে। ব'সে ব'সে বই লিখব। তাতেই চলে যাবে আমাদের।'

কিন্তু হায় চলতে দিচ্ছে কে? মাত্র কয়েক ঘন্টার ওপারে মানব জীবনের চরম ঘটনাটি তখন প্রতীক্ষা করছে তার জন্য। ইয়াহিয়ার বর্বর সৈনিকেরা রাতেই যে কাজটি সম্পন্ন করতে চেয়েছিল তা সম্পন্ন হয়েছিল দিন দুই তিন পর। হাঁ, ইয়াহিয়ার পিচাশ সৈনিক একেবারে সাবাড় ক'রে দেওয়ার জন্যই গুলি করেছিল গুহঠাকুরতা স্যারকে। কিন্তু গুলি তাঁর ঠিক জায়গায় লাগে নি। তা হলেও সে রাতে কি রক্ষা পাওয়ার উপায় ছিল? সর্বত্রই মৃতদেহ তারা

রাখেন। কোথাও কোথাও গর্ত করে আশেপাশের লাশগুলিকে তারা মাটি-চাপা দিয়েছিল। কেবলি লাশগুলিকে? ওরে বাবা, তা হলে রক্ষে থাকবে কিছু? সেনাপতি চেয়েছেন, কাউকে আধ-মরা ক'রে ফেলে রাখা চলবে না। বাঙালি তবে আবার বেঁচে উঠে হাঙ্গামা শুরু করবে। অতএব একেবারে সব মেরে লাশ বানিয়ে দাও সৈনিকদের শকুন-দৃষ্টিতে সে রাতে, তাই, আহত ব'লে কিছু ছিল না, ছিল কেবল লাশ। সে রাতে আহত-নিহত নির্বিচারে সকলকে পুঁতে দিয়ে অভূতপূর্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তানিরা। অধ্যাপক মনিরুজ্জামান ও তাঁর পুত্রসহ অন্য দু'জন আত্মীয়ের মৃতদেহ যখন টেনে নিয়ে গিয়ে জগন্নাথ হল-প্রাঙ্গণে গর্তে মাটি-চাপা দেয়া হয়েছিল তখন কি আহত অধ্যাপক গুহটাকুরতা অব্যাহতি পেতেন ওদের হাতে? কিন্তু হায় অব্যাহতি পেয়ে লাভ কী হ'ল? তাঁকে রাখা তো গেল না। এ বেদনা কী ক'রে বহন করবেন বাসন্তী দি। অধ্যাপক ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার স্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তী গুহঠাকুরতা–গেন্ডারিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর জন্য নিজস্ব বাসভবন আছে। সেখানেই তাঁরা থাকতেন এতকাল। স্ত্রীর সুবিধার জন্য স্বামী অসুবিধা ভোগ করেছেন দীর্ঘকাল। সুদূর গেন্ডারিয়া থেকে নীলক্ষেত আসা-যাওয়া করেছেন। অতঃপর-ডঃ গুহঠাকুরতা জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট হ'লে তারা উঠে এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িতে। এই তো কয়েক মাস মাত্র আগে এসেছেন। যদি সেখানেই থেকে যেতেন তারা। কিন্তু গেন্ডারিয়াতেই কি হত্যাকান্ড বাদ গেছে নাকি! না, সে স্থানও নিরাপদ ছিল না। অধ্যাপক মনিরুজ্জামান পূর্বে যে তেইশ নম্বর বিল্ডিংয়ের সামনে একটা ফ্ল্যাটে থাকতেন সেটাই কি নিরাপাদ ছিল? তবু অনেকেই বলেছেন, বাসা বদল না করলে ওদের এই বিপত্তি ঘটত না। ও সব কথা লোকেই বলে। মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রী বলেন না। মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রীর মতো অমন মহিয়সী তেজস্বিনী মহিলা হয় না—কথাটা বাসন্তীদির। তাঁর কথা মনে হ'লে বাসন্তী দির সারা মন কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠে অত সাহস তিনি পেয়েছিলেন কোথায়? তাঁর বাড়ির সকলকেই তো ওরা মেরেছিল–তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, স্বামী, স্বামীর ছোট ভাই এবং একটি ভাইপো—কেউ রেহাই পায়নি। কোলের শিশুপুত্র নিয়ে কেবল বেঁচেছিলেন তিনি নিজে। আর বেঁচেছিল একটি বিবাহযোগ্য কন্যা–তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো। দুর্বৃত্তদের নজরে পড়ে নি। বড় ছেলে এ বছর এস. এস. সি. পরীক্ষা দিত। সেই ছেলেকেও যখন ওরা মারলে তখন কি আর মাথা ঠিক থাকার কথা। কিন্তু তবু ঠিক রেখেছিলেন মহিলা। বেঁচে যাওয়া শিশু-পুত্রটি মায়ের সঙ্গে পিছে পিছে এসে মাকে প্রশ্ন করেছিল—

"আব্বা ভাইয়া ওরা সব এখানে শুয়েছে কেন আম্মা?"

সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে ছেলেকে বুকে নিয়ে হু হু করে চোখের পানিতে বুক

ভাসিয়েছিলেন বেগম মনিরুজ্জামান। বাপ রে তোর জন্যই আমাকে বাঁচতে হবে। মনে মনে বলেছিলেন। এবং তখনো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন নি।

দুর্বৃত্তরা স্বামী-সন্তানকে এই রাতে নিচে নিয়ে গেল কি মারবার জন্য?–নিজের ফ্ল্যাটে কিছুক্ষণ বড়ো অস্থির হয়ে এ-ঘর ও-ঘর করেছিলেন। তারপর একাই নিচে নেমে এসেছিলেন—তাঁদের তিন তলার ফ্ল্যাট থেকে এক তলায়। তখনি কখন মায়ের সঙ্গে পিছে পিছে এসেছিল চার বছরের সেই শিশুপুত্র।

নিচে সেই দৃশ্য দেখে একটুও অবাক হন নি বেগম মনিরুজ্জামান। তাঁরা পাঁচজন প'ড়ে আছেন। প্রবেশ-পথের রক্তধৌত প্রশস্ত চাতালে প'ড়ে দু'একজন তখনও কাতরাচ্ছেন। কারা তাঁরা?–এ প্রশ্ন মনে না তুলে সেই মুহূর্তেই তিনি ছুটে গিয়েছিলেন উপরে। এক বোতল পানি ও চামচ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর বুকের মানিক বড়ো ছেলেটি তাকাচ্ছে তখনও। মাকে দেখে চোখ দু'টো একটু বড়ো-বড়ো হ'ল শুধু। তার পরেই সে যে চোখ বন্ধ করল আর তা খোলে নি কখনো। মা তাড়াতাড়ি এক চামচ পানি দিয়েছিলেন মুখে। কিন্তু খেতে পারে নি। গাল বেয়ে গড়িয়ে গিয়েছিল। বুকের স্তন্য দানে যাকে মানুষ করেছিলেন মৃত্যুকালে একটু পানি পর্যন্ত তাকে খাওয়ানোর সুযোগ পেলেন না—ছেলে চ'লে গেল। কিন্তু ওই ভদ্রলোক তো বেঁচে আছেন—নিচের তলার সেই হিন্দু অধ্যাপকটি জল চাইছেন। পর্দানশীন মহিলা। কখনো সামনে যান নি। কিন্তু এখন তাকে কতো কালের চেনা ভাইয়ের মতো মনে হ'ল। কাছে গিয়ে চামচ দিয়ে জল দিলেন মুখে। কয়েক চামচ খাওয়ানোর পরই মনে হ'ল এখনো তো এঁর বাঁচার সম্ভাবনা আছে। তখনি গিয়ে কপাটে ধাক্কা দিলেন—

'দিদি, বের হন। আপনার সাহেবকে ঘরে নিন। আমার সাহেব মারা গেছেন। আপনার সাহেব এখনও বেঁচে আছেন।'

কথাগুলি বাসন্তী দি কখনও ভোলেন নি। সেই দুর্যোগের রাতে স্বামীকে ধ'রে নিয়ে গেলে একমাত্র কিশোরী কন্যাকে বুকে নিয়ে বাসন্তী দি যখন অতি মাত্রায় অসহায় বোধ করেছিলেন ঠিক তখনই যেন তাঁর বোনের ছদ্মবেশে কোন দেবী এসে তাঁকে ডাক দিলেন—দিদি বের হন, আপনার সাহেব এখনো বেঁচে আছেন। কিন্তু আরো কি একটা কথা বলল যেন—আমার সাহেব মারা গেছেন। বোন আমার, এ তুই কী শোনালি। হু-হু করে কেঁদে উঠেছিল বাসন্তী দির বুকের ভিতরটা।

বাসন্তী দি কয়েকবার ডাক দিতেই তাঁর গাড়ির ড্রাইভার সাহস ক'রে বেরিয়ে এসেছিল। গ্যারেজের উপর তলার একটি কামরায় সে থাকত। তার সাহায্যে মা ও মেয়েতে মিলে স্বামীকে ঘরে তুলেছিলেন তাঁরা।

অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যে আবার জওয়ানরা এসেছিল। ধ'রে এনেছিল বস্তির কয়েকজন লোক। লাশগুলি টেনে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছিল তাদের উপর। হায় হায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক—একটি বিভাগের প্রধান

তাঁর ঠ্যাং ধরে এমনি ক'রে টানতে টানতে নিয়ে গেল। তিনি জানলা দিয়ে দেখলেন। বস্তিবাসীদের দোষ ছিল না। তারা ধরাধরি ক'রে নিয়ে যেতে চেয়েছিল; কিন্তু চাওয়ার তাদের কোন মূল্য আছে? বর্বরদের গুঁতোর চোটে তাদেরকেও বর্বর কাম করতে হয়েছিল। তবু শেষ রক্ষা হয় নি। তাঁরা বাঁচেনি একজনও।

জগন্নাথ হলের মাঠে আরো অনেকগুলি বস্তিবাসী বিভিন্ন দিক থেকে মৃত-দেহ কুড়িয়ে এনে একত্রে জড়ো করছিল। তাদের পিছে পিছে সঙ্গিন উঁচিয়ে এসেছিল জওয়ানেরা। অতঃপর হুকুম হয়েছিল গর্ত কর। ঝুড়ি কোদাল কোথা থেকে জওয়ানেরাই দিয়েছিল, এবং সে জওয়ানদেরকে খুবই কষ্ট করে কয়েক ঘন্টা অনবরত প্রবল গালি ও বুটের লাথি চালাতে হয়েছিল। তবেই না শেষ পর্যন্ত মনমত হয়েছিল গর্তটা। তখনও কাতরাচ্ছে এমন কিছু আহত ব্যক্তিকেও অনেক শবের সঙ্গে সেই গর্তে ফেলে দেওয়ার পর এসেছিল বস্তিবাসীদের পালা। লম্বা গর্তটার পাশে তাদেরকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে ব'লে জওয়ানরা চাঁদমারি অভ্যাস করেছিল। একটি একটি করে সব ক'টি বস্তিবাসী গর্তে পড়ে গেলে বাকি কাজটুকু করতে হয়েছিল জওয়ানদের। পাশের স্তূপীকৃত মাটি ঠেলে দিয়ে জায়গাটা ভরাট করতে হয়েছিল তাদেরকে।

জায়গাটা সুদীপ্ত ও ফিরোজ দেখলেন। চৌত্রিশ নম্বর থেকে বেরিয়ে এখানেই এলেন তারা। একটু আগেই ফিরোজ এ স্থানের কথা শুনে এসেছেন এবং স্বচক্ষে জায়গাটা দেখবেন বলে মন ঠিক ক'রেই এদিকে এসেছেন। না, এখানে তো সেই ভয়টা নেই।

কিন্তু চৌত্রিশ নম্বরের সিঁড়ির কাছে অত ভয় পেয়েছিলেন কেন তাঁরা! এক খন্ড ভয়ের পাথর কে যেন বুকের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিল। শরীর-ভারী হয়ে আসছিল। যন্ত্রণার অতলে ইহজীবনটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না-কি। হায়, রাস্তায় তবু মানুষ দেখা যাচ্ছিলো। ওখানে একটা মশাও নেই। শহীদ মিনারের এতো কাছে এতো নির্জনতম এ স্থান ঢাকা শহরে ছিল! মনে হচ্ছিলো যেন কোনো রাক্ষসপুরীতে এসেছেন তারা! যেসব হতভাগা রাক্ষসের মুখের গ্রাস হয়েছেন ঐ সব রক্ত বোধ হয় তাদের। একটা অস্বাভাবিক ভীতিকবলিত অবস্থায় তাড়াতাড়ি তাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন সেখান থেকে। অবস্থাটা ছিল সহ্যের অতীত।

মরহুম আবদুল হাইয়ের ছেলে-মেয়েরা ঐ দালানেই থাকতেন। ডঃ গুহঠাকুরতার বিপরীত ফ্ল্যাটটাতে! তাঁরাই বা সব গেছেন কোথায়! বেঁচে আছেন তো! কেনো নিরাপদ এলাকায় তাঁরা চলে যেতে পেরেছেন তো! আহা, বেঁচে থাকুন তাঁরা! প্রফেসর হাইয়ের মৃত্যুর দিনটি মনে হ'লে সুদীপ্ত এখনো শিউরে উঠেন। এমন দুর্ভাগ্যও মানুষের হয়! মৃত্যু নির্মম কিন্তু তা যে কখনো অতি বীভৎসও হতে পারে সে কথা সেদিন সেই রেল লাইনের ধারে প্রফেসর

হাইয়ের দুর্ঘটনা কবলিত লাশ দেখার পূর্বে সুদীপ্তর ধারণাতীত ছিল। হ'লই বা তার নাম মৃত্যু, এতো হৃদয়হীন হ'তে হবে তাকে! সেই লাশ যেন ছিল জীবনের প্রতি একটি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ।

সমস্ত জীবনটাকেই একটা তীব্র বিদ্রূপ ব'লে সুদীপ্তর মনে হ'ল যখন তিনি জগন্নাথ হলের মাঠে সদ্য পুঁতে দেওয়া নারী-পুরুষের কারো হাতের আঙ্গুল, কারো পায়ের কিয়দংশ মাটি-ফুঁড়ে বেরুনো বৃক্ষ-শিশুর মতো মাথা তুলে থাকতে দেখলেন! কতো শব এইখানে পুঁতেছে ওরা? এবং এমনি কতো স্থানে? তবু এখনো ঘরে-বাইরে এতো! মেরেছে তাহ'লে কতো! ঢাকা শহরে কতো মানুষ মেরেছে ওই জানোয়ারের দল?—প্রশ্নটা একটা হাতবোমার মতো এসে ফেটে পড়ল ফিরোজের চিন্তার মধ্যে।

না, বেশি মারে নি। সংখ্যাটা হাজারের ঘরে ছাড়িয়ে লাখের ঘরে ওঠে নি। সেনাপতির আদেশ পুরোপুরি পালন করা ওদের সৈনিকদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কী আদেশ ছিল ওদের প্রচন্ড সেনাপতির? সুদীপ্ত কিংবা ফিরোজ কেউই তা জানেন না। কল্পনা করতে বললেও তাঁরা ফেল মারবেন। সেনাপতি টিক্কা খাঁ আদেশ দিয়েছিল—বাঙালিদের তোমরা হত্যা কর, তাদের দোকানপাট লুট কর, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দাও, তাদের মেয়েদের ধর্ষণ কর। এই আদেশ দেবার আগে ছোট একটি ভূমিকাও দিয়েছিল টিক্কা খাঁ—জওয়ান ভাই সব, তোমাদের জন্য প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তোমাদের গর্ব বোধ করেন। তোমরা পাকিস্তানের গৌরব। পাকিস্তান ও ইসলামকে রক্ষার মহান দায়িত্ব তোমাদের উপর। এই যে সব বাঙালিদের দেখছো, এরা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইসলামকে ভুলে গিয়ে সকলে হিন্দু হয়ে যাচ্ছে। অতএব এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধ হবে না, তা হবে পুরোপুরি জেহাদ।

জেহাদের সওয়াব-লাভে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাক-জওয়ানরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালিদের উপর। কয়েক লক্ষ নিরস্ত্র বাঙালিকে মারতে বেরিয়েছিল আধুনিকতম মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত বীর পুরুষের দল—পাকিস্তানি বীর পুরুষ।

'চল যাই। আমিনা বোধহয় চিন্তিত হয়ে পড়বে।'

সুদীপ্ত চ'লে যাইতে চাইলেন। আমিনার চিন্তা অবশ্যই আর একটা কারণ। ওপরে নিচে সামনে চতুর্দিকে মৃতদেহ—মাঝখানে একা তিনটি শিশু-সন্তান নিয়ে একটি মহিলা। দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক, বৈ কি। কিন্তু তা ছাড়াও সুদীপ্তর নিজেরও এখন কেমন অস্বস্তি লাগছে।

ফিরোজ সুদীপ্তকে নিয়ে সোজা চ'লে এলেন নীলক্ষেতের তেইশ নম্বর বিল্ডিংয়ে। গাড়ি থেকে নামতে নামতেই ফিরোজ বললেন—

'তুমি ওপরে চল। আমি একটু চট ক'রে ইকবাল হলের ভেতরটা দেখে আসি। দেরী হবে না। তোমরা গোছগাছ করতে করতেই এসে পড়ব।'

বলতে বলতেই ফিরোজ ইকবাল হলের দিকে লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু

ক'রে দিলেন। কিন্তু গাড়ি নিয়ে গেলেন না যে! ওরে বাবা ইকবাল হলের সামনে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢোকা মানে তো বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে রেখে যাওয়া। সুদীপ্ত একবার ফিরোজের হেঁটে-যাওয়া দেখলেন। চার পাশে চেয়ে দেখলেন, নীলক্ষেত এলাকা তখন প্রায় ফাঁকা। তেইশ নম্বর বিল্ডিংকে দেখলেন। তার সারা অঙ্গে বসন্তের ক্ষতচিহ্নের মতো বুলেটের দাগ।

ইকবাল হলে ঢুকবার মুখে একজনের সঙ্গ পেলেন ফিরোজ। তাঁর পরিচিত এক সাংবাদিক। এই সাংবাদিক ভদ্রলোকের কাছেই ফিরোজ খবর পেলেন–The people নেই। সেই অকুতোভয় ইংরেজি দৈনিক The people তার সব কিছু সহ আগাগোড়া ভস্মীভূত। 'ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ'-এর খবর আগেই পেয়েছিলেন। বর্বরদের যতো আক্রোশ যে শিক্ষায়তন ও প্রেসগুলির উপর। ওরা আমাদের চিন্তাবৃত্তির মেরুদন্ডটাই ভেঙে দিতে চায় নাকি। সাংবাদিক ভদ্রলোক নিজে থেকেই খবরটা দিলেন–

'The people-এর কয়েকজন কর্মী ও সাংবাদিককেও গুলি ক'রে হত্যা করেছে ওরা।'

'আবিদুর রহমান সাহেব?'

'আবিদুর রহমান সাহেবের খবর আমরা এখনো কেউ জানি নে। তবে পঁচিশ তারিখে রাত দশটার দিকে কোনো কাজে তিনি বাইরে গিয়েছিলেন।'

আল্লাহ্, তিনি যেন বেঁচে থাকেন। মনে মনে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করলেন ফিরোজ। কতজনের দীর্ঘজীবনই তো গতকাল থেকে তিনি কামনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কয়জনেরই বা খোঁজ পেয়েছেন। বা খোঁজ নিতে পেরেছেন। একদিন সব হিসেব নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তখন কি শামসুর রাহমানের সেই কবিতার চরণটাই সত্য হবে—সারা বাংলাটাই তখন শহীদ মিনার হয়ে যাবে।

তাঁরা দু'জনেই কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে হলটা দেখলেন। কিন্তু দেখবার কিছু ছিল না। এই দিনটিতে ঠিক যেমনটি দেখবেন ব'লে প্রস্তুত হয়ে আছেন সারা ইকবাল হল হয়ে আছে ঠিক তেমনি। কোনো ব্যতিক্রম নেই। ঘরে-বারান্দায় ইতস্তত পড়ে আছে কয়েকটি শব। কিন্তু সে নেই। হয়ত বেঁচে গেছে। মীনাক্ষীর এক খালাতো ভাই। চব্বিশে মার্চেও হলে ছিল ছেলেটি। তাঁর খোঁজেই বিশেষ ক'রে হলে ঢুকেছেন ফিরোজ। মীনাক্ষী যা হোক একটা সত্য সান্ত্বনা পাবে এখন। সে যে হলের মধ্যেই মারা পড়ে নি সে কথা এখন সত্য বলেই মনে হচ্ছে। অন্ততঃ মীনাক্ষীর শোকাহত চিত্তকে কিছুটা সান্ত্বনা দেওয়া তো যাবে। ছাদের উপর থেকে শুরু করে একেবারে নিচের তলার ঘরগুলি পর্যন্ত সবটাই যতোটা সম্ভব দেখে নেবার চেষ্টা করলেন ফিরোজ। অবশ্য দ্রুত এবং কিছুটা সন্ত্রস্তভাবে। হাঁ বেশ ভয় করছে। স্ত্রীর ভাইয়ের ব্যাপার না হ'লে এখানে তিনি ঢুকতেন না। কী করেছে খবিশগুলো হলটাকে। মাঝে মাঝে দু-একটা ঘরে বই কাগজ, বিছানা-বালিশ সব কিছু পুড়িয়ে দেওয়া ছাই ছড়িয়ে

আছে। বহু-ঘরের জানলা-দরজা ভাঙ্গা। দেয়ালের গায়ে-কামানের গোলায় তৈরী বিরাট ছিদ্রগুলি তাঁরা দেখলেন। দেখলেন, হল অফিসের আসবাব-পত্র খাতা-কাগজ ফাইল কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তার পরিবর্তে গাদা-গাদা ছাই শুধু। সমস্ত মনকেই এমনি ছাই ক'রে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন ফিরোজ।

সুদীপ্তর ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখেন, তিনি খাচ্ছেন এবং ছোট মেয়ে বেলাকে খাওয়াচ্ছেন। কী আশ্চর্য! এখানে বসে সুদীপ্ত খাচ্ছে! ইকবাল হলের মসজিদের ছাদে পড়ে থাকা শবগুলি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। একটা কাক এসে বসেছে শবের উপর। এই দৃশ্য সামনে রেখে খাওয়া যায়। কিন্তু ফিরোজ জানতেন না যে, সুদীপ্তর ঠিক মাথার উপরে ছাদে অমন বিশ তিরিশটা শব পড়ে আছে। নিচে ম'রে প'ড়ে আছেন ডঃ ফজলুর রহমান ও তাঁর ভাগ্নে কাঞ্চন। সুদীপ্ত সবি জানেন। সবি তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। আর তিনি খেয়ে যাচ্ছেন। গত সন্ধ্যায় কিন্তু খেতে পারেননি। সামনের মাঠে অচেনা লাশগুলি তাঁর ক্ষিধে নষ্ট করেছিলো। অমনি আরো অনেক লাশ আজ তিনি দেখেছেন একেবারে কাছে থেকে। এবং দেখতে দেখতেই কি ক্ষিধে ফিরে পেয়েছেন? মানুষ কতখানি বিধ্বস্ত হয়ে গেলে এটা সম্ভব! ফিরোজ ভাবলেন। আমিনার সাথে স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকটুকুও করলেন না। আর আমিনাও কেবলি একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন—

'ভাই বসুন।'

কিন্তু বসতে ইচ্ছে করল না। ফিরোজ ঘুরে ঘুরে ফ্ল্যাটটা দেখলেন। রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ইকবাল হলের দিকে। ইকবালের স্বপ্নের পাকিস্তানে বাংলাদেশের স্থান ছিল না। অথচ সেই বাঙালিই তাদের দেশে ইকবালের নামে হল বানিয়েছে। না না, একে উদারতা বলে না। নিরেট বোকামি এটা। বোকামি করলেই তার খেসারত দিতে হয়। কিন্তু আর না।

'ভাই চা খান একটু।'

ফিরোজের চা শেষ হ'তে হ'তেই সুদীপ্ত খাওয়া শেষ করলেন। তেইশ নম্বরে এই বোধ হয় তাঁর শেষ খাওয়া। গত পরশু পঁচিশে মার্চের রাতের খাওয়াটাই তাঁর জীবনের শেষ খাওয়া হতে পারত। হয় নি যে সেটা সত্যিই একটা—কী? দৈব ঘটনা? নাকি অর্থহীন ঘটনা? অদ্ভুতভাবে ঘটে যাওয়া অর্থহীন আকস্মিক ঘটনার উপর দৈব ঘটনার উপর নির্ভরশীল হয়ে যে জীবনকে রক্ষা পেতে হয় তার মূল্য কতটুকু? না না, ঐ জন্যই তাঁর মূল্য অপরিসীম। কিভাবে কতখানি কতদূর-বিস্তৃত অধিকার জীবনের উপর আমার আছে আমি তা জানিনে বলেই তো তার মূল্য আমার কাছে অনেক। সুদীপ্তর জীবনের প্রতি ভালোবাসা সহসা যেন শতধামুখি শ্রাবণের মেঘ হয়ে উঠল। নতুন মাটির বুকে জীবনের নবাঙ্কুর প্রত্যাশায় তাঁর চিত্ত উচ্চারিত হল। বেরিয়ে পড়। ছত্রিশ ঘন্টার

বেশি উপোস থাকার পর বিনা স্নানে দু'টো ভাত গিলে নিয়ে বেরুবার জন্য তৈরী হতে পাঁচমিনিট লাগল না সুদীপ্তর। আর আমিনা? তিনি তো তৈরী হয়েই ছিলেন। তাঁর সামনে প্রশ্ন ছিল কেবলি তো পালিয়ে বাঁচার। কেবলি যেখানে পালানোর প্রশ্ন সেখানে আবার প্রস্তুতির ঘটা! একটা সুটকেসে জামা-কাপড় টাকা-কড়ি ও গয়না এবং একটা ব্যাগে গুঁড়ো দুধের টিন, চিনি ও বিস্কুট। এ ছাড়া আর একটা সাইড ব্যাগে ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানো কয়েক জোড়া স্যান্ডেল, চিরুনী, দাঁতের মাজন ইত্যাদি কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস, আর ছোট ট্রানজিস্টার সেট। আমিনার ক্যারাভান প্রস্তুত। প্রস্তুত? মাত্র এই নিয়ে যদি চলে তবে এতো কিছু নিয়ে এতাদিন কি ছেলেখেলা করেছেন!

বেরুবার মুখে সুদীপ্ত একবার ড্রয়ইংরুমে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবিখানার দিকে তাকালেন। বইয়ের আলমারির কাছে একবার দাঁড়ালেন। সহসা মনে পড়ল বারান্দার টবে ফুল গাছগুলির কথা। আমিনা তখন ঘরে তালা দিয়ে ফেলেছেন। চাবি চেয়ে নিয়ে ছুটলেন বাথরুমে। পরপর কয়েক বালতি জল এনে ঢাললেন গাছগুলির গোড়ায়। কতোদিন আর ফেরা হবে না ঘরে! ততদিন এরা কে কেমন থাকবে—এই গাছগুলি? আলমারিতে ওই বইগুলি? বইগুলির দিকে শেষবারের মতো একবার তাকালেন সুদীপ্ত। একজন করুণ রিক্ত ভিখেরীর দৃষ্টি তাঁর চোখে। এদের কাউকে সঙ্গে নেওয়া যায় না? কিছুই সঙ্গে নেওয়া গেল না। আমিনার তাড়া খেয়ে আবার ছুটলেন উত্তরের বারান্দায়। আর একবার গাছগুলিকে দেখলেন। এতো বিভীষিকার মধ্যেও কী সুন্দর একটি গোলাপ ফুটেছে। বন্ধুর শেষ দান গোলাপটিকে তুলে নিয়ে সুদীপ্ত বুকে ঠেকালেন। কেউ দেখল না তো! পেছন ফিরে দেখেন বেলা এসে দাঁড়িয়েছে তার কাছে।

'আব্বু, আমি নেব।'

'হ্যাঁ মা, তোমার জন্যই তো।'

বেলার এক হাতে ফুল দিয়ে অন্য হাতখানি ধ'রে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন সুদীপ্ত। আর আমিনা? তাঁর এতো সবের বালাই নেই। তাঁর রান্নাঘরে এখনো পাঁচটা মাগুর মাছ জিয়ানো আছে হাঁড়িতে—আছে শজনে খাড়া, বেগুন,টমেটো, বিবিধ মশলাপাতি আর চাল-ডাল তো বটেই। একবারও কোন কিছুর কথা তিনি ভাবলেন না। একটা সাইড ব্যাগ ঘাড়ে ঝুলিয়ে সুটকেসটা হাতে নিলেন এবং অন্য ব্যাগটা নিতে বললেন বড় ছেলে অনন্তকে। বোধহয় মনে মনে সুদীপ্তর কান্ডজ্ঞানহীনতায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এই অভিশপ্ত বাড়িতে এখনি কখন কি ঘটে তার ঠিক আছে! আর উনি এখন গাছে পানি ঢালতে বসলেন। ফুল নিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়ার এইটে সময় নাকি! বেশ তো ফুল নিয়েই তোমরা থাক, বাক্সপেটরা আমিই বইব।

ফিরোজ হয়ত ব্যাপারটা কিছু আঁচ ক'রে থাকবেন। তিনি আমিনার হাত

থেকে সুটকেসটা এক রকম ছিনিয়ে নিলেন—

'আমাকেও আপনাদের কিছু কাজে লাগতে দিন। এতো অকর্মণ্য ভাবছেন কেন।'

তাঁরা নিচে নেমে এলেন। নিচে দু'জন ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে ছিল একটা এ্যাম্বুলেন্স এবং আরও একটা গাড়ি। ডঃ ফজলুর রহমানকে তাঁর আত্মীয়রা নিতে এসেছেন। সহসা নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হ'ল সুদীপ্তর। ডঃ রহমানের আত্মীয়দের কাছে কেবলি খবর পাঠিয়েই তাঁরা কর্তব্য সমাধা করেছিলেন। আর কিছুই কৃত্য ছিল নাকি? সারা নীলক্ষেত এলাকার সকলের অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিয়ে নীরবে মাথা নত করলেন সুদীপ্ত।

উপস্থিত আগন্তুকদ্বয়ের একজন ফিরোজকে চিনতেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন...'আপনি! এখনো আছেন ঢাকায়?'

ইয়াহিয়ার গত সন্ধ্যার বেতার বক্তৃতার পর সত্যিই আওয়ামী লীগের কোনো সক্রিয় সদস্যের পক্ষেই আর পাক-কবলিত এলাকা নিরাপদ নয়। কিন্তু এই মুহূর্তেই ফিরোজ নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছিলেন না। দেশের এতো মানুষ ওরা মারল। এর কোনো একটা প্রতিশোধ গ্রহণ করা কি এতোই অসম্ভব? কাকে ওরা ছেড়ে কথা বলেছে? বস্তির সাধারণ মানুষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অবধি সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি ওদের সমান আক্রোশ। অতএব কেবলি আওয়ামী লীগার ব'লে বিশেষ করে কোনো বিপদ অনুভব করার কারণ তো এখনো তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি বললেন–

'এ প্রশ্ন তো আমি আপনাকেও করতে পারি। ওদের খায়েশ তো দেখছি সকলকেই নির্মূল করার।'

'এটা ঠিক বলেছেন। কিন্তু শয়তানদের খায়েশ এবার মেটাতে হবে ভালো ক'রে। দরকার হ'লে ওপারে চ'লে গিয়ে সেখান থেকে ভালো ক'রে তৈরী হয়ে এসে বেটাদের বাঙালি-হত্যার খায়েশ মেটাতে হবে।'

দরকার হ'লে ওপারে যেতে হবে–একটা মত। আর-একটা মতও ছিল। সেটা তৃতীয় কণ্ঠে শোনা গেল। খদ্দরের পাঞ্জাবি-পরা ছিপছিপে দৃঢ় চেহারার ভদ্রলোকটি বললেন—

'যা কিছু করতে হবে দেশের অভ্যন্তরে থেকে। দেশকে মুক্ত করার জন্য দেশ ছেড়ে পালানোতে আমরা বিশ্বাসী নই।'

দুটি মত পরস্পর বিরোধী। কিন্তু তা'হলেও তর্কের অবকাশ বা ইচ্ছা কোনোটাই কারোর ছিল না। সঙ্গের লোকজন লাশ আনতে গেছেন ওপরে। এঁরা তাঁদের অপেক্ষায় আছেন। এবং মানসিক অবস্থার যে স্তরে আছেন তাতে দু'একটা মন্তব্যের অতিরিক্ত কিছুর সাধ্য তাঁদের ছিল না।

তা ছাড়াও বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে কোনো–কিছু ভাববার অবকাশ তখন

সাধারণ মানুষের ছিল নাকি! প্রাণভয়ে ভীত মানুষ যে যেদিক পেরেছে পালিয়েছে। কোথায় কোনদিকে পালাচ্ছি সে বিবেচনাও তারা বহু ক্ষেত্রে করে নি।

নীলক্ষেত আবাসিক এলাকা ছেড়ে বেরোবার সময় সদর রাস্তায় তাঁরা ডঃ খালেকের গাড়ির মুখোমুখি হলেন। সুদীপ্তকে দেখে হাত ইশারায় গাড়ি থামাতে বললেন ডঃ খালেক। দুটো গাড়ি পাশাপাশি হ'তেই খালেক সাহেব গলা বাড়িয়ে দিলেন, অগত্যা এদিক থেকেও যতোটা সম্ভব গলা বাড়াতে হ'ল সুদীপ্তকেও। কিন্তু ডঃ খালেক নিজের কথা কিছু বললেন না। তার ভাইয়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছেন, ভাবী ও ভাই-ঝিদের সন্ধান এখনো পান নি—সে সব কথাও চেপে গেলেন। অবশ্য কয়েকদিন পরে খালেক সাহেবের মুখেই সুদীপ্ত সব শুনেছিলেন। কিন্তু এখানে আজ শুনলেন ছোট একটি প্রশ্ন—

'আপনার খবর কি?'

'কোন মত বেঁচে গেছি। তবে ডঃ ফজলুর রহমান বাঁচেন নি। ছাদের উপর বস্তির লোক মারা গেছে-বিস্তর। সারা তেইশ নম্বর একেবারে তছনছ করে ছেড়েছে।'

আশ্চর্য, ডঃ খালেক ইতিপূর্বেই এসব শুনেছেন। তিনি মন্তব্য করলেন–

'আপনাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হচ্ছে, আপনাদের বিল্ডিংয়ের ছাদে ওঠে একজন ই. পি. আর. আমাদের পাক-বাহিনীর উপর গুলি করেছিল।'

"আমাদের" কথাটা খট্ ক'রে কানে বাজল সুদীপ্তর। ফিরোজেরও। পাক-বাহিনী এখনো আমাদের। কপালে দুঃখ তাহলে এখনো কিছু আছে। ফিরোজ খালেকের অপরিচিত হলেও এ কথা শুনে চুপ থাকতে পারলেন না। সরাসরি দৃঢ় স্বরে প্রতিবাদ জানালেন—

'কে বললে আপনাকে এ কথা?'

'প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শোনা। তিনি নিজে দেখেছেন ছাদে একটা ই. পি. আর. এর লাশ প'ড়ে থাকতে।'

'আমিও তো নিজে গিয়েছিলাম ছাদে' সুদীপ্ত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন 'ঐ রকম কিছু তো দেখি নি।'

'আপনি চিলে-কোঠার ছাদে উঠেছিলেন? সেইখানে ছিল।'

উহ্, কি ঘড়েল রে বাবা! সাধারণত চিলে-কোঠার ছাদে কেউ উঠবে না। অতএব ঐভাবে সাজানো হয়েছে গল্পটাকে। কিন্তু সুদীপ্ত সেখানেও যে উঠে দেখেছেন। সেখানে ছিল সেই বাপ-ছেলে এক সাথে। বাপ তার বুকের নিচে লুকিয়ে বাঁচাতে চেয়েছিলেন আপন প্রাণপ্রিয় পুত্রকে। নিজের শরীরকে ঢালের মত ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন পুত্রের উপর। সেই অবস্থাতেই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তাঁরা। গুলি বাপের শরীর ভেদ ক'রে গিয়ে ঢুকেছে ছেলের বুকে। সুদীপ্ত যখন দেখেন তখনও বাপ বুকে জড়িয়ে আছেন ছেলেকে। সেই দৃশ্য! সামান্য ক'ঘন্টা

আগে দেখা। ওদেরই কেউ ই. পি. আর. এর লোক নাকি! সুদীপ্ত হতবাক হয়েছিলেন বিস্ময়ে। এবং বিস্ময় কাটিয়ে কিছু বলার আগেই ডঃ খালেক পুনরায় ব'লে উঠলেন—

'যেখানে সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করা হয়েছে কেবল সেখানেই তারা হামলা করেছে। সেনাবাহিনীকে সেজন্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।'

'তাই নাকি।' ফিরোজ বললেন, 'ইকবাল হল, জগন্নাথ হলের ছাত্ররাও সেনাবাহিনীকে বাধা দিয়েছিল নাকি! তারা লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল বুঝি।'

ফিরোজের ব্যঙ্গোক্তি খালেক সাহেব গায়ে মাখলেন না। অথবা তা বুঝবার বোধই তাঁর নেই। তিনি ব'লে উঠলেন—

'ওরে বাবা কী যে বলেন! রাইফেল হাতবোমা এ্যাসিড বাল্‌ব-এই সবের ডিপো ছিল ঐ দু'টি হল। মর্টারও ছিল কিছু কিছু। সেনাবাহিনী হল থেকে সে সব উদ্ধার করেছে।'

কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা কোনো কড়া কথা শোনানো যায় না। অন্ততঃ ফিরোজ পারেন না শোনাতে। কণ্ঠে প্রবল বিরক্তি প্রকাশ ক'রে তিনি শুধু বললেন—

'এইসব গাঁজা বিশ্বাস করতে বলেন!' ব'লেই গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

নিউ মার্কেটের চৌমাথার মোড়ে তাদের গতিরুদ্ধ হ'ল। সামনের দু-তিন খানা গাড়ি দু'জন পাকিস্তানি সৈনিকের নির্দেশে দাঁড়িয়ে গেছে। অগত্যা তাদেরকেও দাঁড়াতে হ'ল। পেছনে এসে পর পর দাঁড়াল কয়েকটি গাড়ি।

অতঃপর সৈনিক দু'জন এসে প্রত্যেক গাড়ি থেকে পুরুষ আরোহীদের নামাতে শুরু করল। অগত্যা নামতে হ'ল সুদীপ্ত ও ফিরোজকেও। সকলকে সার ক'রে দাঁড় করাল তারা রাস্তার পাশে। প্রায় বিশ-পঁচিশ জন। একজন সৈনিক এসে গুণতে শুরু করল-এক, দো তেন....এগারা, বারা। ব্যস, আর দরকার নেই। এই বারোজন বাদে আর সবাই গাড়িতে গিয়ে ওঠ। সুদীপ্ত ছিলেন তেরো নম্বরে, চৌদ্দতে ফিরোজ। অতএব রেহাই পেয়ে তাঁরা চ'লে এলেন। কিন্তু ঐ বারো জন?

তোম লোক রাস্তার জঞ্জাল সাফা কর।

গাড়ি-হাঁকিয়ে চলা মানুষ। কে কোন্ মর্যাদার লোক কে জানে। সবকে এখন রাস্তার জঞ্জাল সাফ করতে হবে। পায়ে-হাঁটা মানুষের সংখ্যা কিছুক্ষণ আগেও অনেক ছিল এখন যথেষ্ট কম। এবং এখনি ওদের খেয়াল হয়েছে রাস্তার জঞ্জাল সাফ করতে হবে। জঞ্জাল সাফ মানেই সেই মাজার ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

মাজার? কয়েকদিন আগে সুদীপ্ত মাজার দেখেছিলেন। সন্ধ্যার দিকে নিউ মার্কেটে যাচ্ছিলেন সামান্য কেনাকাটার জন্য। মোড়ের ভিড়টাকে তিনি ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন! কিন্তু চিরকালের অভ্যাস মতোই ভিড় এড়িয়ে অন্য দিকে

সরে যাচ্ছিলেন! সহসা কানে এলো—

'আপনারা মাজারে যে যা পারেন দান ক'রে যাবেন।'

এই রাস্তার মাঝখানে মাজার? অগত্যা দাঁড়াতে হ'ল। ভিড়ের কাছে এগিয়ে দেখেন সত্যি সত্যিই চৌরাস্তার ঠিক কেন্দ্রস্থলে পাশাপাশি দুটি কবর—বালি ও ইট-পাথর সংগ্রহ করে সত্যকার কবরের মতো ক'রেই বানানো হয়েছে। তার উপর শক্ত কাগজের দু'টো সাইনবোর্ড—একটাতে নাম লেখা ইয়াহিয়া খানে, অন্যটাতে জুলফিকার আলি ভুট্টোর। একটা লোককে, বোধ হয় সে ফকির হবে, সেবায়েত সাজানো হয়েছে। সে মাঝে মাঝে চিৎকার করছে—

'আপনারা যে যা পারেন মাজারে দান ক'রে যাবেন।'

বাহ্, কৌতুকটা জমিয়েছে বেশ তো। এ না হ'লে বাঙালি! গুপ্ত কবি ঠিকই লিখে গেছেন, এতো ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা। সেদিন ভারি পুলকিত হয়েছিলেন সুদীপ্ত।

আজ সকালে সদ্য ঘুম-ছাড়া শয্যায় সেদিনের কথা সুদীপ্তর মনে হ'ল। সেই মাজার সাফা করার জন্য গতকাল গাড়ি থেকে নামিয়ে কাজে লাগানো হয়েছিলো ভদ্রলোকদেরকে। কুলি-মজুর লাগানো যেত না? কিয়া বাত? কাজে লাগানো হয়েছে বাঙালিকে। তারি মধ্যে আবার ভদ্রলোক-কুলিমজুর ভেদাভেদ করতে হবে নাকি।

কথাটা সুদীপ্ত গতকালই গাড়িতে আসতে ফিরোজের কাছে তুলেছিলেন–

'মানুষের কার কি মর্যাদা সেটা বিচার না করেই।'......

'কী যে বল।' সুদীপ্তকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ফিরোজ ব'লে উঠেছিলেন 'জানো না, রক্ত পায়িদের কাছে সব মানুষই সমান।'

বিছানা ছেড়ে কিছুতেই আজ উঠতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু ফিরোজ তো উঠে গেছেন। শূন্য ঘরে সুদীপ্ত একটি শপথ নিতে চাইলেন মনে মনে। এইসব যা ঘটে গেল তা ভেবে কিছুতেই মন খারাপ হ'তে দওয়া হবে না। ভেবে কী লাভ! হাঁ, কাজ করতে হবে। দেশের জন্য এখন কতো কাজ করার আছে। কিন্তু তিনি কী করবেন! তাই তো, কি যে করা যায়! জানলা দিয়ে কী সুন্দর রোদ এসে পড়েছে মেঝেয়! কতোকাল জানলা দিয়ে এমন রোদ আসেনি। তার পরিবর্তে এসেছে গুলি-গোলা আর ধোঁয়ার কুন্ডলি। শ্বাসরুদ্ধকর সেই প্রভাতে

জীবনকে তবু পরিত্যাজ্য মনে হয়নি তো। ঠিক কী যে মনে হচ্ছিল তার কোন নাম নেই। তবে তাঁর সমগ্র সত্তাকে যা আকঁড়ে ধরেছিল তার নাম আর যাই হোক নেতিবাচক কিছু নয়। কিছুতেই এ কথা একবারও তার মনে হয় নি যে, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে তাঁর মৃত্যু প্রতীক্ষা করছে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও মানুষ মৃত্যুকে অবিশ্বাস করে। পঁচিশের রাতে–না তো, রাত তখন কত? প্রায় দুটার কাছাকাছি, অতএব ছাব্বিশে মার্চ তখন–এই ছাব্বিশে মার্চের রাতে ওরা যখন ঘরে ঢুকল তখন কি মনে হয়েছিল, আমি সেই সুদীপ্ত মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরে আর জীবনে নেই, আছি মৃত্যুর রাজ্যে! কী আশ্চর্য। সৈনিকগুলো সামান্য মাথা হেঁট ক'রে খাটের নিচে আর তাকালো না। তাকাতো যদি? হয়ত মরে যেতাম। হয়ত ম'রে যেতাম–সুদীপ্ত ভাবলেন। ভাবনার মধ্যে মানুষ অলৌকিক রূপ কথার দেশেও বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসের বেলায়? পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে অনেকে পদক্ষেপে ইচ্ছুক হবে না। আমি ম'রে যাচ্ছি–কথাটা মানুষ ভাবতে পারে, কিন্তু কখনো বিশ্বাস করতে পারে না। সৈনিকগুলো যখন একেবারে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল–। আবার ঐ কথা? না, ঐ সব আর ভাবব না। বলতে বলতেই বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন সুদীপ্ত।

সকালের চায়ের টেবিলে একজন নতুন মানুষকে দেখা গেল–হাসিম সেখ, সম্পর্কে ফিরোজের ভাগনে। বয়সে ফিরোজের চেয়ে সামান্য ছোট। ভদ্রলোকের মা হচ্ছেন গ্রাম সুবাদে ফিরোজের বোন–বাল্যকালে বাপ মারা গেছেন। ফলে তিনি লেখাপাড়া বেশিদূর চালাতে পারেন নি। আই. এ. পাস ক'রে পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছিলেন। সেই পঁচিশের রাতে ছিলেন রাজারবাগে। পাকিস্তানিদের সাথে সেই রাতের অসম-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এখন সেনাবাহিনীর রোষ দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

কিন্তু এতো সকালে কেউ আসে কি ভাবে?–প্রশ্নটা মনে উদিত হ'তেই সুদীপ্ত ঘড়ির দিকে তাকালেন। তাই তো, নটা যে বাজে! হাঁ, তা নটা হতে পারে বৈ কি? ঘুম কি তাঁর এখন ভেঙ্গেছে! আটটার দিকে কারফিউ উঠে গেছে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রলোক পথে রেরিয়েছিলেন।

'পথে বেরিয়ে, মামা, সে কী বিপদ! মুসলিম লীগের হরমুজ মিয়ার সাথে দেখা।'

সেই হরমুজ মিয়া, যে বর্তমানে লীগ-নেতার নির্দেশে সেনাবাহিনীকে আওয়ামী লীগের লোকদের এবং হিন্দুদের বাড়ি-ঘর ও দোকান চিনিয়ে বেড়াচ্ছে। এসব কামে সে খুব যোগ্য লোক। হাসিম সেখকেও সে চিনেছিল ঠিকই। সামনে এসে দাঁত বের ক'রে বলেছিল—

'আরে হাসিম সেখ মালুম হতেছে। রাজারবাগ তন আসা হ'ল কখন?

হাসিম সেখ কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেলেই হয়েছিল আর কি। তিনি ঘাবড়ান নি।

সঙ্গে সঙ্গেই উর্দু ভাষায় মুখ খিস্তি ক'রে গাল দিয়ে উঠেছিলেন। উর্দু ভাষায় ভারি সুন্দর মুখ খিস্তি করা যায়।

'এ শালে শুয়ার কা বাচ্চা, উল্লুকা পাঠ্‌ঠে, কম্‌বখত্ মর্‌দুদ, তু হাসিম সেখ কাহ্‌তা। কিসকো। মায় আতাউল্লাহ্ খান হুঁ। খোদ কানপুর সে আনেওয়ালা হ্যায় হাসিম। তেরা বাপকা মাফিক বেঈমান আওর গাদ্দার নেহি।'

হাসিম সেখ তখন একজন বিহারীর ছদ্মবেশে ছিলেন। তার উপর এই অপরূপ উর্দু ভাষার চাবুক। হরমুজ মিয়া সোজা কুকুর ব'নে গিয়েছিল। বিস্তর লেজ নেড়েছিল এবং আতাউল্লাহ খানের তোয়াজ করেছিল।

চায়ের পেয়ালার সাথে হাসিম সেখের পরিবেশিত সেই হরমুজ-বৃত্তান্ত সকলেই উপভোগ করলেন। হাসিম সেখ প্রশংসা পেলেন সকলের! ভাগ্যিস্ তিনি উর্দুটা বলতে কইতে পারেন ভালো। এবং ভালো উপস্থিত-বুদ্ধি রাখেন।

বুদ্ধিমান হাসিম সেখ আর একটা প্রসঙ্গ তুললেন, ফিরোজকে বললেন—

'আপনারও এখানে আর থাকা চলবে না মামা। জমাতে ইসলাম ও মুস-লিম লীগের সাথে সেনাবাহিনীর শলা-পরামর্শ চলছে শুনলাম। এটাকে ওরা দ্বিতীয় ইন্দোনেশিয়া বানাতে চায়।'

'কি রকম?'

'চার শ্রেণীর মানুষ ওরা দেশ থেকে নির্মূল করবে—বুদ্ধিজীবী, আওয়ামী লীগার, কমিউনিস্ট ও হিন্দু।'

চমৎকার প্ল্যান। আওয়ামী লীগ খতম হ'লে অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিকে কমিউনিস্ট, তার মানেই নাস্তিক কাফের আখ্যা দিয়েই দু'দিনেই ঠান্ডা করে দেওয়া যাবে। বুদ্ধিজীবী সাবাড় হ'লে বেহুদা স্বাধীন চিন্তার বালাই দেশে থাকবে না। আর দেশকে হিন্দুশূন্য করতে পারলে তাদের সহায় সম্পত্তি পূর্ব বাংলার পেয়ারা দালাল দোস্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে তাদের আনুগত্যকে পাকাপোক্ত ক'রে নেওয়া যাবে। কী মজা! এক ঢিলে মরবে কতগুলো পাখি।

কিন্তু পাখি মারা কি অতই সহজ? ফিরোজ তার চিন্তাকে একটু অন্যদিকে সরিয়ে নিলেন। অন্য কোণ থেকে গোটা ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখ না? দেশের মধ্যে বুদ্ধিজীবী আছেন কতজন? সঠিক হিসাব কারো জানা নেই। তবে দেশের শতকরা আশি ভাগ জনগোষ্ঠীই যে আওয়ামী লীগের সমর্থক সে তো নির্বাচনেই বুঝা গেছে, তার সঙ্গে এক কোটি হিন্দু ও কমিউনিস্টগণ যুক্ত হ'লে সংখ্যাটা কত দাঁড়ায়? ফিরোজ তাই বললেন—

'তা হ'লে তো পঞ্চাশটা ইন্দোনেশিয়া ক'রেও কুল পাবে না'

'তা ছাড়াও,—সুদীপ্ত বললেন, ইন্দোনেশিয়ার মতো এখানে চারপাশে সমুদ্র তো নেই। অতএব চারপাশ থেকে ঘিরে ধ'রে ব'সে ব'সে মারবার সুযোগ

তারা পাবে কি ক'রে?'

কথাটা বলতে বলতেই সুদীপ্ত একবার চট্ করে কয়েক দিন আগের একটি সন্ধ্যায় ঘুরে এলেন– বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবের এক সন্ধ্যা। তার সহকর্মী বন্ধু আহমেদুল হক সেদিন এই ইন্দোনেশিয়া প্রসঙ্গেই কথা বলছিলেন। যে বিদেশী রাষ্ট্রের গোপন হস্তক্ষেপের ফলে ইন্দোনেশিয়াতে অমন নৃশংস কান্ড ঘটে গেছে বাংলাদেশেও তাদেরকে বর্তমানে অত্যন্ত সক্রিয় মনে হচ্ছে। ঐ নিয়েই আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছিলো সেদিন।

'ওরা এতো নির্মম পশু যে, আমাদের দেশের এক কোটি লোকের জীবনের বিনিময়েও ওদের যদি কিছু উপকার হয় ওরা তাকে স্বাগত জানাতে কুণ্ঠিত হবে না।'

কী চায় ওরা? চায় এখানে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের জন্য খানিক জায়গা। সেটা দিলে বাংলার লাভ না ক্ষতি সে বিচার করে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা আর বুদ্ধিজীবীরা। অতএব সেই রাজনীতিবিদ আর বুদ্ধিজীবীদের খতম কর।–ঠিক এই ধরণের কোন প্ল্যান পঁচিশে মার্চের পশ্চাতে থাকতেও পারে। সুদীপ্তর এখন মনে হ'ল ঠিকই বলেছিলেন বন্ধুবর আহমেদুল হক।–

'বামপন্থী চিন্তাধারা তো চিরদিনই ঐ সামরিক আঁতাতের বিরোধী। ওদের শেষ ভরসা ছিল আওয়ামী লীগ। কিন্তু শেখ সাহেবকে ওরা চিনতে ভুল করেছিল। ওদের ফাঁদে, দেখা যাচ্ছে, তিনি পা দিলেন না। অতএব আওয়ামী লীগকে খতম করার জন্য ওরা এবার দেখবেন ইয়াহিয়াকে লেলিয়ে দেবে। এবং সেই সঙ্গে উৎখাত ক'রে ছাড়বে বামপন্থী দলগুলিকেও।'

এইসব রাজনীতির ঘোরপ্যাচ সুদীপ্ত ভালো বোঝেনা না। অতএব চুপচাপ ছিলেন তিনি। কিন্তু সকলেই চুপ ছিলেন না। পক্ষে বিপক্ষে নানা কথা উঠেছিল। হক সাহেবকে সমর্থন ক'রে যা বলা হয়েছিল তার মধ্যে যুক্তি ছিল—

'সে সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। সে জন্য বামপন্থী দলগুলিও মনে হয় বর্তমানে শেখ সাহেবের সঙ্গে এক প্ল্যাটফর্মে আসতে চাইছেন। বিপদটা তারা টের পেয়েছেন।'

'কিন্তু বামপন্থীরা যে শেখ সাহেবকে বরাবর সমর্থন ক'রে যাবেন সে আশা যেন করবেন না। বর্তমানের সঙ্কট কাটিয়ে উঠলেই দেখবেন ওরা শেখ সাহেবের পেছনে লাগবে।'

'এইভাবে নানা জনে নানা কথা বলেছিলেন। আলোচনা সুদীর্ঘ হয়েছিল। ক্লাব-প্রাঙ্গনে সায়ংকালের আড্ডায় এমন কতো আলোচনাই তো হয়। কোনোটা তার মনে থাকে, কোনটা থাকে না। কিন্তু ঐ কথাটা সুদীপ্তর মনে থেকে গেছে।

'এখন সব দিক থেকে সুবিধা হয় এখানে জামাতে ইসলামকে ক্ষমতায়

বসাতে পারলে। ওদেরও লাভ, পাকিস্তানেরও লাভ। গোটা বাঙালি জাতিকে ধর্মের আফিম দিয়ে বুঁদ ক'রে রেখে ওরা সবাই ওপার থেকে ব'সে ব'সে মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেতে পারবে।'

এইসব কথা এখন হাসিমের কথার সংগে মনে মনে মেলাচ্ছিলেন সুদীপ্ত। কিন্তু ফিরোজ ভাবছিলেন হরমুজ মিয়ার কথা। হরমুজ মিয়া তা'হলে এখন এই কামে নেমেছে! হরমুজ মিয়াদের কথা ভাবতেই ফিরোজ ব'লে উঠলেন–

'জানো, আমাদের প্রধান শত্রু পাকিস্তানিরা ততো নয়, যতো হচ্ছে এই দেশীয় দালালরা। এদেরকে আগে খতম করা দরকার। এই শালাদের জন্যই বাঁদীর বাচ্চা আইবা' (আউয়ুব শব্দটা ফিরোজের মুখে আইবা হয়ে গেছে) গত দশ বছর আমাদের উপর গোলামীর জোয়াল চাপিয়ে রাখতে পেরেছে!'

'কী দুঃসাহস! গোটা বাঙালি জাতিকে পশ্চিম পাকিস্তানের...'

মীনাক্ষী কখন ঘরে ঢুকেছিলেন, এবং এদের কথা শুনছিলেন। পুরুষ জাতটাই কেমন যেন! এই দুঃসময়ে একটু তোমরা আল্লাহকে ডাক। তা না, কে বাঁদীর বাচ্চা, কে কী–সে সব আলোচনায় তোমাদের কী দরকার! ঐ ক'রে কি তোমরা বিপদে পার পাবে! তিনি সুদীপ্তর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন—

'আপনারা কেবলই ঐ ঘুরে ফিরে একই কথা আলোচনা করছেন কেন বলুন তো?'

সকলেই প্রায় সচকিত হলেন—তাই তো! ঘুরে ফিরে ঐ একটি বিষয়কে নিয়েই আমরা সকলে যে চিটে গুড়ে পিঁপড়ের মতো জড়িয়ে আছি দেখি। কিন্তু একটি পিঁপড়ের সেখান থেকে স'রে আসার ক্ষমতা কতখানি? সুদীপ্ত বললেন—

'শরীরে ক্ষত থাকলে হাত যে বারে বারে সেখানেই যেতে চায় ভাবী।'

এবং তাতে হাতের অপরাধ হয় না। কোনো অপরাধ নেই, খোলা গায়ে চলতি হাওয়ার স্পর্শ পেতে পেতে একটু যদি ঘুম আসে। কিন্তু হাওয়া বিষাক্ত হ'লে খোলা গায়ে থাকা বিপজ্জনক। সারা শরীর বিষে দগ্ধ হ'তে পারে। শহরের যা অবস্থা তাতে যে-কোন সময়ে যে-কোন বিষয় আলোচনার অপরাধে তাঁদের দগ্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বৈ কি! মীনাক্ষী ভাবী ঠিকই বলেছেন—আমাদের আলোচনা কিছুটা সংযত হওয়া উচিত।

কিন্তু কিসের সংযম। সারা দেশে এখন বাঙালি জাতিকে অমোঘ ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তনের পালা চলছে। এ কি তোমার-আমার ব্যক্তি জীবনের কোন পছন্দ অপছন্দ নিয়ে কথা! যুক্তির সিংহদ্বারে এখনি যদি আমরা যথেষ্ট সক্রিয় হ'তে না পারি, আমাদের ভবিষ্যৎ-অস্তিত্বের চোহারাটা তা হ'লে কেমন হবে? কেউ আমাদের ক্ষমা করবে?

মা ভৈ। কোন ভীতি-সঙ্কোচে আমরা যেন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে না পড়ি। আমাদের এখন মন্ত্র একটিই–আমরা নিজের কথা ভাবব না, আমাদের লক্ষ্য

হবে দেশ। দেশের জন্য সংগ্রাম।

খাওয়া শেষ হ'লে হাসিম সেখ স্বদেশের জন্য তাঁদের সংগ্রামের কাহিনী শোনালেন। রাজারবাগ এলাকার পঁচিশ মার্চের সংগ্রাম। সাধারণ সেপাইরা সেনাবাহিনীর সাথে কী যুদ্ধে পারে? হাসিমরাও শেষ পর্যন্ত পারেন নি। কিন্তু বিনা বাধায় পাকিস্তানিরা সারা ঢাকা শহরকে লন্ড-ভন্ড ক'রে দেবে এমন কলঙ্ক থেকে তাঁরা জাতিকে রক্ষা করেছেন। এবং তাঁদেরকে রক্ষা করেছেন আশে-পাশের অধিবাসীরা। আশ্রয়-আহার তো দিয়েছেনই, ছদ্মবেশ ধারণের বস্ত্র-খন্ডটুকুও দান করেছেন। তাতে বিপদ ছিল না? যদি পাকস্তানিরা টের পেত? হাঁ, মরতে হ'ত। কিন্তু মৃত্যুকে কেউ ভয় করছে নাকি? ছেলে যদি মৃত্যু বয়ে নিয়ে ঘরে ফেরে মা কি সেই মৃত্যু ভয়ে ছেলেকে দুয়ার থেকে ফিরিয়ে দেন?

সেই অষ্টাদশী জননী হাসিম সেখকে ফিরিয়ে দেন নি। ট্যাঙ্ক থেকে কামানের মুহুর্মুহুঃ গোলাবর্ষণে অতিষ্ঠ হ'য়েই তাঁদেরকে ভাবতে হয়েছিল—চল,স'রে পড়ি। স'রে পড়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ তখন। ভয়-ভীতির কথা নয়। ম'রে লাভ কি? তখনই মরব যখন ওদের কাউকে মারার ক্ষমতা হাতে থাকবে। ওই শালাদের মতো কামান চালাতে শিখে তখন সামনে আসব। এবং দেখব, শালাদের যুদ্ধের কতো সখ। এখন এখানে থাকলে সেরেফ মরতে হবে। ভেবে চিন্তে ঠিক সময়েই তাঁরা পালিয়েছিলেন । কিন্তু ছদ্মবেশ দরকার তো। পুলিশের পোশাকে তো মাথা বাঁচিয়ে পালানো যাবে না। তাছাড়া ভোর হয়ে আসছে, দিনের বেলাটা কোথাও লুকিয়ে কাটাতে হয়। অতএব যে যেখানে পেয়েছিলেন আশেপাশের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন। বেশি কিছু ভাবনা-চিন্তার সময় কারো ছিল না। সামনে যেখানে সুবিধা পাও ঢুকে পড়। হাসিম একটা গলির মধ্যে একটি একতলা বাড়ির দরজায় কড়া নেড়েছিলেন খুব জোরে জোরে। কারো সাড়া নেই। অনেকক্ষণ পর সাড়া মিলল। জানলার একটি কপাট একটু ফাঁক হ'ল। একটি রমণী কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল—

'কে?'

'আমি রাজারবাগ পুলিশের লোক মা, একটু আশ্রয় দেবেন?'

আশ্রয় দেওয়া মোমেনার পক্ষে ভারি শক্ত ছিল। ঘরে তিনি একা রমণী-একটি শিশু কন্যা বুকে নিয়ে প'ড়ে আছেন। স্বামী কাজ করেন সংবাদপত্র অফিসে। রাত দশটার দিকে ঘরে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু ফেরেন নি। সেই এক দুশ্চিন্তা। তাঁর উপর এই কেয়ামত-রাত্রি। কে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে আসে তা কি বলা যায়! কিন্তু লোকটি তাকে মা বলেছে।

'পাকিস্তানিরা আমাদের মেরে ফেলবে মা। বাঁচান।'

মোমেনা আর থাকতে পারেন নি। দোর খুলে দিয়েছিলেন। আশ্রয় পেয়েছিলেন রাজারবাগ পুলিশের হাসিম সেখ। বাড়িতে এই রমণী শুধু একা!

হাসিম সঙ্কুচিত হয়েছিলেন। একা একজন যুবতী স্ত্রীলোকের বাড়িতে আর-কোনো বেগানা পুরুষের স্থান হবে কি ক'রে? না, তা হওয়া উচিত? তার স্বামী কিংবা কোনো আত্মীয় জানতে পারলে? হাসিম তাই চ'লে আসতে চেয়েছিলেন–

'আপনার বোধহয় অসুবিধা হবে মা। আমি না হয় যাই।'

'মা ডেকেছো না। তার পরও যদি অসুবিধার কথা ভাবতে পেরে থাক তবে তোমার যাওয়াই তো উচিত বাছা।'

তাইতো। বাড়িতে ছেলে থাকবে, তাতে মায়ের আবার সুবিধা-অসুবিধা কী? ঐ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলাই তো লজ্জার কথা। হাসিম একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন।

মেয়েদের বয়সটাই কি সব? ভদ্র-মহিলা তার চেয়ে কয়েক বছরের ছোটই হয়ত হবেন। কী স্বাচ্ছন্দে তবু মায়ের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিঞ্চিৎ বিস্ময়ে এবং প্রবল ভক্তিতে অভিভূত হয়েছিলেন হাসিম সেখ। হাসিম তার জীবনের কাহিনী এই নতুন মাকে শুনিয়েছিলেন। এবং তাঁকে গ্রামের বাড়িতে তাঁর জন্মদাত্রী জননীর কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ঢাকা শহরের এই অবস্থায় কারো কি আর এখানে থাকা উচিত? তা উচিত নয়। এবং স্বামীকে ফেলে মোমেনাও নিরাপত্তা-সন্ধানে স'রে যাওয়া উচিত বিবেচনা করেন নি। মোমেনা বার বার ব'লে দিয়েছেন–

'তুমি বাছা The people অফিসে তোমার আব্বার খোঁজ নিয়ে আমাকে জানিয়ে যাবে। কোথায় যে গেলেন তিনি! আল্লাহ্!'

ফিরোজ শুধালেন, 'তারপর? খোঁজ পেয়েছ সে ভদ্রলোকের।'

'পেয়েছি মামা! তিনি বেঁচে নেই! কিন্তু কী ক'রে এখন সে খবর নিয়ে মায়ের কাছে যাব?'

দেখা গেল বলতে বলতে হাসিমের চোখে জল এসেছে। তিনি জামার প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছে নিলেন। অনেকক্ষণ কোনো কথা জোগালো না কারো মুখে। হাসিমই একটু পরে বললেন—

'আমরা যদি ঐ রাজারবাগেই হানাদারদের খতম করতে পারতাম তা হ'লে মাকে এই দুঃখ থেকে বাঁচাতে পারতাম।'

তা হয়ত পারতেন। কিন্তু মা তো ঐ একটিই নয়। এবং সবার উপরে স্বদেশ-মাতা, হ্যাঁ, সবাই মিলে এ মাকে বাঁচাতে হবে। ভিক্ষা ক'রে নয়, যুদ্ধ ক'রে। তারপর কর্মে একনিষ্ঠ হয়ে। সেটা সব বয়সেই হওয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধ! হায়, যুদ্ধের বয়স কি আছে! অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন তাঁর বয়সের হিসেব করলেন। হাঁ, চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। তবু তো রক্তে অস্ত্রধারণের চঞ্চলতা সুদীপ্ত অনুভব করলেন। মেঘের তমসা কেটে সূর্যের দীপ্তি পেল তাঁর চিন্তার কিশলয়গুলি। মনে হ'ল জীবনের যদি কোন মূল্য থাকেই তবে মৃত্যুরও মূল্য

আছে। তা না হ'লে দুটোই সমান অর্থহীন। বেঁচে থাকার জন্য মৃত্যুকে এড়াতে চাইলে সে মৃত্যু একদিন নিঃশব্দে তোমার জীবনের বিপুল ব্যর্থতাকেই শুধু ঘোষণা করতে আসবে। কিন্তু কথা কি শুধু ঐটুকুই! এতো মৃত্যুর মুখে বাঁচতে চাওয়াটাই তো একটা প্রহসন। এ প্রহসন অসহ্য। মরবার ভার অন্যকে দিয়ে নিজে নেব কেবল বেঁচে থাকার দায়িত্ব এমন ভাঁড়ামি থেকে নিজের পবিত্র আত্মাকে যেন রক্ষা করতে পারি। একটা প্রতিজ্ঞা সুদীপ্তর মধ্যে প্রার্থনার পবিত্রতা পেল।

ফিরোজ তখন শুধাচ্ছিলেন, 'তোমরা অনুমান কতক্ষণ লড়েছিলে?'

'হবে তিন চার ঘন্টা। প্রথমে ওরা কয়েকজন এসেছিল সাধারণ অস্ত্র নিয়ে। আমরা তখন তাদের প্রায় সকলকে সাবাড় ক'রে ফেলি। বাকি কয়েকজন প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। পরে যখন আসে ট্যাঙ্ক ও কামান নিয়ে তখনি তো শুধু হার মেনে পালাতে হ'ল আমাদের। খালি রাইফেল হাতে ট্যাঙ্ক ও কামানের সামনে আমরা দাঁড়াই কি ক'রে বলুন।'

তা ঠিক। সেজন্য দেশবাসী ওদেরকে কাপুরুষ বলবে না। বরং চিরদিন ওদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। ফিরোজ শুধালেন—

'এখন তুমি করবে কী? এইভাবে লুকিয়ে বাঁচবে কতকাল?'

না। এখানে তিনি লুকোতে আসেন নি। এসেছেন কিছু টাকার জন্য। শেখ সাহেব বলেছিলেন, আটাশ তারিখে মাইনে পাওয়া যাবে। কিন্তু তার তো বিপর্যয় ঘটে গেল। বিধবা মা পথ চেয়ে আছেন—ছেলে টাকা পাঠাবে।...হাঁ নিশ্চয়ই তা সে পাঠাবে।

'আপনার কাছে মামা, কিছু টাকার জন্য এসেছি। মায়ের হাতে সেই টাকাটা দিয়ে আমি তারপর দেখব, কোনখানে গেলে ঐ পাকিস্তানিদের সাথে যুদ্ধ করার জো পাওয়া যাবে।'

'এর পরেও তোমার যুদ্ধ করার সখ আছে বাবা?'

'কেন থাকবে না? আমি ভয় পেয়েছি মনে করেন? আমাদের কত ভাই বন্ধুকে ওরা মেরে ফেলল, মা-বোনের ইজ্জত নিল—আমরা তার শো'ধ নেব না? খোদার কসম, আমার মায়ের কসম আমাদের রক্তের কসম, আমরা এর শোধ নেবই নেব।'

বাহ্ ভারি সুন্দর তো। কত সরল অথচ সঠিকভাবেই এঁরা সমস্যাটাকে বুঝেছেন! আর তা সমাধানের জন্য মানোবল কত দৃঢ়! কিন্তু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী হলে? ইতিমধ্যেই সে ধরনের বুদ্ধিজীবীদের কিছু পরিচয় সুদীপ্ত পেয়েছেন। কী ভয়াবহ মানসিকতা।

আমাদের ভেবে দেখতে হবে, কেন এই অবস্থার সৃষ্টি হ'ল? কোনো একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় কেন? কে এর জন্য দায়ী?..

যতো শয়তান ঐ কমিউনিস্টরা। ওদের প্ররোচনাতে লোক সব ক্ষেপে

গেল। তা না হ'লে ওদের সাথে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে একটা সমঝোতায় পৌঁছানো যেতো।..

শেখ সাহেব তাঁর দাবি কিছু ছেড়ে দিয়ে একটা আপোস করলে আখেরে ভালো হ'ত। যা ভুল তিনি করেছেন।

ইত্যাদি কত মন্তব্যই তো গত দুদিনে সুদীপ্তর কানে গেছে। আর কানে আঙুল দিয়ে পালাতে ইচ্ছে করেছে। সেই পন্ডিতম্মন্যদের পাশে এই হাসিম সেখকে এখন তো বন্ধু ব'লে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়। আমাদের ভাই-বন্ধুদের ওরা মেরেছে, মা-বোনের ইজ্জত নিয়েছে, আমরা তার শোধ নেব। হ্যাঁ, ঠিক এইটেই তো এখনকার উপযুক্ত কথা।

শেখ সাহেব কেন আপোস করলেন না?

এ প্রশ্নকে নিয়ে মনে মনে নেড়ে-চেড়ে এক ধরণের বিলাসিতাই চলে। সেরেফ বিলাসিতা। কেননা ঐ প্রশ্নের বাস্তব ভিত্তি একেবারে নড়বড়ে। প্রথমত শেখ সাহেবের সঙ্গে ইয়াহিয়ার কি আলোচনা হয়েছে কেউ তোমরা তা জান না। কেবল তোমরা ইয়াহিয়ার মুখে ঝাল খেয়ে বলছ—শেখ সাহেব একেবারে কঠিনভাবে গোঁ ধ'রে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানকে অসম্ভব ক'রে তুলেছিলেন।

শেখ সাহেব বড়োই অনমনীয় হয়েছিলেন? কথাটা যদি মেনে নিই তবু তো প্রশ্ন থাকে। গত তেইশ-চব্বিশ বছরে নমনীয় হয়ে থেকে বাংলাদেশের কী লা-ভটা হয়েছে শুনি! যথেষ্ট আপোস করা গেছে, যথেষ্ট সমঝোতার মনোভাব দেখানো হয়েছে—তার পরিবর্তে তোমরা কী পেয়েছ? পেয়েছ বিরামহীন শোষণ চালু রাখার উপযোগী একটা শাসন-কাঠামো।

শেখ সাহেব কেন আপস করলেন না?—মনে মনে এই প্রশ্ন তুলে এক ধরনের বুদ্ধিজীবী এখন তড়পাচ্ছেন। আর হাসিম সেখ কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন এই ভেবে—কেন আমাদের মা-বোনের সর্বনাশ করবে ওরা? খোদার কসম, আমার মায়ের কসম, আমাদের রক্তের কসম, এর প্রতিশোধ নেব।

সুদীপ্ত বেরিয়ে পড়লেন।

কোথায় যাবেন? এমনই পথে পথে ঘুরবেন কিছুক্ষণ? ওরে বাবা, তার সাধ্যি কি! দলে দলে মিলিটারি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে রাস্তায়—তাদের দিকে

চাওয়া যায় না। প্রবল চেষ্টায় সুদীপ্ত একবার শুধু তাকিয়েছিলেন একটা দলের পানে। ওদের গাড়িটা তখন নিউ মার্কেট থেকে এলিফ্যান্ট রোডের দিকে মোড় নিচ্ছিল। গাড়িতে ওরা ছিল বোধহয় পাঁচ ছয় জন হবে, প্রত্যেকের হাতে একটা ক'রে মারণাস্ত্র, সেগুলোর কোনটার কি নাম সুদীপ্ত জানেন না। কোনো ভদ্রলোকেরই বোধহয় তা জানার কথা নয়। মানুষ মারার জন্য কত রকমের কল বানানো হয়েছে তার হিসেব রাখবে কে? আরেক জন মানুষ? হাঁ, তা রাখতেও পারে। কিন্তু সুদীপ্ত তাদের দলে নন। অতএব তিনি কেবল কতকগুলো নল দেখলেন, হিংস্র পশুর মতো কয়েকটি চোখ দেখলেন, আর মাথায় লোহার টুপি। দেখলেন, ইস্পাতের নলগুলো প্রত্যেকটি তাক করা রাস্তার মানুষের পানে। সাধারণ অবস্থায় এ দেখে একটু তো শিউরে ওঠার কথা। কিন্তু শিউরে ওঠার সময় কারো নেই। এমনিতে কোনো ব্যস্ততাও নেই, উদ্বেগটাও বাইরে থেকে চেনা যায় না। কিন্তু একটা অদ্ভুত অসাড়তায় সকলে আচ্ছন্ন। কতকগুলো যেন কলের পুতুল—হাসি নেই, কথা নেই, ভীতিও বোধহয় বিদায় নিয়েছে। মানুষের ভয় পাওয়ারও একটা সীমা আছে না! সুদীপ্ত ভয় পান নি—যদিও স্পষ্ট দেখেছিলেন এক জোড়া চোখ তার দিকে থাবা প্রসারিত ক'রে যেন ল্যাজ নাড়ছে। কিন্তু গাড়ি স'রে গেল, সুদীপ্তও সরে এলেন—তাদের ব্যবধানটা ক্রমেই প্রসারিত হ'তে থাকল। সুদীপ্তর দেখা হয়ে গেল ওসমান সাহেবের সঙ্গে। ওসমান সাহেব হাঁটছেন? গাড়ি গেল কোথায়?

'খবিশগুলো গাড়িখানা পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে গেছে।'

ওসমান সাহেব মাত্র সপ্তাহ খানেক হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় বাড়ি পেয়েছিলেন। কিন্তু গাড়ি রাখার গ্যারেজ খালি ছিল না ব'লে বাইরেই তা ফেলে রাখতে হচ্ছিল। তাঁদের আবাসিক এলাকার দারোয়ানকে বখ্‌শিস দিয়ে গাড়ি পাহারার ব্যবস্থাও করেছিলেন ওসমান সাহেব। অতএব স্বাভাবিক অবস্থায় ভয়ের কিছু ছিল না কিন্তু সেই কালো রাতের হানাদারগুলো ওসমান সাহেবের ভাষায় খবিশগুলো, গাড়িখানা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কত জনের ক'খানা গাড়ি গেছে কে জানে! সুদীপ্তর গাড়ি ছিল না। অতএব ঐ নিয়ে কোন দুশ্চিন্তার অবকাশও তাঁর ছিল না। আজ ওসমান সাহেবকে দেখে তাঁর মনে হ'ল, মানুষের গাড়ি না থাকাটাই বোধহয় ভালো। দীর্ঘকাল গাড়ি নিয়ে বেড়ানোর পর হাঁটতে হলে কেমন লাগে? অন্ততঃ অন্যের যে খারাপ লাগে সেটা ওসমান সাহেবকে দেখে অনুভব করলেন সুদীপ্ত। ওসমান সাহেবের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও হাঁটছিলেন, হেঁটে হেঁটেই তাঁরা চলছিলেন ধানমন্ডির দিকে।

ভাবী, ভালো আছেন?—কথাটা শুধোতে গিয়ে সুদীপ্তর গলায় আটকে গেল। প্রশ্নটা ব্যাঙ্গাত্মক শোনাবে না? সদ্য গাড়ি হারিয়েছেন, তদুপরি রিক্সায় না

চেপে হাঁটছেন–এমন অবস্থায় ভালো আছেন কি না শুধোলে কেউই সে প্রশ্ন প্রসন্নভাবে নিতে পারেন না। কিন্তু ওসমান সাহেবের স্ত্রী নিজেই কথাটা তুললেন—

'আপনারা কোথায় উঠেছেন? ভালো আছেন তো?'

কোন মানুষের পক্ষেই তখন ভালো থাকার কথা নয়। সুদীপ্তর স্ত্রীও ভালো ছিলেন না। গত দু'দিন ভালো ক'রে কিছু খান নি; তা নিয়ে মীনাক্ষী ভাবী অভিযোগও করেছেন। সেই প্রগলভা মিনা এখন কথাও বলেন খুবই কম। ছেলেমেয়েরা কাছে গেলে বিরক্তি বোধ করেন। তবু সুদীপ্ত বললেন—

'ভালোই আছি। আপনারা?'

ওদের কাছ থেকে চ'লে আসার সময় সুদীপ্ত বললেন—

'কাল আপনারা আমাদের ওখানে আসুন না। আপনার ভাবী তো ভয়ানক ঘাবড়ে গেছেন।'

'হ্যা আসব। আপনারাও আসবেন।'

ব'লেই ওরা এগিয়ে গেলেন। সুদীপ্তও চলা শুরু করলেন কিন্তু কেউ কারো ঠিকানা শুধালেন না। বরং মাত্র দু'পা এগিয়ে সুদীপ্ত যখন পাশের মরা কুকুরটাকে এক মনে দেখছিলেন তখন ওসমান সাহেব খুব আস্তে স্ত্রীকে শুধাচ্ছিলেন—

'একটা রিকসা করব? মা'নে তোমার কষ্ট হচ্ছে তো।'

খুব গম্ভীরভাবে স্ত্রী বললেন—

'না'।

ব'লে তিনি চলতে শুরু করলেন। ওসমান সাহেবও স্ত্রীর সঙ্গে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার পেলেন না। স্ত্রীর ব্যবহারে অস্বাভাবিকতাও লক্ষ্য করলেন না। কেননা সেটাও লক্ষ্য করেতে হয়। মন দিয়ে কিছু লক্ষ্য করার অবস্থা তখন ওসমানের ছিল না। গতকাল বাসা ছেড়ে বেরুনোর সময় স্ত্রী শুধু বলেছিলেন—

'মাত্র এই একান্ন টাকা পুঁজি। তখন বললাম, কিছু টাকা উঠিয়ে রাখ।'

ব্যাংক থেকে টাকা ওঠানোর কথা স্ত্রী বলেছিলেন বটে। কিন্তু দু'জনেই তাঁরা জানতেন ব্যাংকে তেমন কিছু নেই যা ওঠানো চলে। কিন্তু নেই কেন? এমনি একটা প্রশ্নের চারা মনে গজাতে দিয়ে গতকাল থেকে কেবল তার উপরেই পানি ঢালছেন ওসমান সাহেবের স্ত্রী। বাইরে কিছু বলছেন না। এই দুঃসময়ে সেটা বলা অসভ্যতা। হাজার হলেও রিটায়ার্ড ডি. আই. জি. সাহেবের কন্যা তিনি। আর ওসমান? তার বংশের কেউ কখনো সামান্য দারোগা হয়েছে এমন দেখাও দেখি। কেবল পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছিল, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছ, তার বেশি তো না। ফ্রিজ. টি. ভি. সোফা সবি তো আমার বাপ দিয়েছে, নিজে কেবল কিনেছ একখানা গাড়ি, তাতেই এমন ফকিরী দশা! মহিলার ক্ষুব্ধ হওয়ার এক গাদা কারণ ছিল। সামান্য একখানা

গাড়ি কিনতে গিয়ে সব গচ্ছিত টাকা নিঃশেষিত হয়েছে। বেশ কিছু ঋণও হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। সেই ঋণ এখন মাসে মাসে কিস্তিতে শোধ করতে হচ্ছে। ফলে এখন প্রতি মাসে যে পরিমাণ টাকা হাতে আসে তা দিয়ে কোনো মতে মাসই চলে না। এই অবস্থায় কোনো মাসে মাইনে না পেলে? তেমনি একটা অবস্থার সম্মুখিন হয়েছেন ওসমান সাহেব। মার্চের মাইনে মিলবে কি না কে জানে!

ওসমান সাহেবের মতো দূরবস্থা সুদীপ্তর ছিল না। গাড়ি নয়, একটি বাড়ির মোহ ছিল সুদীপ্তর। নিজের একটি ছোট্ট বাড়ি থাকবে, চারপাশে থাকবে অনেকখানি খোলা জায়গা। তাতে নিজের হাতে ফুলের গাছ লাগাবেন। ইচ্ছে মতো ব্যবহার করবেন বিপুলা পৃথিবীর কয়েক কাঠা জায়গা। অতএব কিছু কিছু তিনি জমাতে চেষ্টা করতেন। কয়েক হাজার টাকা জমিয়েছেনও। কিন্তু সে আর কতো? একটা বাড়ির জন্যে যা প্রয়োজন তার এক চতুর্থাংশও তো হবে না। তা না হোক। এই দুর্দিনে কিছুকাল মাইনে না পেলে খেয়ে তো বাঁচবেন। হাঁ, ঐটেই এখন দরকার। কোনো মতে বেঁচে থাকা। কেবল বেঁচে থাকা এবং দেখে যাওয়া।

কিন্তু এতো দেখা যায় না! হায় হায়, বর্বরের দল বস্তিগুলো সব পুড়িয়ে দিয়েছে গো। গতকাল পালিয়ে আসার সময় এ সব তো চোখে পড়েনি। হয়ত গাড়িতে আসার জন্যেই চোখে পড়েনি। নীলক্ষেতের পরিত্যক্ত রেল লাইনের দু'পাশে বাস করত হাজার হাজার গরীব মানুষ। নানা সময়ে ঝড়ে-বন্যায় গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা শহরে এসেছে—তারাই এখানে এসে হয়েছে বস্তিবাসী। সেই গরীব মানুষের বস্তি পুড়িয়ে অশেষ বীরত্ব দেখিয়ে গেছে পাক ফৌজ। আর পুড়িয়েছেও ঠিক বীর পুরুষের মতোই। কই তুমি আগুন দিয়ে এমন ক'রে পোড়াও দেখি। টিনও যে এমন হয়ে পুড়ে গ'লে যায় সেটা নিজে না দেখলে সুদীপ্ত কখনো বিশ্বাস করতেন না। একটা টিনের কৌটাও কোথাও পড়ে নেই, তার ফাঁপা কোটরে বাতাসের হাহাকারও নেই। শ্মাশানেও তো কিছু থাকে পোড়া বাঁশ-কাঠ, আধ পোড়া কাঁথা-বালীশ কতো কি থাকে। একটা দীর্ঘশ্বাসকে, একটা মর্মবেদনাকে জানান দেয় তারা। এখানে পোড়া ইটের গায়ে জমা হয়ে আছে বৃক্ষের তীব্র ক্ষত, দু'চোখের প্রচন্ড ক্রোধ। হাতের কাছে আর কিছু না থাকে ঐ পোড়া ইট ছুঁড়ে মার শত্রুর মুখে।

হায় হায়, আস্ত মরদেহ আগুনে ঝলসে রোষ্ট হয়ে আছে। এখনো আছে! কেবল সরিয়ে নিয়ে গেছে পথে পথে গুলি-ক'রে মারা মানুষগুলিকে। ঘরে আগুন লাগলে মানুষ পথে বের হয়। বস্তির মানুষেরা পথে বেরিয়েছিল। আর পথে বেরিয়েই গুলি খেয়েছিল। ভারি সুন্দর রণকৌশল জানে পাক-ফৌজের দল। প্রথমে আগুন জ্বালিয়ে দাও, তারপর লোক পথে বেরুলে কারফিউ-ভঙ্গের

অপরাধে গুলি কর। নরহত্যা হালাল হয়ে যাবে। বাঙালিরা সব কাফের হয়ে গেছে, অতএব তাদেরকে হত্যা করা হালাল। এই যুক্তিতে হাজার হাজার নরহত্যার প্রত্যেকটিই হালাল করে নিয়েছিল পাকিস্তানিরা। না ক'রে উপায়ও ছিল না। তারা ইসলামের বড়াই ক'রে থাকে না! এবং ইসলাম যদি শান্তির ধর্ম হয় তবে এতো অশান্তি সৃষ্টির এতো ধ্বংসলিলার একটা কারণ দেখাতে হবে তো।

অদ্ভুত কারণ দেখিয়েছিল সেই পাকিস্তানি সৈনিক। রেল লাইন অতিক্রম ক'রে তাঁদের নীলক্ষেত আবাসিক এলাকার গেটের কাছে পৌঁছতেই একটা মি-লিটারি জিপ এসে সুদীপ্তর সামনে দাঁড়াল। সুদীপ্ত একবার মনে মনে আল্লাহ্‌কে ডাকলেন, এবং মুহূর্তের মধ্যে সামনের সদ্য পাতা-গজানো দেবদারু গাছটিতে চোখ বুলিয়ে নিলেন। চ'লে যাবার সময় যদি জীবনে এসেই থাকে তবে তৈরি হয়ে নেওয়াই ভালো। মনকে তিনি তৈরি ক'রে নিলেন। দেবদারুর সারা অঙ্গ ভ'রে বাংলার রূপ। এই রূপের পাথেয় নিয়ে পরকালের যাত্রাকে মধুময় ক'রে নেওয়া যায় না? ঘরের মধ্যে রাতের অন্ধকারে ইঁদুরের মতো ম'রে প'ড়ে থাকাটা তিনি যে এড়াতে পেরেছেন সেই জন্যই তিনি নিয়তিকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। এখন এই উজ্জ্বল সকালে দেবদারু গাছের ছায়াতে ম'রে যেতে আর আপত্তি নেই।

ওহে জেন্টল্‌ম্যান, তোমার আপত্তি থাকলেই বা সে কথা শুনছে কে? ঐ যে রাইফেলের নলটা দেখছ। ঠিক তোমার বুকের দিকে তাক করে আছে। সুদীপ্ত একটা খাকি মূর্তিকে দেখলেন।

'ইধার সে কাঁহা যাতা হ্যায়।'

'হামারা ঘর মে যানা চাহতে হ্যায়।'

উত্তরটা চট ক'রে বেরিয়ে গিয়েছিল সুদীপ্তর মুখ দিয়ে। কিন্তু ওদিক থেকে জবাব এসেছিল—

'কুত্তাকা ঘার নেহি হ্যায়, চলো।'

ব'লেই সে খাকি মূর্তিটা রেল লাইনের দিকে তার রাইফেলের নল প্রসারিত ক'রে দিল। অর্থাৎ রেল লাইনের ওদিকে শ্মশানের মতো এলাকায় সুদীপ্তকে যেতে বলা হচ্ছে। তার মানে যে কি সেটা বুঝতে অসুবিধা ছিল না। যাওয়া আদৌ নিরাপদ নয়, না গেলেও বিপদ। বিপদের সময় বুদ্ধি কে জোগায় সুদীপ্তর জানা নেই। বুদ্ধিটা পেতে কোন চেষ্টাও তিনি করেন নি। তবু পেয়ে গেলেন–

'হাম কুত্তা নেহি হ্যায়, হাম মুসলমান হ্যায়।'

'তোম যো মুসলিম হ্যায় উ তো ভোল গিয়া।'

তুমি যে মুসলিম সে তো ভুলে গিয়েছিলে বেরাদর। এ অভিযোগের উত্তর কি হবে? সুদীপ্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ মেরে গেলেন। তবু এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন। খাকি মূর্তির আদেশ মোটামুটি ঠিকভাবেই তিনি পালন করেছিলেন—কলেমা পড়তে ভুল করেন নি। এবং নামটাও মিছে ক'রে বলেছিলেন। হাঁতো, চাকরির জন্য যে নাম তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেটা মিথ্যে বৈ কি। সর্বত্রই তিনি সেই সুদীপ্ত শাহীনই আছেন। কিন্তু পাকিস্তানে সর্বত্র সত্যবাদী হয়ে কি ক'রে চলবেন তিনি? যখন কোনো বাঙালি নিজেকে পাকিস্তানি বলেন তখন সেইটেকেই একটা চরম মিথ্যা ব'লে মনে হয় সুদীপ্তর। পাকিস্তানের কোনখানে বাংলাদেশ আছে শুনি? প-এ পাঞ্জাব-পাঠান, ক-এ কাশ্মীর, স-এ সিন্ধু, স্তান-এ বেলুচিস্তান—এই তো "পাকিস্তান" শব্দের ব্যাখ্যা। তা হ'লে বাংলা স্থান পেল কোন্ অংশে? তবু এই বাংলাদেশ নাকি পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুনলেই গা জ্বালা করে সুদীপ্তর। তবুও শুনতে হয়। কেন না তা শোনানোর মতো লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্তর না হলেও নেহাৎ কম ছিল না। সুদীপ্ত সাধ্যমতো তাঁদেরকে এড়িয়ে চলতেই অভ্যস্ত। কি আশ্চর্য, মাঝে মাঝেই সুদীপ্তকে ভাবতে হয়, মধ্যযুগীয় মানসিকতা বিশ্ববিদ্যালয়েও এতো প্রশ্রয় পায়; মধ্যযুগীয় প্রভু-তোষণের মনোবৃত্তিটাকে সুদীপ্ত ঘৃণা করেন। অথচ অনেকে সেটাকে লালন ক'রে খুশি, এবং লাভবানও। তাদের সান্নিধ্য সুদীপ্ত এড়িয়ে চলেন। তবু কি সব সময় এড়িয়ে চলা যায়? হাজার হ'লেও এক সাথে চাকরি করেন– কমনরুমে, ক্লাবে দেখা-সাক্ষাতটা তো আর এড়িয়ে চলা যায় না। সেদিন একটা ছোট বিতর্ক সুদীপ্ত এড়াতে পারেননি। কতকক্ষণ আর কথা না ব'লে দুটি মানুষ মুখোমুখি বসে চা খেয়ে যেতে পারে। অত্যন্ত সাবধানে সুদীপ্ত নিছক আবহাওয়ার কথা উত্থাপন করেছিলেন—

'পূর্ব বাংলায় এবার বেশ অনাবৃষ্টির বছর যাবে বলে মনে হচ্ছে।'

নিঃসন্দেহে তিনি খুব নিরাপদ প্রান্তরে বিচরণ করেছেন বলেই সুদীপ্তর ধারণা হয়েছিল। কিন্তু সুদীপ্তর দশা হয়েছিল সেই একচক্ষু হরিণের মতো। একটা দিকে তিনি নজর রেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আর একটি দিক তিনি দেখতে পাননি। তাঁর সহকর্মী সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠেছিলেন—

'পূর্ব বাংলা নয়, বলুন পূর্ব পাকিস্তান।'

সহসা সুদীপ্ত একটু উত্তেজিত হয়েছিলেন যেন। বলেছিলেন—

'কেন? পূর্ব বাংলা বললে কি দোষ হয়?'

'একশো বার দোষ হয়। আমরা যে এক জাতি–পাকিস্তানি–সে কথাটা অস্বীকার করা হয় ওতে।'

এই কথা শোনার পর আর কিছু বলা যায় না। বলা উচিত নয়। উচিত

অনুচিতের এই বোধটুকু না থাকলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব-রক্ষা অসম্ভব। তবে একদিক থেকে তাঁর সহকর্মী অধ্যাপকটি মিথ্যা বলেননি। পরে ভেবে দেখেছিলেন সুদীপ্ত। সত্যিই তো পাকিস্তানের মধ্যে বাংলার স্থান কোথায়। প-এ পাঞ্জাব-পাঠান, ক-এ কাশ্মীর, স-এ সিন্ধু, স্তান-এ বেলুচিস্তান— কিন্তু বাংলা হবে কি দিয়ে? অতএব সোজা সমাধান–"বাংলা" শব্দটাকে বাদ দাও। বল "পূর্ব পাকিস্তান"। জাতীয় সংহতি রক্ষা পাবে।

আয়ুব খানের আমলে অনেকেই জাতীয়-সংহতি রক্ষার দালালি নিয়ে বেশ দু'পয়সা ক'রে খেয়েছে। পথে-ঘাটে, ক্লাবে-রেস্তোরাঁয় যত্রতত্র তারা এই জাতীয়-সংহতির সবক বিতরণ করত। তা নিতে না চাইলেও কানে শুনতে হ'ত সকলকেই। সুদীপ্তও সেদিন তা নীরবে শুনেছিলেন, শুনতে হয়েছিল। আজ তেমনি তাঁকে শুনতে হল ধর্মের কথা। তাঁকে ইসলাম ধর্মের সবক নিতে হ'ল পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকের কাছ থেকে। তাঁরা যে মুসলিম এটা নাকি বাঙালিরা ভুলে গিয়েছিলেন, তাই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী রাতের অন্ধকারে কামান-মেশিনগান-রাইফেল নিয়ে ঘরে ঘরে এসে বাঙালিকে মনে করিয়ে দিয়ে গেছে– তোমরা যে মুসলমান এটা মনে রেখো বেরাদরগণ।

মনে না রাখলে?

তোমাদের হত্যা করা হবে। মুসলমানদের আবাসভূমি পাকিস্তান। সেই পাকিস্তানে বাস ক'রে তুমি ইসলামকে ভুলে যাবে? তা হ'লে তোমাকে হত্যা করা আমাদের জন্য ফরজ কাম।

অতএব পাক-সৈন্যদের সেই রাতের তাণ্ডবলিলা না-যায়েজ হয়নি।

কিন্তু তবু প্রশ্নটা মন থেকে তাড়ানো যায় না। মুসলমানরা না হয় হিন্দু হয়ে যাচ্ছিল বলে তাদের মেরে বেড়ালে। কিন্তু হিন্দুরা? তারা কি সব মুসলমান হয়ে যাচ্ছিল। তাদের মারার কারণ কি?

'ওরে বাবা, তারা যে হিন্দু। পাকিস্তানে হিন্দু থাকতে দেওয়া যায় নাকি?

কেন? তোমাদের বাপ কায়েদে আজম যে ব'লে গেছেন, পাকিস্তানে কোনো মুসলমান মুসলমান হবে না, কোনো হিন্দু হিন্দু হবে না। তারা সবাই মিলে হবে একটি জাতি–পাকিস্তানি। তা হ'লে আবার কিভাবে তোমরা এখানে হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ সৃষ্টি করছ বুঝিনে।

বুঝলে না? হিন্দু মাত্রই ধরে নিতে হবে পাকিস্তানের দুশমন। আর দুশমন দেখলে তাদেরকে গুলি করা সামরিক বিধানে বিলকুল জায়েজ।

এইভাবে বস্তির দরিদ্র মানুষ, ভদ্রলোক মুসলমান, ভদ্রলোক হিন্দু প্রত্যেককে হত্যা করার উপযুক্ত কারণ পাকিস্তানিরা বের করেছিল। আহা, একজন মুসলমান তো আর অকারণে নরহত্যা করতে পারে না।

খাকি মূর্তিটার হাত থেকে রেহাই পেয়ে সুদীপ্ত তাঁদের আবাসিক এলাকায় ঢুকলেন। ঠিক যন্ত্রচালিতের মতো। ঢুকেই অনুভব করলেন সেই ক্লান্তিটাকে। যেন সদ্য সাত ক্রোশ অতিক্রম ক'রে এখানে এসে পৌঁছলেন। পা পড়ে না, হৃৎপিন্ড যেন অবশ হয়ে আসছে—পাশের পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। এই তাঁদের সেই আবাসিক এলাকা যেন তিনি মধ্যযুগীয় কোনো দুর্গে প্রবেশ করেছেন। মাত্র একদিনেই সারা এলাকা। হয়ে গেছে শত্রু-বিধ্বস্ত পরিত্যক্ত দুর্গ। সুদীপ্ত যেন এক রজনীর নিদ্রা-শেষে দু'শো বছর পরের পৃথিবীতে জেগে উঠেছেন। আসহাব কাহাফের অভিজ্ঞতার প্রান্ত ছুঁয়ে চারপাশে একবার তাকালেন। একটিও মানুষ নেই। যেখানে মানুষ থাকে না সেখানে কি আসতে আছে? এ তুমি করেছ কি সুদীপ্ত? স্ত্রী নিষেধ করেছিলেন। সুদীপ্ত শোনেন নি। এমনিতেই মেয়েরা যথেষ্ট বুদ্ধি-চালিত নয়, তদুপরি বিপদের দিনে? পুরোপুরি তখন তারা হৃদয়বৃত্তির নির্দেশে চলে। তখন তাদের কথায় গুরুত্ব নেই। সুদীপ্তর এই ধারণা আজ সকালেও বেশ সজীব ছিল। এবং নিজের বুদ্ধিবৃত্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহই মনের মধ্যে ছিল না। কিন্তু এখন? মনে হচ্ছে, বুদ্ধি যেন ঠিকমতো কাজ করছে না, কোন জীবাণু প্রবেশ ক'রে তাকে ধূলিশায়ী করতে চাইছে। মনে হচ্ছে, স্ত্রীর কথায় কান দিলেই তিনি ভালো করতেন। এখন কি আর কান দেবার সময় আছে? এখনো যেন সুদীপ্ত শুনতে পাচ্ছে....

'না, বাইরে যেতে হবে না। তুমি যেতে পারবে না।'

'তুমি কিচ্ছু ভেবো না। কোনো ভয় নেই। এই যাব আর আসব। ফিরোজ তো গেল বাইরে। ভাবী তো কই বাধা দিল না।'

ভাবী অর্থাৎ ফিরোজের স্ত্রী। মীনাক্ষী নাজমা। মীনাক্ষী বাধা দেয় নি। আমিনা কি তার চেয়ে কোন অংশে খাটো যে বাধা দিতে যাবে। একটা ক্ষেত্রে তো আমিনার পরাজয় হয়েই আছে। সেটা নামে। তার নাম সুদীপ্তর পছন্দ নয়। কিন্তু কবি সুদীপ্ত খুবই পছন্দ করেন মীনাক্ষী শব্দটাকে। নাম কি কারো গায়ে লেগে থাকে নাকি—এই ব'লে স্বামীর পছন্দটাকে একটা থাপ্পড় ক'ষে দিয়ে নিজেও মনে মনে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিলেন আমিনা। আজ অতএব মীনাক্ষী প্রসঙ্গ উঠতেই আমিনাকে তাঁর ফণা একটু গুটাতেই হ'ল—

'কোথায় যাবে?'

'আমাদের ফ্ল্যাটে।'

কোনো কথা না বলে আমিনা স্বামীর চোখের দিকে তাকালেন। সুদীপ্ত সুস্পষ্টভাবে বুঝলেন, উপযুক্ত কৈফিয়ৎ না দিয়ে বেরুনো যাবে না। প্রায় অনুনয়ের সুরে তাঁকে বলতে হ'ল.....

'দেখ, খাতা-কলম কিছু আনা হয় নি। দু-একটা লাইন কিছু লিখলে মনের অবস্থাটা অন্ততঃ রক্ষা পাবে।'

স্ত্রী গম্ভীর হয়ে গেলেন। ভাবখানা এই—তোমার যা খুশি করো গে, আমি কিচ্ছু জানি নে। সুদীপ্তও আর কিছু জানানোর দরকার মনে করলেন না। নীরবে জামা-জুতো পরে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু বেরিয়ে তিনি ভুল করেছেন বৈ কি। এক শো বার ভুল করেছেন। তা হ'লেও বাসার এত কাছে এসে আর ফিরে যেতেও চান না। এগুতে শুরু করলেন।

এই ফ্ল্যাটগুলোতে থাকতেন কারা? তারা সেই দু'শতাব্দীর পূর্বের ফেলে-আসা পৃথিবীর মানুষ। তারা এখন ইতিহাস। এইখানে থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়-অফিসের একজন হিন্দু কর্মচারি, বাড়ি নোয়াখালি। আর তাঁর সামনেই ঐ ফ্ল্যাটে যিনি ছিলেন তাঁর আদি নিবাস বিহার। নোয়াখালিতে ছেচল্লিশের দাঙ্গায় শ্রীগোপালচন্দ্র ভৌমিক তাঁর বাবাকে হারিয়েছিলেন। নিজে তিনি তখন মায়ের সঙ্গে ছিলেন মামা বাড়িতে, চাঁদপুর। অতএব নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তিনি ও তাঁর মা সেবার বেঁচে গেছেন। তারপর মামা বাড়িতে থেকেই বি. এ. পাস ক'রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছেন। ভারতে যান নি। মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। ক্রমেই তিনি ভুলে গেছেন, তিনি হিন্দু না মুসলমান। তাঁর সহকর্মী বন্ধু হুমায়ুন তাঁকে হিন্দুত্ব ভুলিয়ে ছেড়েছে। হাঁ, ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপরাটা গোপালদের বাড়িতে ছিল বৈ কি। কিন্তু হুমায়ুনটাকে বাগ মানানো যায় না কিছুতেই। তুমি মুসলমান, তোমার না হয় ছোঁয়াছুয়িতে জাত যায় না। আমাদের ব্যাপারটা একটু ভাববে তো! না। তা ভাবতে রাজি নয় হুমায়ূন। কোনো যুক্তিই তাঁকে স্পর্শ করে না। তাঁর যুক্তি একটাই—ধর্মভেদ জাতিভেদ বর্ণভেদ সব ঝুটা হ্যায়। বাবা, মানুষ হ'তে শেখো। নইলে সবাই মরবে। শেষ পর্যন্ত বৌদিকে অর্থাৎ গোপালের স্ত্রীকেও নেমন্তন্ন রক্ষা করতে হয়েছে হুমায়ুনদের বাড়িতে—একেবারে ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন। কিন্তু কৈ, কিছু তো মনে হয় নি। বরং হিন্দুর বাড়ি মুসলমানের বাড়ি ব'লে যে ভেদটাকে তিনি নিজের মধ্যে এতকাল লালন ক'রে এসেছেন সেটাকে তাঁর মনে হয়েছে কৃত্রিম।

অত্যন্ত কৃত্রিম ছিল সেই সম্পর্ক যাকে সত্য বলে মনে ক'রে অবাঙালি মুসলমানকে একটা আত্মীয় ব'লে বুকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলেন বাঙালি মুসলমান। এই তো এই ফ্ল্যাটে আলি ইমাম জৌনপুরিকে দেখ না। বাংলাদেশে

এসছেন বিশ বছর আগে। দাঙ্গায় আত্মীয়-স্বজন সকলকে হারিয়ে কোনো মতে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। কিন্তু বেছে বেছে মিশেছেন অবাঙালি মুসলমানের সঙ্গে এবং আজো সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছেন।

কিন্তু কথা তো খালি ঐটুকু নয়। এক ভাষার মানুষ অন্য ভাষার মানুষের সাথে সহজে মিশতে পারে না। সেটা কি অপরাধ? কিন্তু অপরাধ ঐখানে যেখানে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে হাত মিলিয়ে বাঙালিদের স্বার্থের বিরোধি চক্রান্তকে সফল হ'তে দিচ্ছে। বাধা তো দূরের কথা, বরং তারা বাঙালি শোষণের কাজে সহায়তা করেছে পশ্চিম পাকিস্তানিদেরকে। ঐখানে বাঙালিরা কাউকে ক্ষমা করতে রাজি নয়। কাউকে না, আপন আত্মীয় হ'লেও না।

একটা ভাবনার মধ্যে সুদীপ্ত ক্ষণিক আনমনা হয়েছিলেন। এবং আনমনা হয়েই একে একে অতিক্রম করেন বাকি পথটুকু, পৌছলেন শেষ প্রান্তের তেইশ নম্বর বিল্ডিংয়ে। সারা এলাকায় কোনো একটি মানুষের সাথে দেখা হ'ল না। এতো নির্জনতা। প্রথম দিবালোকে এই এলাকায় এতো নির্জনতা অনন্ত কালের ইতিহাসে কখনো বোধহয় নামেনি। রাতের নির্জনতা নিয়ে কথা ওঠেনা। সবাই জানে, মানুষ তখন ঘুমোয়। ঘরে ঘরে ঘুমন্ত মানুষগুলিও এক ধরণের সঙ্গ দিতে পারে মনকে। একটা অনুভূতি—ওরা আছে। হাঁ, ঘুমিয়ে আছে। তবু আছে। কিন্তু প্রাক-মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে একটি মানুষেরও দেখা যদি না মেলে? না, রাত্রির জনহীনতার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। কেউ না থাকলে তখন নিশাচর প্রাণীরা থাকে। আর এখন? আশ্চর্য, পথে আজ সেই কুকুরটাও নেই। নীলক্ষেত এলাকার সেই লা-ওয়ারিশ কুকুরটা। কেউই ওটাকে পোষেনি। আস্তাকুঁড়ের এঁটোকাটা খেয়ে বড়ো হয়েছিল। মিউনিসিপ্যালিটির কুকুর নিধন অভিযানের সময় রক্ষা পেয়েছিল নিছক নিজের বুদ্ধিতেই। কোনো মানুষের সহায়তা সে পায় নি। তবু সে মানুষকে মেনে নিয়েছিল বন্ধু ব'লে। সে ছিল নীলক্ষেত এলাকার সকল মানুষের। এই আবাসিক এলাকার প্রত্যেকটি মানুষকে সে চিনত, কিন্তু রাত্রে চোরের মতো অচেনা কেউ আসুক দেখি! প্রবল ঘেউ ঘেউ চীৎকারে পাড়া মুখর ক'রে তুলত। ঐ রাতেও একবার তার ঘেউ ঘেউ চীৎকার সুদীপ্ত শুনেছেন। তারপরই চুপ। বীর পুরুষেরা ঠিক ওটাকে গুলি ক'রে মেরেছে। আর মেরেছে এ দেশের মানুষ। মানুষ-কুকুরে পার্থক্য নেই! আছে। কিন্তু তা আছে মানুষের দৃষ্টিতে। জানোয়ারের কাছে নেই। মানুষের চামড়া গায়ে সবাই কি মানুষ?

তেইশ নম্বরে প্রবেশ করলেন সুদীপ্ত। অভ্যাস মত সারি সারি চিঠির বাক্সগুলির দিকে তাকালেন। কোনো চিঠি আছে? থাকে যদি? না, থাকবে না। "কে আর লিখবে চিঠি"—এই দীর্ঘশ্বাস অবশ্য সুদীপ্তর জীবনে নেই। তাঁকে চিঠি লেখার মানুষ অনেক—আত্মীয়-স্বজন সামান্যই, কিন্তু বন্ধু-বান্ধব বিস্তর।

অতএব চিঠি তাঁর থাকতেই হবে। কিন্তু চিঠি আসার পথ কৈ? সেই আগুনে কতো বাড়ি-ঘর পুড়েছে, কতো মানুষ পুড়েছে, আর চিঠির কাগজ পুড়বে না? অতএব তিনি আর চিঠির বাক্স খুললেন না।

কিন্তু এগোতেও পারলেন না। সিঁড়িতে রক্তের দাগ। হাঁ, এ দাগ তো থাকারই কথা। এতোক্ষণ যেন কথাটা ভুলে ছিলেন সুদীপ্ত। তাঁর ঘরে যেতে হ'লে এই রক্ত মাড়িয়ে যেতে হবে! মানুষের রক্ত মাড়াতে হবে! আরেকটা মানুষের গায়ে পা ঠেকালে মানুষ কতো অপ্রস্তুত হয়। সালাম দিয়ে ক্ষমা চেয়ে তবে স্বস্তি পায়। আর এ তো রক্ত। শরীরের অভ্যন্তরে তা আরো পবিত্র, আরো অন্তরতম। তাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে যাওয়া! হাঁ, এই রক্তই গতকাল পা দিয়ে মাড়িয়েছেন। না মাড়িয়ে উপায় কি ছিল? ঘর থেকে বেরুতে হ'লে রক্ত না মাড়িয়ে উপায় ছিল না। পাকিস্তানি জল্লাদদের খুন করার কায়দাটা ভারি চমৎকার। ঠিক ঘর থেকে বেরুবার মুখে দাঁড় করিয়ে গুলি করেছে। যেন তার রক্ত অন্যদের শুধু নয়,আত্মীয়দেরও পায়ে পায়ে দলিত হয়। বুক ফেটে কান্না এল সুদীপ্তর। না, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। দু'হাতে চোখ ঢেকে সিঁড়িতেই ব'সে পড়লেন অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন। কয়েক বছরই তো এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করেছেন, কখনো এর উপর বসার কথাটা সুদীপ্তর মনে হয়নি। সম্পর্কটা ছিল কেবল পায়ের সঙ্গে।

সুদীপ্ত প্রায় শিশুর মতো কিছুক্ষণ কাঁদলেন। শিশুর মতই দুচোখ দিয়ে পানি ঝরল, কেবল কণ্ঠ দিয়ে কোনো চিৎকার বেরুল না। বেরুলেই বোধ হয় তিনি বাঁচতেন। একটিও কণ্ঠের কোনো শব্দ যেখানে নেই সেখানে মানুষ বাঁচে? মনে হচ্ছিল, একটা প্রবল নিঃশব্দতা বিশাল দৈত্যের মতো বাহু বিস্তার করে সুদীপ্তর গলা টিপে ধরেছে। আঙুলের চাপ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে তাঁর গলার উপর। নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। আর কি তবে বাঁচবেন না? না, বাঁচতেই হবে। সব গেলেও বাঁচার ইচ্ছেটা এখনো যায় নি।

অবশেষে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সুদীপ্ত, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বেড়িয়ে পড়লেন তেইশ নম্বর বিল্ডিং থেকে। এই তো সবে গতকাল এই দালান ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন তারা। তখন কি মনে হয়েছিল। আর কখনোই এখানে ঢুকতে পারবেন না! কখনোই ঢোকা যাবে না এখানে? তাই তো মনে হচ্ছে এখন সুদীপ্তর। তাঁর জীবনের বেশ কয়েকটি বছরের স্মৃতি এই বাড়িটার সাথে জড়িত। কতো ক্লান্তির কতো আনন্দের কতো ইচ্ছা ও আশায় পাখিরা এর রেলিঙে বসেছে, কার্নিশ ছুঁয়ে আকাশে উধাও হয়ে গেছে, রক্তের শস্যকণায় ফিরে এসেছে বার বার। মানুষ এমনি ক'রেই বাঁচে।

কিন্তু এ কেমন বাঁচা! আকাশে পাখি ওড়ে না, পথে কোন প্রাণীর পদসঞ্চার নেই, বাতাসে কোন কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় না কেবল একটা শূন্যতার, একটা ভয়ংকর অনিশ্চয়তার দ্বীপে তারা বন্দী। এর নাম বেঁচে থাকা? প্রাণপণ শক্তিতে

একবার বলতে চেষ্টা করলেন—

যে ক'রেই হোক, আমাকে বাঁচতে হবে—বাঁচতেই হবে।

তোমাকে বাঁচতে হবে? তোমার জীবন খুব মূল্যবান? যাঁরা ম'রে গেলেন তাঁদের চেয়ে তোমার নিজের জীবনটাকে বেশি মূল্যবান মনে করছ কেন অধ্যাপক?

অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন দার্শনিক নন। কবি। জীবন নিয়ে কোনো দার্শনিকতা তিনি জানেন না। জীবনকে কেবলই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে তাঁর। ঠিক মায়ের মতো। সুদীপ্তর কাছে জীবনকে তাঁর সন্তানের মতো মনে হয়। সন্তানের কাছে বাপ-মায়ের কোনো প্রত্যাশা থাকে? অন্ততঃ সজ্ঞানে থাকে না। তাকে সাজাতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। পরম অভাজন সন্তানও কি মায়ের স্নেহ উদ্রিক্ত করে নি। নাহ্, জীবনের কোনো অর্থ আছে কি নেই-এমন প্রশ্ন অর্থহীন। ঐ সব প্রশ্ন তাঁর মনে জাগে না, ও নিয়ে কিছু ভাবতেও ভালো লাগে না। কিন্তু কোনো সকালে নিজের বাগানের এক গুচ্ছ ফুল এনে টেবিলে সাজিয়ে দিতে পারলে? সারাদিন সেই ফুলের হাসির কাছে বার বার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে।

সুদীপ্ত প্রায় রেল-গেটের কাছে এসে পৌছতেই একটা ভক্সওয়াগন গাড়ির মুখোমুখি হলেন। ভয়ের কিছু ছিল না। সাধারণ নাগরিকের গাড়ি। কিন্তু চেনা মানুষ কেউ নেই গাড়িতে। এবং আশ্চর্য এই যে গাড়িটা তাঁদের আবাসিক এলাকার ভেতরেই ঢুকছে। তাঁকে দেখেই হয়ত হবে, গাড়িটা থেমে গেল। এক ভদ্রলোক গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শুধালেন—

'তেইশ নম্বর বিল্ডিংটা কোনদিকে বলতে পারেন।'

তেইশ নম্বর? এরা তেইশ নম্বরে যাবে? কারা এরা? কার খোঁজে যাচ্ছেন?-প্রশ্ন তো এমনি অনেক কটি ছিল। এবং মনে হচ্ছে, প্রশ্নগুলি তাঁর ভয়াবহ একাকীত্বকে বিদ্ধ ক'রে বোমার ভেতরকার এক-একটি লৌহ-শলাকার মতো তাঁর মনের প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে গেল। ভালোই তো হ'ল। এতো একাকীত্বের ভার এতক্ষণ কী ক'রে তিনি বহন ক'রে চলেছিলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে দু'টো কথা বলে সুদীপ্ত যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। ভদ্রলোক যাচ্ছেন মৃধা সাহেবের

খোঁজে।

হাঁ, ভালোই আছেন তিনি। গতকাল তিনি সপরিবারে ফরিদপুর যাবেন ব'লে বেরিয়ে গেছেন।

'না তা বলতে পারি নে। আপনি লঞ্চঘাটে খোঁজ নিলে বোধ হয় জানতে পারবেন। গতকাল যদি ফরিদপুরের কোন লঞ্চ ছেড়ে থাকে, নিশ্চয় তা হ'লে চ'লে গেছেন তাঁরা। নইলে যেতে পারেন নি।..........

'হাঁ, ঠিকই শুনেছেন। ওটা মৃধা সাহেবের ঠিক পাশের ফ্ল্যাটের ঘটনা। তেইশ-এর এফ-এ সকলেই মারা গেছেন। মৃধা সাহেব থাকতেন তেইশ-এর ই-তে।---...

'জি, আল্লাহ্ বাঁচিয়েছেন। মৃধা সাহেবের বেঁচে যাওয়াটা একটা মিরাক্‌ল্।'

মৃধা সাহেবের মুখে তাঁর বাঁচার কাহিনী সুদীপ্তর মিরাক্‌ল্ই মনে হয়েছিল গতকাল। কিন্তু পরবর্তীকালে? অমন যে কত ঘটনার কথা কানে এসেছে যা বিশ্বের যাবতীয় মিরাক্‌ল্‌কে হার মানাবে। মৃধা সাহেবের স্ত্রী অনর্গল উর্দু বলতে পারেন। অতএব তাদের বেঁচে যাওয়ার একটা ক্ষীণ কার্যকারণ সূত্র সুদীপ্ত খুঁজে পেয়েছিলেন। উর্দুভাষীকে নয়, কেবল বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যার আদেশ ছিল টিক্কা খার। সেই অবস্থায়, একটুও উর্দু জানে না—এমন বাঙালি হিন্দুর পক্ষে পাকিস্তানি জওয়ানদের কবল থেকে বেঁচে আসাটা কোন পর্যায়ে পড়ে?

জগন্নাথ হলের সেই ছাত্রটির কথাই ধরা যাক। পঁচিশের রাত দশটা থেকে সাতাশের বেলা দশটা পর্যন্ত ছেলেটি তাদের হলের পাশে স্যাভেজ রোডের সবচেয়ে উঁচু গাছটার উচ্চতম ডালে কাটিয়েছিল। এই ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে না কিছু সে খেয়েছে, না ঘুমিয়েছে। সাতাশ তারিখে গাছ থেকে নামবার সময় মাটির কাছাকাছি পৌঁছতেই সামনে পড়ে একটা মিলিটারি গাড়ি। যাচ্ছিল পুরোনো ঢাকার দিকে। তাকে গাছ থেকে নামতে দেখে ধ'রে ফেলে তারা, এবং গাড়িতে উঠিয়ে নেয়। হায় হায়, ছত্রিশ ঘন্টা এতো কষ্ট ক'রে নিজেকে সে বাঁচিয়েছিল কি শেষ পর্যন্ত এইভাবে বেঘোরে প্রাণ হারাবার জন্য! এখন তাকে নিয়ে কি করবে এরা! কি করতে পারে। নিঃসন্দেহে কোথাও নামিয়ে এক্ষুণি মেরে ফেলবে। মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকে ছেলেটি। হঠাৎ গাড়িটা একটা বাজারের মোড়ে এসে থেমে যায়। বাজার লুঠ হচ্ছে। তা দেখে গাড়ির চারটে জওয়ানের তখন মাথা ঠিক থাকার কথা নয়। লড়াই ক'রে তারা ঢাকা শহর জয় করেছে! সারা শহরের সকল সম্পদ এখন গণিমাতের মাল। যেখানে যা পাও লুটে-পুটে নাও। কাফের বাঙালিদের দোকান-পাট লুট করা নেকির কাম। হুজুর টিক্কা ফতোয়া দিয়েছে। অতএব নেকি হাসিল করার কামে ঝাঁপিয়ে পড়ল জওয়ানেরা। ছেলেটি তখন খালি গাড়িতে ব'সে তার জওয়ান ভাইদের জন্য প্রতীক্ষা করবে নাকি! একদিকে নেমে এক ফাঁকে সে পালাল। কিন্তু এখানেই তার কাহিনী শেষ হয় নি। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পর তার বেঁচে থাকার বৃত্তান্ত সুদীপ্ত শুনেছিলেন।

কাহিনীটা সেকালের হ'লে একালের মানুষ তাকে বলত রীতিমত নভেল।

আরো তিনবার সে সামরিক জওয়ানদের কবলে পড়ে। দ্বিতীয়বার নদীতে নৌকায় নদী পার হবার সময় পাকিস্তানি বীরপুরুষেরা নৌকা লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করলে কিভাবে সে বেঁচেছিল? সে কি কম অলৌকিক? অধিকাংশই মারা গেল। কেউ গুলি খেয়ে, কেউ নদীর জলে খাবি খেয়ে। কিন্তু সে নিজে সাঁতার না শিখেও বাঁচল কিভাবে? গুলিতে ছিন্নভিন্ন নৌকার ভগ্নাংশ আশ্রয় ক'রে এক সময় ছেলেটি কূল পেয়েছিল। মৃত্যুর তীর থেকে এসে জীবনের কূলে ভিড়েছিল। এবং তারপর?

গ্রামাঞ্চলের একটি বাজার এলাকায় পুনরায় সে পাক-জওয়ানদের কবলে পড়েছিল। ইতিপূর্বে দুবার বেঁচে এসেছে। না, এবার আর রক্ষা নেই। প্রাণের ভয়ে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। সেইখানে গিয়ে পাক-জওয়ানেরা পাকড়াও করে তাদের-প্রায় বিশ-তিরিশ জন। আশ্চর্য, জওয়ানরা তাদের নিয়ে গিয়ে বাজার লুঠ করার হুকুম দিল। বাজার লুঠ ক'রে সকল মাল-মাত্তা মিলিটারি লরীতে তুলে দিতে হ'ল। তারপর তাদের উপর হুকুম হল-বাজারে আগুন ধরিয়ে দাও। যারা ইতস্তত করছিল বুটের লাথি খেয়ে তাদের আক্কেল হ'ল। প্রাণে বাঁচতে হ'লে ঐ কামই করতে হবে এখন। কিন্তু তবু কি প্রাণে বেঁচেছিল তারা? অন্ততঃ একজন তো বেঁচেছিল। হাঁ, বাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করার সাধ্য তোমাদের নেই। সেই কথাই যেন বলার জন্য বেঁচেছিল সেই জগন্নাথ হলের ছাত্রটি। তাদের সেই লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের সকল ঘটনা মুভিক্যামেরায় ধ'রে নিয়েছিল পাকিস্তানিদের একজন। তারপর দিয়েছিল পুরস্কার। লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে খেতে দেওয়া হয়েছিল মেশিনগানের গুলি। কিন্তু হতভাগ্য ছাত্রটি তা খেতে পায় নি। তার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। অলৌকিক ভাবে ঠিক সেই মুহূর্তে সে ভূমিস্মাৎ হয়েছিল যখন গুলিবিদ্ধ হচ্ছিলেন তার পাশের এক মৌলভি সাহেব। মৌলভী, কিন্তু বাঙালি। অতএব সকলের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে তাঁকেও গুলি করা হয়েছিল। এবং থেকে গিয়েছিল তাঁর অপকীর্তির সাক্ষ্য-জওয়ানদের মুভি ক্যামেরায়। ক্যামেরা সাক্ষ্য দেবে, জওয়ানদের অপরাধ ছিল না। তারা দুস্কৃতিকারীদের কবল থেকে দেশকে বাঁচানোর মহৎ উদ্দেশ্যে বাঙালি নিধন যজ্ঞে অবতীর্ণ হয়েছিল। হাঁ, শুধুই বাঙালি। বিহারি নয় কিন্তু। বিহারিরা খুব ভালো। এমন কি সে পকেটমার হ'লেও । তারা বঙ্গাল মুল্লুকে থাকলেও এই মুল্লুকের ভালো-মন্দ নিয়ে কোন কথা বলে না। তাদের কোনো অভিযোগ থাকলে তা আছে কেবল এই নিমকহারাম কাফের বাঙালিদের বিরুদ্ধে। পশ্চিম পাকিস্তানে থাকে সব সাচ্চা মুসলমান। তোমরা বিহারিগণও সাচ্চা মুসলমান আছ। অতএব মুসলমান হয়ে মুসলমানের বিরুদ্ধে তোমাদের কি আর অভিযোগ থাকবে। বস্তুতঃ কোন অভিযোগ ছিলও না। অতএব বিহারিরা খুব ভালো।

কয়েক ঘন্টা পর ছেলেটি জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখে, মৃত মৌলভির লাশ তার বুকের উপর। তখনি উঠে পালাবার পথ খোঁজে সে। এবং সে পালাতে গিয়ে শেষ বারের মতো আবার একবার পাকিস্তানি জওয়ানদের খপ্পরে পড়ে। একটা বাসে চ'ড়ে সে তখন যাচ্ছিল টাঙ্গাইলের দিকে। পথে এক জায়গায় বাস আটক করে পাকিস্তানিরা সকল যাত্রীকে নামতে বলল বাস থেকে। তারপর তাদের উপর হুকুম হ'ল—

'বাঙালি বিহারি আওর হিন্দু—তিন তিন আলাদা লাইন মে খাড়া হো যাও।'

কিন্তু বিহারি যাত্রী বাসে একটিও ছিল না। সকলেই বাঙালি—কেউ মুসলমান, কেউ হিন্দু। কিন্তু বাঙালি হিন্দু—এই দুটো ভাগে যাত্রীরা কি ভাবে নিজেদের বিভক্ত করবে সেটা কেউ বুঝতে না পেরে সকলেই একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। পাকিস্তানি জওয়ান এতে বিরক্ত হয়ে ভীষণ মুখ খিস্তি ক'রে সকলকে গাল দিল একবার। তারপর নল উঁচিয়ে এগিয়ে এল তাদের পানে। প্রথমেই একজনকে শুধানো হ'ল—

'কিয়া নাম তুমহারা?'

'আব্দুল আজিজ।'

'কালেমা পড়হো।'

আব্দুল আজিজ নিরক্ষর চাষী মুসলমান। কলেমা হয়ত জান্‌ত। কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে কিছু বলতে পারল না। তাকে এক পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল। দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই জগন্নাথ হলের ছাত্র। মনে মনে একটি মুসলিম নাম সে ঠিক ক'রে রেখেছিল। কিন্তু সেই মুসলিম নামেই সে কি বাঁচত?

তার বাঙালিত্ব সে লুকোতো কি দিয়ে? অতএব ভাগ্যক্রমে সঠিক মুহূর্তেই সে তার ভেবে-রাখা মুসলিম নামটি ভুলে গিয়েছিল। বলার সময় ভুল ক'রে নিজের আসল নামটিই বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ দিয়ে—

'বিজনবিহারী—'

বলতে বলতেই থেমে যায় ছেলেটি। নামের 'সেনগুপ্ত' অংশটুকু বলার আগেই তার নিজের ভুল নিজের কাছে ধরা প'ড়ে গেছে। হায় হায়, এখন তবে উপায়? উপায় ছিল ভাগ্যের হাতে। পাকিস্তানি জওয়ানের আর বাকিটুকু শোনার দরকার ছিল না। তার যেটুকু বোঝার তা বোঝা হয়ে গেছে। সে ব'লে ওঠে—

'আপ বিহারি হ্যায়। ইধার মে।'

তুমি যখন বিহারি তখন এদিকে দাঁড়াও। তাকে আর একপাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল। আব্দুল আজিজের কাছ থেকে অনেকখানি তফাতে; অন্য পাশে। এবার তৃতীয় ব্যক্তি। সে ছিল একজন খারেজিয়া মাদ্রাসার তালবিলিম। অতএব বিশুদ্ধ উচ্চারণে সে কলেমা পাঠ করল। জওয়ানটি তা শুনে কিছু বুঝল না বোধ হয়। তখন সে আশ্বস্ত হবার জন্য বিহারিকে শুধালে—

'ইয়ে আদমী ঠিক বোলতা হ্যায়?'

ঠিক বোলতা হ্যায় কি না আমি কি ভাবে জানব? বিজনবিহারী একটু শুধু মাথা নেড়ে জানাতে চাইল-কি ক'রে বলব, আমি ওসব জানি নে। জওয়ানটি বিজনবিহারীর মাথা নাড়ার ভঙ্গি লক্ষ্য করে তালবিলিমকে আব্দুল আজিজের পাশে দাঁড় করাল এইভাবে পরীক্ষা ক'রে ক'রে কয়েকজনকে বিজনবিহারীর কাছে এবং অধিকাংশকে দাঁড় করানো হ'ল আব্দুল আজিজের পাশে। তারপর বিজনবিহারীদের ক্ষুদ্র দলটির উপর হুকুম হ'ল—

'আপ চলা যাইয়ে।'

বিজনবিহারী ও সংগের কয়েকজন বাসে গিয়ে উঠল। জওয়ানদের ইঙ্গিতে বাস ছেড়ে দিল। আব্দুল আজিজসহ অন্যান্যের অদৃষ্টে কী ঘটল তা আর বিজনবিহারী জানে না। কেবল বাস ছেড়ে দেওয়ার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তারা পেছনে মেশিনগানের গর্জন শুনেছিল। বিজনবিহারীর বেঁচে যাওয়ার সেই সুদীর্ঘ দেবশোভন কাহিনী সুদীপ্ত শুনেছিলেন প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পর। ততদিনে গঙ্গা-যমুনায় বহু জল গড়িয়ে গেছে। এবং মৃধা সাহেবের এমনকি তাঁর নিজেরও, বেঁচে যাওয়াকে অন্যদের তুলনায় খুবই সামান্য একটি ঘটনা ব'লে তাঁর মনে হয়েছে।

এবং খুবই সামান্য ঘটনা এটি যে, এখন একজন ভদ্রলোক তাঁদের এলাকার আর-একজন ভদ্রলোকের সন্ধান নিতে এসে তাঁকে কথা বলেছেন কয়েকটি। সেই কথাতেই সুদীপ্ত বাঁচলেন। বিপুল একাকীত্বের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ থেকে মুক্তি মিলল। যেন সহসা আবার তাঁর সাবেক পৃথিবীর মাটি পেলেন পায়ের নীচে। মানুষের সান্নিধ্য মনের জন্য এতো স্বাস্থ্যপ্রদ! কিন্তু রাস্তায় মানুষ কৈ? মোটেই তো সাড়ে এগারোটা এখন। কারফিউ নেই! তবে?

কী বেকুবের মতো ভাবছেন তিনি। কারফিউ নেই, অতএব মানুষ স্বাভাবিক ভাবে পথে বেরুবে? হাট-বাজার করবে? খুব ভালো কথা। কিন্তু ভালো কথা শোনার লোক এখন পাকিস্তানে আছে নাকি! ইয়াহিয়া খান থেকে একটা ক্ষুদে সৈনিক পর্যন্ত কোন লোকটা এখানে কোন নিয়মটা মানে শুনি?

যুদ্ধেরও কতগুলো নিয়ম-কানুন থাকে। থাকে না? কোনো দেশ আক্রমণ করতে হ'লে আগে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়। পাকিস্তান সরকার গায়ের জোরে একটা অঘোষিত যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষের উপর। অকস্মাৎ যাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা নিরস্ত্র। কেউ কখনো নিরস্ত্রকে আক্রমণ করে?

করে না? প্রেমে ও রণে কিছুই অন্যায় নয়।

একটা বিরাট জালিয়াতি আছে কথাটার ভিতর। প্রেমে যদি কিছু অন্যায় না হয়, তবে যুদ্ধে সবি অন্যায়। যুদ্ধটাই অন্যায়। যুদ্ধ ও প্রেম বিপরীতার্থক। তাদের সামান্য লক্ষণ সন্ধান মূর্খের কর্ম।

কিন্তু কথাটার উদ্ভাবক মূর্খ ছিলেন না।

নিশ্চয়ই না। মূর্খতার একটা লক্ষণ হিসেবেই কথাটাকে তিনি তৈরি করেছিলেন। এবং বর্তমানের মূর্খরা ক্ষেত্রবিশেষে নরপিশাচেরা, এটাকে তাদের শয়তানীর কৈফিয়ৎ হিসাবে ব্যবহার করছে।

না না, তা নয়। মানে এ ঠিক যুদ্ধ তো নয়। এ হ'ল যথার্থতঃ বিদ্রোহ-দমন। কোনো দেশের কতকগুলো মানুষ বিদ্রোহ করলে তাকে শায়েস্তা তো করতেই হয়। সেখানে যুদ্ধ-ঘোষণার কথা ওঠে না।

তা হ'লে অন্য কথা ওঠে। বিদ্রোহ কাকে বলবে? দেশে নির্বাচন হয়েছে। সারা বিশ্বের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকার গঠন করবেন। এই স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ যারা করল বিদ্রোহী বললে তো তাদেরকেই বলতে হয়।

কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটা অংশ যদি দেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে চায়?

করতে চাইলে তা হবে নাকি! পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেতে হবে না? এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি কোনো অযৌক্তিক অপকর্ম করতেই চায় তখন প্রেসিডেন্ট তো আছেনই, পার্লামেন্ট বাতিল ক'রে দিয়ে আবার নির্বাচন দিতে পারেন তিনি। জনগণের রায় কোন দিকে তার যাচাই হবে।

জনগণও যদি সেই অপকর্মকে সমর্থন করে?

তা হ'লে সেইটেই হবে। অধিকাংশের ইচ্ছাকে কোনো নীতিধর্মের দোহাই পেড়ে বাধা দেবার অধিকার কোনো একটি ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া যায় না। সারাদেশ যদি বঙ্গোপসাগরে ডুবতে চায়, সে অধিকার তাদের থাকতে হবে। কেবলি একজনের হাতে অমৃত পরিবেশনের ভার থাকার নাম স্বাধীনতা নয়।

এমনি নানা তর্কই তো মনে জাগে। কিন্তু তর্কযুক্তি এ সব তো শিক্ষিত লোকের অস্ত্র। কেবল সভ্য লোকের সাথেই তর্ক চলে। যুক্তির কথা তিনিই মানবেন যিনি বিবেকবান। শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন—কেউ যদি যুক্তির কথা বলেন এবং তিনি যদি সংখ্যায় একজনও হন, আমরা তাঁর কথা মানব।—এই তো বিবেকবান সভ্য মানুষের কথা। এবং চিরন্তন কথা। গণতন্ত্র এই কথাতেই বাঁচে। গণতন্ত্র মানে কি সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে অপকর্ম ক'রে যাওয়া? এক শো বার তা নয়। গণতন্ত্রে আস্থাবান মানুষের মনের কথাই হবে, কেউ যদি যুক্তির কথা বলেন এবং তিনি যদি সংখ্যায় একজনও হন, আমরা তাঁর কথা মানব।

কিন্তু যুক্তির কথা কাকে শুনাবেন শেখ মুজিবুর রহমান? যারা কেবলি দৈহিক শক্তিতে আস্থাবান তাদেরকে? ননসেন্স। অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন 'ননসেন্স' কথাটাই উচ্চারণ করলেন মনে মনে। রেল লাইন পেরিয়ে তিনি

ততক্ষণে উত্তর দিকের ফুটপাথ ধ'রে এগিয়ে চলেছেন। হায় আল্লাহ্ তিনি যাবার সময়ও তো দু' একজন লোক দেখে গেছেন এই পথে। এরই মধ্যে কোন যাদুমন্ত্রে তারা সব অদৃশ্য হয়ে গেল! একটিও দোকান যদি খোলা থাকত!

কতকাল এই পথে তিনি হেঁটেছেন। সকালে মাছের বাজারে গেছেন। বিকেলে বইয়ের দোকানে, কখনো বা অন্য কিছুর! হায় রে, তখন কত ক্রুদ্ধ হয়েছেন মনে মনে। তাঁর দেশবাসী এতো নোংরা। ছী, ছি, একি স্বভাব তাঁর দেশের মানুষের? এই সকালে কাজের সময় শক্ত সমর্থ জোয়ান পুরুষগুলো ফুটপাথের ছায়াতে ক্যারাম খেলে । এবং তা ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন। এ জাতির ভাগ্য যদি ঘুমিয়ে না থাকবে তবে তা থাকবে কার? আর যদি বা খেলবেই তো ঘরে গিয়ে খেল গে না। মানুষের হাঁটবার পথ জুড়ে তুমি খেলবে ক্যারাম আর একজন পাতবে দোকান.....মানুষ তবে হাঁটবে কোন দিক দিয়ে শুনি? এইখানে তো আবার প্রকাণ্ড চুলো পেতে ফুটপাথের প্রায় সবটাই রান্নাঘর বানিয়ে রাখত সেই বিশাল বপু দোকানদারটা। আহা, আজ তার সেই চুলোতে যদি তেমনি গরম জিলিপি ভাজা হ'ত। আর তেমনি মানুষের ভীড় থাকত! সুদীপ্ত কোনোদিন ফুটপাথের দোকানে কোনো খাবার কিনেন না। আজো কিনবেন না। তাও ঠিক। তবু আজ সারা চিত্ত জুড়ে হাহাকারটা জাগল। সবখানি ফুটপাথ জুড়েও যদি লোকেরা দোকান পেতে রাখে তিনি তাতে রাগ করবেন না। কেনই বা রাগবেন? একই দেশের মানুষ না তারা? দেশের মানুষের একটু-আধটু অত্যাচার তো দেশের মানুষেই সহ্য করে। আহা, মানুষের মতো কিছু আছে নাকি পৃথিবীতে। এককালে বাংলাদেশে কত মানুষ ছিল? ধর সেই কালের কথা যখন সারা বাংলায় মানুষ ছিল বর্তমানের সাত ভাগের এক ভাগ। আর মানুষ কম থাকলে যা হয়—পড়ে থাকত সুবিস্তৃত অনাবাদী প্রান্তর। হাঁ, সেই প্রান্তরে বিশাল অরণ্য ছিল। পর্যাপ্ত রৌদ্র বৃষ্টির বাংলায় অরণ্য তো থাকবেই। বিপুল অরণ্য, বিস্তীর্ণ জলাভূমি—নদী, হাওড়, খাল-বিল—এরই মাঝে দু-একখানি গ্রাম নিয়ে এক-একটি জনবসতি এলাকা। এক এলাকা থেকে আরেক এলাকার দূরত্ব কত? অনুমান কর দশ-বিশ ক্রোশ। সুদীপ্ত এখন যেন তেমনি কোনো দশ-বিশ ক্রোশের জনবসতিবিহীন এলাকা অতিক্রম করছেন—পাশে প্রাচীন গৌড় নগরীর পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর। মানুষ বিদায় নিয়েছে। আছে প্রেতাত্মারা আর শেয়ালনেকড়েরা। ঐ তো ঘরগুলির জানলা-কপাট সব ভাঙ্গা-ওর কোটরে কোনো নেকড়ে থাকতে পারে না? সুদীপ্তর মনে হ'তে লাগল, এখন ওখান থেকে নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর। সেকালের মানুষের এক এলাকা থেকে আরেক এলাকা গমনের অভিজ্ঞতা যেন সুদীপ্তকে স্পর্শ করল। এই মুহূর্তে কোনো মানুষের জন্য তাঁর বলতে ইচ্ছে করছে। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। সবার

উপরে মানুষ সত্য? কথাটা কদিন আগেও বলতে দ্বিধা ছিল সুদীপ্তর। ঠিক এই পথেই প্রতিদিন চলতে গিয়ে পদে পদে তিনি মানুষের ঠোক্কর খেতে খেতে কত কি ভাবতেন। না, এতো মানুষের ভীড়ে ব'সে কবি ঐ কথা বলতেই পারতেন না। নিশ্চয়ই কবি কোনোদিন পথে চলতে ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে কোনো মানুষের দেখা পাননি। এবং তখনি তাঁর মনে হয়েছিল ঐ কথা—সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। হাঁ, সুদীপ্তও স্বচ্ছন্দে এখন ঐ সুরে সুর মিলাতে পারেন। এ জন্য অবশ্য তাঁকে ক্রোশের পর ক্রোশ হাঁটতে হয়নি। নীলক্ষেতের রেলক্রসিং থেকে বলাকা সিনেমা কতখানি পথ হবে? আধ মাইলও নয়। কিন্তু সুদীপ্তর মনে হ'ল যেন পেরিয়ে এলেন অন্তহীন পথ। অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে একজন লোকের দেখা পেলেন সুদীপ্ত।

বলাকা সিনেমার কাছে বাটার জুতোর দোকানের সামনে বারান্দায় লোক টাকে সুদীপ্ত দেখতে পেলেন। হাঁ, একটি মাত্র লোক। তবু একটি মানুষ তো। আহ্, একটি মানুষের দেখা পাওয়া গেল। সেই নীলক্ষেত আবাসিক এলাকার রেল-গেটের কাছে ভক্সওয়াগণের ভদ্রলোকটিকে দেখেছিলেন—অতঃপর দেখলেন এই বলাকা বিল্ডিংয়ের বারান্দায় একটি অভদ্র লোককে। মানুষ এমনি অভদ্র হয় নাকি! খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়িতে সারা মুখমন্ডল ভরতি। বোধ হয় চার পাঁচ দিন ওতে খুর পড়ে নি। রুক্ষ চুল। ময়লা শার্ট। ফুল প্যান্টের কোনো শ্রী নেই। জুতো নোংরা । সুদীপ্তকে দেখেই লোকটা খেঁকিয়ে উঠল—

'এই উল্লু, কেতনা বাজতা হ্যায়?'

লোকটা উর্দু ভাষী ব'লে নিজেকে জাহির করতে চাইল। কিন্তু তার উচ্চারণেই ধরা পড়ল, সে বাঙালি। সহসা কথাটা সুদীপ্তর মনে পড়ল। এই সময় নিজেকে অবাঙালি বলে প্রমাণ করতে পারলে ভারি সুবিধে। গতকাল থেকে বহু বঙ্গ-সন্তানই উর্দু ভাষা রপ্ত করতে লেগেছে। এবং সেই সঙ্গে ঘৃণা। উর্দুকে এতো ঘৃণা বাঙালিরা আর কখনো করে নি। তারা বাংলা চেয়েছে, কিন্তু মনে কোনো উর্দু বিদ্বেষ পোষণ করে নি। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় সুদীপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তখন উর্দুকে বয়কট করার একটা প্রবণতা ছিল, কিন্তু এমন ঘৃণা ছিল কোথায়। আজ তারা, বাঙালিরা পথে বেরিয়ে উর্দু

বলে। অন্তত বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই সাথে ঘৃণাও করে—বিজাতীয় ঘৃণা। একেবারেই পছন্দ নয় এমন মেয়ের সাথেও মানুষের বিয়ে হয়। অন্য দেশে হয় কিনা জানা নেই—আমাদের দেশে তো হয়। অবস্থার ঠেলায় প'ড়ে এমন অবাঞ্ছিত মেয়ের সাথেও যদি ঘর করতে হয়? তাকে ভালোবাসার কোন প্রশ্ন ওঠে নাকি। না। বরং ঠিক উল্টোটি হয়। তালাক দিতে পারলে তবু যা হোক সহানুভূতিটা থাকে—প্রীতি না থাক, শুভেচ্ছার অভাব হয়ত হয় না। অন্যথায় সারা জীবন ঘৃণা ক'রে যেতে হয় সে মেয়েকে। বাঙালির ভাগ্যে এমনি অপছন্দ অবাঞ্ছিত স্ত্রীর মতো উর্দুর উদয় হয়েছে নাকি?

অন্ততঃ সুদীপ্তর সামনে একজন অভদ্র লোকের উদয় যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই উল্লু-কোনো অপরিচিত ভদ্রলোককে সম্বোধনের ভাষা এইটে নাকি?

'উল্লু? কাকে উল্লু বলছ তুমি।'

'তুমি উল্লু হ্যায়। সারা বাঙালি আদিম সব বিলকুল উল্লু হ্যায়।'

বলতে বলতে হো হো ক'রে হেসে উঠল সেই অপরিচিত অভদ্র মানুষটি। সহসা সুদীপ্ত যেন মনে করতে পারলেন, লোকটিকে তিনি চেনেন। ইনি সেই প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী আবদুল্লা মনসুর না? ঠিক তাই। আবদুল্লাহ মনসুর—ওরফে আমন। আমনকে তিনি চেনেন। না চিনে উপায় কি? পশ্চিম পাকিস্তান কিভাবে বাঙলাকে শোষণ ক'রে যাচ্ছে সে কাহিনীকে ছবিতে এঁকে ইদানীং শহরে বিপুল সাড়া জাগিয়েছেন চিত্রশিল্পী আমন। আমনের আঁকা বঙ্গ-জননীর একখানি তৈলচিত্র পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে এই তো কয়েক দিন মাত্র আগে। সেই আমন এখানে? এমন বেশে? সুদীপ্ত বললেন—

'আপনি এখানে কি করছেন?'

'তুমি উল্লু এখানে কিয়া করতা হ্যায়? জানতা নেহি যে বারো বাজে তো ফের কারফিউ হো যায়ে গা।'

বারো বাজলে আবার কারফিউ শুরু হবে? কে বললে? সে জন্যই লোক নেই নাকি! বারো বাজতে বেশি দেরিও তো নেই। তা হ'লে উপায়? উপায় অতি দ্রুত হেঁটে চলে যাওয়া। হয়তো বাসায় পৌঁছানো যেতেও পারে। কিন্তু ইনি?

'আপনি যাবেন না বাসায়?'

'নেহি। হাম গোলি করে গা, গোলি খায়ে গা।'

মানে? গুলি খাবেন? খাদ্য হিসেবে গুলিটা কেমন বস্তু সে কৌতূহল একজন শিল্পীর থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তা হ'লেও সহসা গুলি খেতে চাওয়াটা কি স্বাভাবিক কর্ম? আর গুলি যে করবেন সেটা কি দিয়ে?—

কয়েকটি জিজ্ঞাসা নিয়ে অধ্যাপক তাকালেন শিল্পীর দিকে। শিল্পীর হাতে আধখানা ভাঙা ইট ছিল।

শিল্পী আবদুল্লাহ মনসুর পঁচিশে মার্চের দিবাগত রাত্রে বাসায় একা ছিলেন। আজকাল মাঝে মাঝে এমন একা থাকতে তিনি ভালোবাসতেন। একা একা অনেক রাত জেগে বেশ কাজ করা যায়। শুধু কাজ? কলহ নেই? কলহ তাঁদের সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে ছিল বৈ কি। তবে ততটুকু ছিল যতটুকু সংসারের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ। এবং কলহ ক'রে স্ত্রী কোনোদিন বাপের বাড়ি যাননি। সেদিন গিয়েছিলেন ছোট বোনের বাড়ি। রাতে বোন আর তাকে ফিরতে দেয় নি। ব্যবসায়ী ভগ্নিপতি ব্যবসা উপলক্ষে গিয়েছিলেন চট্টগ্রাম। অতএব বোনের কাছে বোনকে থাকতে হয়েছিল। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এমনটি তো হ'তেই পারে। পূর্বেও হয়েছে। এক ছেলে এবং এক মেয়ে নিয়ে আমনের স্ত্রী বোনের কাছে থেকে গিয়েছিলেন । আমন বলেছিলেন—

'আমি কিন্তু ফিরে যাব। ছবিটা আজ শেষ করার কথা।'

একটা ছবি আজ তিনি শেষ করবেন। অতএব বাসায় ফিরছিলেন। এবং ফেরার সময় তাঁর ছেলে-মেয়েদের আদর করেছিলেন। ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে চুমু দিয়ে বলেছিলেন—

'মা মণি, এখন তবে যাই। কাল সকালে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। কেমন।'

'আব্বু, খালা?'

'হাঁ, ঠিক বলেছ তো আম্মু, এবার তোমার খালাকেই নিয়ে যেতে হবে। তোমার মা পুরোনো হয়ে গেছে।' অতঃপর আমন তাঁর ছোট শ্যালিকার পানে তাকিয়ে বলেছিলেন—

'দেখলি রোজি, আমার মেয়ে কিন্তু তার মাকে চায় না। তার জায়গায় চায় তোকে?'

এমনি খানিক হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন চিত্রশিল্পী আমন। কত রাত হবে তখন? না, খুব বেশি রাত হয় নি। কাজের তাড়া ছিল ব'লে নটার মধ্যেই তিনি বাসায় ফিরেছিলেন। এবং ফেরার সময় সহসা ঢাকা শহরকে বড়ো বেশি নির্জন মনে হয়েছিল সেদিন। মাত্র নটার মধ্যেই শহর এমন ঝিমিয়ে পড়ে নাকি? আগে কখনো এমন দেখেননি তো। শিল্পী আমনের বুকে নিঃঝুম ঢাকা শহরের একটি ছবি গাঁথা হয়ে গেল। এই নিঃঝুমতা কি ক্লান্তির? ঢাকা নগরী এমনি স্থবির হয়ে গেছে? নাকি অন্য কিছু। এ যদি ঝড়ের পূর্বাভাস হয়। ভাবতে ভাবতেই আমন ঘরে ফিরেছিলেন।

ছবি নিয়ে একান্তভাবে মগ্ন ছিলেন। বাইরের ছোট-খাট শব্দ সহসা পাবার কথা নয়। অতএব সন্দেহ নেই যে, শব্দটা বেশ বৃহৎ আকারের ছিল। একটা প্রবল শব্দে আমনের হাতের তুলি কেঁপে উঠল। পরে পরেই আর একটা শব্দ, তার সঙ্গেই আর একটা—এমনি চলতেই থাকল। প্রচণ্ড শব্দের আর গর্জনের বিরাম নেই। আর শব্দ কি এক রকমের? শব্দের যে এতো বৈচিত্র্য থাকে তা

কি আমন কখনো জানতেন। শব্দকে তুলি দিয়ে আঁকা যায় না?—চিত্রশিল্পীর মনে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন সৃষ্টি হ'ল । তিনি বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। এ কি! আগুন যে। সারা ঢাকা শহরই জ্বলছে নাকি? চারপাশে আগুন, ধোঁয়া আর গন্ধ। বারুদের গন্ধ। কী শুরু হ'ল ঢাকা শহরে? যুদ্ধ? যুদ্ধ কেমন করে হয় আমনের জানা নেই। রণাঙ্গনের দৃশ্য তিনি দেখেননি। ধোঁয়া, আগুন, বারুদের গন্ধ, বিচিত্র বিকট শব্দ সবটা মিলিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এরি নাম যুদ্ধ? কিন্তু কার সঙ্গে যুদ্ধ? কারা যুদ্ধ করছে? আমন কিছুই ভাবতে পারলেন না। ভাবনারা ভয়ে মূক হয়ে গেছে। তাকিয়ে বুঝলেন, আগুনের শিখাটা নীলক্ষেতের দিকেই বেশি। সারা নীলক্ষেত জুড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হল, কলাভবন ও শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা। ওই সবই ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে নাকি! প্রচণ্ড শব্দগুলিও বেশির ভাগ আসছে ঐ দিক থেকেই। তা হ'লে কি ছাত্রদের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ বেধে গেছে? তা কি ক'রে হবে। অবশ্য কয়েক দিন থেকেই শহরে সংগ্রামের কথা চলছিল—আমাদের সংগ্রাম, চলবেই চলবে—বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে দিয়ে মিছিল চলছিল শহরে। কিন্তু সবাই তারা ছাত্র তা তো নয়। সব স্তরের মানুষই তাদের মনের অনুভূতিকে ব্যক্ত করতে চাইছিল ঐ সব মিছিলে শ্লোগান দিয়ে। কিন্তু সত্যিই তারা কি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল? কৈ, তিনি তো জানতেন না। তবে তিনি না জানলেই তা মিথ্যা হবে? সত্য হওয়াই তো ভালো। আহা, কথাটা সত্য হোক। বাঙালির গোপন প্রস্তুতি সত্য হোক, তার অস্ত্র ধারণ সত্য হোক। বীর বিক্রমে বাঙালি যুদ্ধ করছে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সাথে-কল্পনাটা শিল্পী আমনের মধ্যে খুব উজ্জ্বল সুখের অনুভূতি এনে দিল। বাঙালি গোপনে এত অস্ত্র জমিয়েছিল? এতো অস্ত্রের ব্যবহার শিখেছিল? নিশ্চয়ই নীলক্ষেত এলাকায় ছাত্রদের সঙ্গে পাকিস্তানি সৈন্যদের যুদ্ধ চলছে। নাকি পাকিস্তানিরাই এক তরফা ছুঁড়ছে এতো গুলি-গোলা। হাঁ পাকিস্তানিরা তা পারে। সেরেফ না-কে হাঁ করতে পাকিস্তানের জুড়ি মেলা ভার। অকারণেই অতিরিক্ত পরিমাণে গুলি-গোলা ছুঁড়ে তারা প্রমাণ করবে—ছাত্রদের সাথে লড়াই হয়েছে আমাদের এবং ছাত্র-শিক্ষক যা আমরা মেরেছি তা ঐ লড়াইয়ের মধ্যে। হায় হায়, কী ধূর্ত ওই হারামজাদা! আমাদের নিরস্ত্র ছাত্র-শিক্ষকদের ওরা মারবে, তারপর বলবে—ওরা মরেছে আমাদের সাথে লড়াই করতে এসে। ওগো আল্লাহ্ তবে সেইটেই সত্য হোক। আমার ছাত্রবন্ধুরা লড়াই ক'রে মেরে তারপর যেন মরে। আমাদের অধ্যাপকরা এক-একটি দুর্জয় সেনাপতি হ'তে পারেন যেন। শিল্পী আমনের সারা বুক ভ'রে প্রার্থনা উচ্চারিত হ'ল। সব কথার শেষ কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

উহ্ কী প্রচণ্ড বুক-কাঁপানো গোলার আওয়াজ। এক মুহূর্তও যদি গুলি গোলার বিরাম থাকে। শ্রাবণের বৃষ্টিধারাও তবু মাঝে মাঝে মন্থর হয়ে আসে,

কিন্তু গোলাবৃষ্টির যে ক্ষান্তি নেই। হায় হায়, সব ধ্বংস হয়ে গেল।

কিন্তু এতো ধ্বংসের পর স্বাধীনতা যদি আসে। অবশ্যই যেন আসে। আমাদের ছেলেমেয়েরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হবে। বিশ্বের সর্বত্র বুক ফুলিয়ে বলবে, আমরা জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশের মানুষ। আমরা বাঙালি। আমনের বুক ভ'রে ফুটল একটি কথার সূর্যমুখী—আমরা বাঙালি। স্বাধীনতা-সূর্যের দিকে উন্মুখ একটি ফুলের নাম আমরা বাঙালি। আমন অস্থিরভাবে পায়চারী শুরু করলেন তার ঘরের মেঝেয়। চীৎকার ক'রে গেয়ে উঠলেন—মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে/আমরা বাঙালি বাস করি সেই তীর্থ বরদ বঙ্গে/বাম হাতে যার কমলার ফুল ডাহিনে মধুর মালা----। না না না। এ কবিতা পড়ার অধিকার আমার নেই। তোমার বাম হাত ও ডান হাত আজ একই অঙ্গে তো নেই মা। তোমার অধম সন্তানেরা তাকে কেটে দু'টুক্‌রো করেছে মা গো, এ পাপ ক্ষমা কর।

অস্থিরতায় অনুশোচনায় বিনিদ্র রজনী পোহাল। শুক্রবারও সারাদিন অবিশ্রান্তভাবে চারপাশ জুড়ে গোলা-গুলির আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। আমনের বাসা একটা কানাগলির মধ্যে দু'তালায়। সেখান থেকে বড়ো সদর রাস্তাটা দেখা যায় না। অতএব রাস্তায় বেরুনো যায় কিনা বুঝা গেল না। কিন্তু সকাল হ'তেই রাস্তায় বের হওয়ার জন্য আমন ছটফট করতে লাগলেন। কোন মতেই বের হওয়া যায় না? ওরা দুটি মাত্র স্ত্রীলোক একা বাড়িতে ভয় পাচ্ছেন না? মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন, নানা আশঙ্কা। গুলির শব্দে মা মণি হয়ত ভয় পাচ্ছে, এবং কাঁদছে। সৈনিকরা আবার বাড়ি ঢুকবে না তো! নাহ্ ঐ আশঙ্কার কোনো মানে হয় না। কৈ, ভদ্রলোকের বাড়ি ঢুকে ওরা অত্যাচার করেছে, এমন তো কখনো শোনা যায়নি। তা ছাড়া, রোজির সেই ভাগনেটিও হয়ত বাসায় ফিরে থাকবে! আওয়ামী লিগের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে রাতে পাড়া পাহারা দিতে যায়, ফেরে একেবারে শেষ রাতে। আজ নিশ্চয়ই আগেই ফিরে থাকবে। কিন্তু না ফিরে থাকে যদি। ওরা দু'বোন ভয়েই মারা পড়বে হয়তো। তিনি যদি এখন কাছে থাকতেন! কিন্তু কি ভাবে থাকবেন? পথে বেরুনো যায়?

বেলা দশটার দিকে আমন জানলেন পথে বেরুনো যাবে না। রেডিওতে সামরিক কর্তৃপক্ষের কয়েকটি আদেশ শুনলেন। জানলেন, সারা শহরে এখন কারফিউ। এখন পথে বেরুলেই সৈন্যরা গুলি করবে। গুলি তো বেরাদরগণ সারা রাতই করেছ, কিন্তু কারফিউয়ের কথা বলছ এখন? এই বেলা দশটায়? কৈ সারারাত একবারও শোনা যায় নি যে, কারফিউ দেওয়া হয়েছে। কে জানে হয়ত রাত দুটোর সময় রেডিওতে কারফিউয়ের কথা প্রচারিত হয়েছিল। রাত দুটোর সময় কেউ রেডিও খোলে না। তাতে কি। আইন তো বাঁচানো গেল। বাঙালিকেও বুদ্ধু বানানো গেল।

বাঙালিকে বুদ্ধু বানিয়ে ইয়াহিয়া কাল রাতে ফিরে গেছে। ইয়াহিয়া

এসেছিল আলোচনা করতে। কিসের আলোচনা? কেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের, ক্ষমতার রুটি নিয়ে তোমরা কাড়াকাড়ি করছিলে না? তোমরা মানে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান। অতএব মাঝখানে কোনো বাঁদরকে আসতেই হয়। এবং বাঁদরের স্বভাব অনুসারে ক্ষমতার রুটি নিজের গালেই পুরতে হয়। ইয়াহিয়া কি অযৌক্তিক কিছু করেছে?

কার সাধ্যি, সে কথা বলুক দেখি। সামরিক আইনে চৌদ্দ বছর জেল-মিনিমাম্ পানিশ্‌মেন্ট লঘু শাস্তি। কি কি অপরাধে এই লঘুশাস্তি দেওয়া হবে তার বিবরণ এখন রেডিওতে প্রচারিত হচ্ছে। তোমরা শোন এবং পালন কর। কথা বল না। না, কারো কোন কথা বলার অধিকার নেই। রাজনীতিবিদ, অধ্যাপক, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী—কেউ না। তোমরা সব বিলকুল বুদ্ধু আছ। এবং বে-আদব। প্রেসিডেন্ট এসে প্রায় দু সপ্তাহ থেকে গেলেন ঢাকায়। বে-আদবীর চূড়ান্ত করেছে তখন। মনে নেই? প্রেসিডেন্ট আসল শহরে। আর সেই শহরে তোমরা মিছিল বের করেছ।

মিছিল কি অপরাধ? মিছিল মানে জানো? নিজেদের কোনো দাবীর কথা জানাতেই মানুষ মিছিল করে। দেশের মানুষ তাদের প্রেসিডেন্টের কাছে নিজেদের দাবীর কথা জানাবে না?

দাবী? কিসের দাবী? হুজুরের কাছে নিবেদন পর্যন্ত চলতে পারে। সে জন্য দরখাস্ত পেশ কর। মিছিল ক'রে শ্লোগান দিয়ে বেড়ানো কেন?

কারণ ঐটেই আধুনিক গণতন্ত্রসম্মত পন্থা।

তোমাদের ঐ সব কেতাবী-গণতন্ত্র মাগরেবী মুল্লুকে চলতে পারে। আমাদের পাক-মুল্লুকে তা অচল।

তোমাদের মধ্য যুগীয় আবেদন-নিবেদন আমাদের বাংলাদেশে অচল। আমরা কোনো হুজুরে বিশ্বাস করিনে। এবং সেই কারণেই দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সঙ্গে আমাদের মিল হবে না। তোমরা তোমরা, আমরা আমরা।

নেহি। মুসলিম সব ভাই ভাই। কখনো তোমাদেরকে আমরা পৃথক হতে দিতে পারিনে। আমরা মুসলমান।

আমরা বাঙালি, তোমরা পাঞ্জাবী-পাঠান-সিন্ধী-বালুচ। তোমরা আমরা পৃথক হয়েই আছি।

বটে? তা হ'লে তোমাদের জন্য এই রইল কামান-মেশিনগান-রাইফেল।

শুক্রবার সারাদিন চলল কামান-মেশিনগান-রাইফেলের বিচিত্র কারবার। আবার রাত এল। সেই রাতেও মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল গুলির আওয়াজ। আমন সারা রাত একা ঘরে তাঁর ছেলে-মেয়ের জন্য কেবলি ছটফট করলেন। পরদিন শনিবার অর্থাৎ গতকাল বেলা দশটার দিকে কারফিউ ওঠে গেলে পথে লোক বেরুল। আমনও বের হলেন। সেই গতকালের বেলা দশটা থেকে আজ রবিবারের বেলা প্রায় বারটা-প্রায় ছাব্বিশ ঘন্টা। এই ছাব্বিশ

ঘন্টার হিসাব আর আমন জানেন না। সেই যে বাসা থেকে পথে বেরিয়েছেন আর ঘরে ঢুকেন নি। কেন, রোজিদের ঘরে? রোজিদের ঘরে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যারা ছিলেন সেখানে তিনি যান নি? হাঁ গিয়েছিলেন। কিন্তু। ঘরে নয়। তাকে ঘর বলে না। অবাধে পথের কুকুরটাও তখন সেখানে প্রবেশ করতে পারে। যেখানে কুকুর-শেয়ালেরও অবাধ যাতায়াত থাকে তাকে ঘর বলে নাকি। রোজিদের ঘর খোলাই প'ড়ে ছিল। খোলা শুধু নয়, ভাঙা দরজার কপাট ভেঙে দুর্বৃত্তরা ঢুকেছিল। তারপর? আমন গিয়ে দেখলেন, কেউ নেই। ডাকলেন—রোজি। সাড়া নেই। স্ত্রীকে ডাকলেন পলি। পলিও নেই নাকি। ছেলে-মেয়েরা? শোবার ঘরে গিয়ে দেখলেন, মেঝের উপর দুটি ভাইবোন পড়ে আছে পাশাপাশি। রক্তে ভিজে গেছে অনেকখানি মেঝে। রবিবার সকালে দেখা গেল দুটি ছেলে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে মেঝের উপর প'ড়ে আছেন চিত্রশিল্পী আমন। সারাক্ষণই এমনি প'ড়ে ছিলেন? না। যতক্ষণ ক্ষমতা ছিল বিলাপ করেছেন। চীৎকার করে কেঁদেছেন। এমন কচি শিশুদের যারা মারতে পারে তাদের জন্য আল্লাহর অভিশাপ প্রার্থনা করেছেন। তাদের উপর গজব নাজিল কর খোদা, এখনি তোমার গজব নাজিল কর। স্ত্রীর কথা মনে হয়েছে—চীৎকার ক'রে কতবার ডেকেছেন স্ত্রীকে। রোজিকে ডেকেছেন। যেন ডাকলেই এখনি ওরা এসে দেখা দেবে। রোজির কলেজে পড়া ভাগনেটিকেও পাওয়া গেল। বাঁচবার জন্য ঘরে ফিরেছিল বারোটার দিকে। এবং তার ফলে বাঁচতে পেরেছিল মাত্র ঘন্টা পাচেক। ভোর পাঁচটার দিকে পাক-হানাদার বাহিনীর গুলিতে সে নিহত হয়। পাশের ঘরে তার লাশ পাওয়া গেল কিন্তু পলি ও রোজি কোথাও নেই। আর নেই সেলাইয়ের কল, ট্রানজিসটার, টি. ভি. সেট এবং হয়ত আরো কিছু যা আমন জানেন না। মূল্যবান গয়না-পত্র টাকা-কড়ি কোথায় থাকত সেটা, শ্যালিকার বাড়ি হ'লেও আমনের জানার কথা নয়। তিনি কেবল দেখলেন আইরন-সেফ খোলা। ভেতরটা শূন্য।

আমনের পাঁচ বছরের ছেলের বুকে গুলির চিহ্ন দুটি, তিন বছরের মেয়ের বুকে একটি এবং রোজির ভাগনেটির গায়ে গুলির দাগ ছিল তিনটি—দুটি বুকে একটি পাঁজরে। যুবক ও শিশুদের মেরে যুবতীদের ধ'রে নিয়ে গেছে। আর লুটপাট ক'রে নিয়ে গেছে যা নেওয়া যায়। কাঠের আসবাবপত্র নেওয়া যায় না। সেইগুলি পড়ে আছে।

সর্বত্রই হানাদারদের কার্যক্রমের মধ্যে এই একটা মিল ছিল ভারি সুন্দর। যা পার লুটে পুটে নাও, যুবতীদের হরণ কর, অন্যদের হত্যা কর। না, সব ঘরেই তারা ঢোকে নি। কিন্তু যেখানেই ঢুকেছে এই কার্যধারায় কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। ব্যতিক্রম শুধু ঘটেছিল সুদীপ্তর ঘরে। সেখানে হরণের জন্য নারী পায় নি, লুটপাটের যোগ্য কোনো বস্তুও পায় নি। কেননা যেদিকে তারা তাকিয়েছিল শুধু দেখেছিল বই। আর বই। ধুত্তোর বই। বই নিয়ে হবেটা কি শুনি।

কাগজের বুকে হিবিজিবি আঁক কাটা যতো সব আবর্জনা। ওই আবর্জনায় হাত দিয়ে পাক-সৈন্যরা না-পাক হ'তে চায় নি। হাত যেখানে-সেখানেই দেওয়া যায় না কি। হাত দেওয়া যায় রোটি ও রাইফেলে। আর আওরাতের গায়ে। দুনিয়ার সেরা চিজ আওরাত, আওর রাইফেল। রোটি খেয়ে গায়ের তাকাত বাড়াও, রাইফেল ধরে প্রতিপক্ষকে খতম কর, তারপর আওরাত নিয়ে ফূর্তি কর। ব্যাহ্, এহি জিন্দেগী হ্যায়। এই তো জীবন। জীবন সম্পর্কে এই ধারণায় আমনের আস্থা নেই, কোনো বাঙালিরই নেই। আমন যতক্ষণ পারলেন প্রাণপণে প্রচণ্ড আর্ত-হাহাকারকে বহন করলেন। বিলাপ ক'রে ক'রে বেদনাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন। ম'রে যাওয়া পুত্রকন্যাদের বুকে জড়িয়ে কাঁদলেন। অবশেষে এক সময় সংজ্ঞা হারিয়ে সন্তানদের বুকে জড়িয়ে প'ড়ে রইলেন।

রবিবার সকালে গোপনে কয়েকজন সাংবাদিক সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে শহরের অবস্থা দেখতে বেরিয়েছিলেন। তারাই শিল্পী আমনকে উদ্ধার করেন। অতঃপর হাসপাতাল কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সংজ্ঞা ফিরেছে, কিন্তু মনের স্বাভাবিকতা ফেরেনি। এক সময় কখন তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেছেন কেউ তা টের পায় নি। এখন তিনি পথে পথে মাঝে মাঝেই চীৎকর ক'রে উঠছেন—হাম গোলি করে গা, গোলি খায়ে গা।

আমার ছেলে-মেয়েদের গুলি করেছ, আমিও তোমাদের গুলি করব, আমার ছেলে মেয়েরা গুলি খেয়েছে, আমিও গুলি খাব, আমাকেও তোমরা গুলি কর, এ সব কথা কি পাগলের কথা! তবু এখন শিল্পী আমনকে সকলেই পাগল ঠাওরাচ্ছে, এবং এড়িয়ে চলছে।

অবশ্যই আমনের সব ইতিবৃত্ত সুদীপ্ত জানতেন না। কেবল তাঁর মনে হচ্ছিল, সত্যই একটা সাংঘাতিক কিছু ভদ্রলোকের জীবনে ঘটেছে যে কারণে তিনি এমন ভারসাম্য হারিয়েছেন আজ। কী সেটা? যাই হোক, সে নিয়ে কিছু ভাববার সময় এখন নেই। এখন কিছু করতে হয়। কিন্তু কী করা যায়! সঙ্গে ক'রে বাসায় নিয়ে যাওয়া যায়। বাসায়? তিনি এখন যেখানে আছেন সেখানে? সেখানে পথের পাগল নিয়ে উঠাবেন? কেন উঠাবেন না। আমনের মতো চিত্রশিল্পী কি কোনো দেশে দলে দলে গজায়? তা ছাড়াও তিনি একজন মানুষ তো। বিপদের সময় মানুষের জন্য তো মানুষকেই এগোতে হয়। সুদীপ্ত আমনের একখানি হাত ধরলেন—

'আপনি চলুন আমার সাথে। আমি আপনাকে দেব গুলি খেতে।'

'তোম উল্লু হ্যায়। তোমহারা সাথ মে গুলি নেহি হ্যায়।'

গুলি যাদের সঙ্গে থাকে শহরে তখন তাদের অভাব ছিল না। চারদিকে নল উচিয়ে কত গাড়িই তো যাচ্ছে। ঠিক সেই সময়ই একটা যাচ্ছিল পাশের পথ দিয়ে। সহসা আমন সুদীপ্তকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং দুহাত তুলে চীৎকার ক'রে উঠলেন—

'হাম গোলি করে গা। গোলি খায়ে গা।'

ফুটপাতের পাশে লোহার রেলিঙের কাছে দৌড়ে গিয়ে আমন তার প্রাণপণ শক্তিতে হাতের আধখানা ইট ছুঁড়ে মারতে চাইলেন। কিন্তু তার আগেই সৈনিকদের গুলি খেয়ে তিনি লুটিয়ে পড়লেন রেলিঙের পাশে। তাঁর হাতের আধখানা ইট ছিটকে পড়ল তারই নাকের কাছে।

সত্য সত্যই ওরা গুলি করল আমনকে? বিকৃত মস্তিষ্ক আমনকে? আমনকে অসুস্থ পাগল ব'লে চিনতে কি ভুল হবার কথা? পাকিস্তানের বীর সৈনিক অতসব বোঝে না। অতসব বুঝতে গেলে ভালো সৈনিক হওয়া যায় না। সৈনিকের কাজ কোনো কিছু বিচার করা নয়, কেবলি গুলি চালানো। হাঁ, পাকিস্তানিরা গুলি চালাতে জানে। রাইফেল-মেশিনগানের লোহার গুলি, রেডিও-টিভিতে গাঁজা-গুলি। গোটা পাকিস্তানটাই একটা গাঁজা-গুলি—বলাকা বিল্ডিংয়ের বারান্দায় প'ড়ে থেকেই কথাটা মনে হয়েছিল সুদীপ্তর। ভাগ্যিস আমন তাকে ধাক্কাটা বেশ জোরেই দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ধূলিশায়ী হয়েছিলেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় পাকিস্তানিরা তাঁকে দেখতে পায় নি। কিংবা দেখে থাকলেও মৃত ভেবেছিল। সুদীপ্ত কিন্তু সবই দেখলেন। চিত্রশিল্পী আমনের দেহ লুটিয়ে প'ড়ে আছে—রক্তের ধারা গড়িয়ে যাচ্ছে-পথের উপর।

ওরা মেরে চ'লে গেছে। সুদীপ্ত উঠে দাঁড়িয়েছেন। আশ্চর্য। একটুও ভয় পাচ্ছেন না তিনি। একদৃষ্টিতে দেখছেন নিস্পন্দ একটা মানবদেহকে। এই দেহ আশ্রয় ক'রে যিনি ছিলেন তিনিই সেই প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী আমন? এই তো ছিলেন। কোথায় গেলেন তবে? তিনি গেছেন সেই জনতার পথে, যারা প্রতিজ্ঞা নিচ্ছে—আমরা এর প্রতিশোধ নেব। সকাল বেলার হাসিম শেখের কথা মনে পড়ল—খোদার কসম, আমার মায়ের কসম, আমাদের রক্তের কসম আমরা এর শোধ নেবই নেব। প্রতিশোধ গ্রহণের দুর্বার শপথ ছড়িয়ে গেল চারপাশের বাতাসে, পথের ধূলোয়, আশে-পাশের প্রতিটি দেওয়ালে, প্রতিটি বাতায়নে, এমন কি আমনের হাতের সেই আধখানা ইটেও। সুদীপ্তর চোখের সামনে সেই ইটের টুকরো হয়ে উঠল আস্ত কামানের গোলা। সে এখন ওঁৎ পেতে শত্রুর মুখ খুঁজছে। যেন বলছে মাগো সন্তানের রক্তে তোমার বুক ভেসেছে, শত্রুর রক্তে তোমার পা ধোয়াব। কথাগুলি আমনের। শিল্পী আমনের একটি ছবির নীচে এই শপথ বাক্য খোদিত ছিল—মা গো, সন্তানের রক্তে তোমার বুক ভেসেছে, শত্রুর রক্তে তোমার পা ধোয়াব।------

না, ঐ পানে আর চেয়ে থাকা যায় না। এক সময় সুদীপ্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মানুষের শব কত আর দেখা যায়। গত বিশ-পঁচিশ দিন ধরে কত রক্ত, কত লাশ তিনি দেখেছেন, কিন্তু কান্না শোনা যায়নি। এই তো এই মার্চেরই মাঝামাঝিতে সেই দিনগুলি! সেদিন গত রাতের কয়েকটি শব এনে

ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণের বটতলায় জড়ো করেছিল। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সেই শব ঘিরে শ্লোগান দিচ্ছিল—"বাঙালি ভাই, ভাই—রে-বাঙালি ভাইয়ের রক্ত দেখ।" সকলে সেই রক্ত দেখেছিলেন। এ তো লাল পলাশের রঙ নয়। রক্তের রঙ্ এতো কালোও হয়? যেন কয়েকটি কৃষ্ণচূড়া আক্ষরিক অর্থেই কৃষ্ণ হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হয়ে তাকে ন্যায় সমরে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই কৃষ্ণ শহীদ ভাইয়েরা তেমনি ন্যায়ের সংগ্রামে গত রাতে দ্বারে দ্বারে ডাক দিয়েছিল-জয় বাংলা। বাংলাকে জয়যুক্ত করার সংগ্রামে তোমরা বীর বাঙালি বেরিয়ে এস। মানি না মানি না, কারফিউ মানি না।

গতরাতে শহরে কারফিউ দেওয়া হ'লে ওরা তা মানে নি। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সরকার বাংলাদেশের দাবি আদায়ের সংগ্রামকে টুটি টিপে মারার জন্য দিয়েছিল কারফিউ। সে কারফিউ নীরবে মেনে নেওয়ার মধ্যে ছিল স্বদেশের অপমান। সেই অপমান ঘোচাতে ওরা বেরিয়েছিল পথে। শ্লোগান দিয়েছিল----জয় বাংলা। "জয় বাংলা" শ্লোগানে যেন বিছুতির জ্বালা। ওদের সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়! কভি নেহি বরদাস্ত করেগা। যে মুখের কথায় এতো জ্বালা গুলি মার সেই মুখে—একটা বর্বর ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ইয়াহিয়ার সৈনিক নামধারী দস্যুরা। 'বাংলা' শব্দটা উচ্চারণের সময় মুখ প্রসারিত হ'লে ঠিক সেই যথালগ্নে ওদের মুখ লক্ষ্য ক'রে গুলি করে আর তার ফলে, দেখ, মুখের তালু ভেদ করে সারা মুখ খানা কী বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু মুখের সেই বিকৃতি যেন, সুদীপ্তর মনে হয়েছিল, সারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক বিরাট ব্যঙ্গ। ওরা যেন যাবার আগে একটা মুখ ভেঙচি দিয়ে গেছে ইয়াহিয়াদের পাকিস্তানকে। না, ওদের সঙ্গে আর নয়। সেই লাশগুলি সেদিন যাঁরাই দেখতে এসেছিলেন তাঁদেরই মনে জন্ম নিয়েছিল কথাগুলি–না, ওদের সঙ্গে আর নয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের সেই প্রাচীন বটবৃক্ষ তার সাক্ষী। ওগো প্রাচীন বটবৃক্ষ, সাক্ষী থেকো তুমি—ওদের সঙ্গে আর নয়। ছাত্রদের প্রতিটি আন্দোলনের সাক্ষী সেই প্রাচীন বটবৃক্ষ। উনসত্তুরের আয়ুব-বিতাড়নের আন্দোলনে এই বটতলা থেকেই ছাত্রেরা যুদ্ধ করেছিল মোনায়েম খানের পুলিশ বাহিনীর সাথে। না, পুলিশেরা রাইফেল মেশিনগান নিয়ে আসেনি। এসেছিল লাঠি ও টিয়ার গ্যাস নিয়ে। লাঠির মোকাবিলা করতে ছেলেরা সক্ষম ছিল, কিন্তু টিয়ার গ্যাস? সুদীপ্ত নিজে না দেখলে তা কি বিশ্বাস করতেন? টিয়ার গ্যাসের শেলগুলো এসে পড়তেই ভেজা চট হাতে জড়িয়ে সেগুলো ধ'রে ফেলছিল তারা, এবং ছুঁড়ে মারছিল রাস্তার পুলিশের দিকে তখন পুলিশেরাই তার ফলে টিয়ার গ্যাসের জ্বালায় অস্থির। সে এক আশ্চর্য যুদ্ধ! তার পরেই তো ঘ'টে গেল পর পর দুটি মৃত্যু—ঢাকায় মারা পড়লেন ছাত্র নেতা আসাদ, রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক

শামসুজ্জোহা। শামসুজ্জোহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আন্দোলন এমনিই ভয়াবহরূপে ব্যাপকতা পেল যে আয়ুবশাহী আর টিকল না। তখন মুখোশ প'রে এল ইয়াহিয়া। মুখোশধারী ইয়াহিয়া প্রথম দিকে অভিনয় ভালোই করেছিল। ধূলো দিতে পেরেছিল বাঙালির চোখে। কিন্তু সব মুখোশ তার খুলে গেল গত পয়লা মার্চ তারিখে। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে বাঙালি যে এমন একটা কাণ্ড করবে তা কেউ ভেবেছিল নাকি! আয়ুব খান উপদেশ ইয়াহিয়াকে ঠিকই দিয়েছিলেন—দেখ হে, তুমি সোলজার মানুষ। ঐ সব ডেমোক্র্যাসি তুমি হজম করতে পারবে না। সকলের পেটেই কি ঘি হজম হয়?

হুজুর, সে কথা আমিও জানি। এ কেবল একটা ধাপ্পা। পরিষদে ইনশাআল্লাহ্ দেখবেন কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। তারা তখন ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে কামড়াকামড়ি শুরু করবে। আর সেই সুযোগে---

কিন্তু সুযোগ পেলে তো হে। ধর, বঙ্গাল মুল্লুকের সকলেই একটা মাত্র দলকেই ভোট দিল। তখন? হুজুরের কথায় ইয়াহিয়া তখন মুখ টিপে হেসেছিল। হুজুর এই জন্যই আপনি তখ্ত হারালেন। বাঙালি চরিত্রকে আপনি চিনেন না। ঝগড়ার ভয়ে যাদের দুজনকে একসাথে কবর পর্যন্ত দেওয়া যায় না তারাই মিলে মিশে একটা মাত্র দলকে ভোট দিয়ে জয়ী করাবে। এও বিশ্বাস করতে বলেন হুজুর! আপনি যে হাসালেন দেখি।

কিন্তু সত্যকার হাসবার দিন ইয়াহিয়া পায় নি। নির্বাচনের ফল বেরুলে সব হাসি তার মিলিয়ে গেল। এবার? হায় হায় দালালি করতে পারে এমন যে নামগুলি নোটবুকে টোকা ছিল তারা সব যে হেরে গেল। এখন যে আর চিন্তা ক'রেও কোনো কুল মেলে না। ধুত্তোর চিন্তা। শারাব লে আও। মদের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল ইয়াহিয়া এবং কিছু চিন্তা না ক'রে হুকুমজারি করল—জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ। কিন্তু কেন? এবং কতো দিনের জন্য? এ সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া হ'ল গুলিতে। ইয়াহিয়া তার দেশ শাসনের ব্যাপারটাকে সরল ও সনাতন একটি সূত্রের উপর স্থাপন করল।—তেরে মেরে ডাণ্ডা, করে দেব ঠাণ্ডা। বেশ, তবে তাই হোক। ডাণ্ডার জোরই পরীক্ষা হয়ে যাক। বাঙালির কাঁদবার দিন আর নেই। এবার অস্ত্রের উত্তর অস্ত্রের ভাষায়। বাঙালির কান্নার দিন শেষ হয়েছে। এই যে সারা মার্চ মাস ধ'রেই বাংলাদেশে ইতস্তত নরহত্যা চলল এ জন্য ব'সে ব'সে কাঁদলে কি বাঙালি বাঁচত। আশ্চর্য, ওরা যত মেরেছে ততই দৃঢ় শপথে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙালি। পাল্টা মার দেবার শপথ নিয়েছে—দুর্জয় শপথ। কিন্তু গত পঁচিশের রাতের সেই মার? তার বিরুদ্ধেও দাঁড়াবার সাহস তার হবে? এক শো বার হবে। হ'তেই হবে। পাল্টা মার দিতে না পারলে বাঙালির দশা এখন কি হবে বলতে পার? দাস্যবৃত্তি আর গণিকাবৃত্তি। তার চেয়ে মরে যাওয়া

ভালো। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে!

সুদীপ্ত ভাগ্যবান বৈ কি। সুদীপ্তর নিজেরও ধারণা, খুব সহজে বোধ হয় মৃত্যুর মুখ তাঁকে দেখতে হবে না। তা হ'লে ঐ রাতেই সে কর্মটি সমাধা হতে পারত। হয় নি যে সেটা এখন কোনো সৈনিকের মূঢ়তা বা দুর্বলতা ব'লে তাঁর আর মনে হয় না। ওটা ভাগ্য। এই ভাগ্য প্রার্থনা করলেই মেলে এমন নয়। সে খামখেয়ালি, যার উপর ইচ্ছে প্রসন্ন হয়, তার অপ্রসন্নতাও কোন নিয়ম মেনে আসে না। কোন কারণ ছিল না, অথচ গাড়িটা ঠিক ঐ সময়ই ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আমনের মৃতদেহ যেন সুদীপ্তর বসন-প্রান্ত আঁকড়ে ধ'রে সুদীপ্তকে স্থবির ক'রে দিয়েছিল। ঐ অবস্থায় আর কিছুক্ষণ কাটলেই মৃত্যু অবধারিত ছিল। কিন্তু ভাগ্য একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন কারফিউ শুরু হ'তে মাত্র দশ মিনিট বাকী—অন্তত গাড়ির চালকটি তাই জানত। অতএব অতি দ্রুত সে বাসায় ফিরছিল। জনহীন পথে একটি মানুষও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলাকা বিল্ডিংয়ের পাশে তাই সুদীপ্ত খুব সহজেই তার চোখে পড়েছিলেন। এ কি! স্যার এখানে। নাজিম শুনেছিল, সুদীপ্ত স্যার মারা গেছেন। সুদীপ্তর ছাত্র নাজিম হুসেন চৌধুরী। বছর তিনেক আগে পাস ক'রে বেরিয়ে গেছে। এখন সাংবাদিকতা করে। গাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে নাজিম তার স্যারের কদমবুসি ক'রে প্রায় কেঁদেই ফেলল। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ব'লে উঠল—

'স্যার, আপনি!'

কিন্তু সুদীপ্ত কিছু বলার আগে চিত্রশিল্পী আমনের পানে চেয়ে নাজিম আকাশ থেকে পড়ল যেন—

'এ কি স্যার। আমনদা এখানে। আমরা তো আজ সকালেই এঁকে হাসপাতালে দিয়েছিলাম।'

স্যারের বৃত্তান্ত শুনল নাজিম। এবং নাজিমের কাছেই শিল্পী আব্দুল্লাহ্ মনসুরের আদ্যন্ত খবর পেয়েছিলেন অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহীন। গাড়িতে ছাত্রের সঙ্গে চলতে চলতে খবর পেয়েছিলেন, কিছু পেয়েছিলেন পরে—নাজিমের সঙ্গে পুনরায় দেখা হ'লে। আর পেয়েছিলেন তাঁর সহকর্মী মোসাদ্দেক হোসেন ইউসুফ সাহেবের খবর।

আজ সকালে সাংবাদিকদের যে ক্ষুদ্র দলটি শিল্পী আমনকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এই নাজিমও ছিল একজন। সকালে তাঁরা সংজ্ঞাহীন দেহ হাসপাতালে দিয়েছিলেন, এখন এই প্রাণহীন দেহ নিয়ে করবেন কী? কাল থেকে কতো শবই তো দেখছেন! মৃতদেহ সম্পর্কে মন এখন অদ্ভুত রকমের অসাড়। খালি দেখো, কারা বেঁচে রইল। স্যার বেঁচে আছেন। স্যারকে নিয়ে নাজিম তার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

আমনদা নাজিমের বহুকালের পরিচিত, এবং আত্মীয় না হয়েও আত্মীয়ের মতো আসা-যাওয়া ছিল তার আমনদার বাড়িতে। কিন্তু আমনদা এখানে

কোথায়!—গতকাল রোজিদের বাড়িতে আমনদাকে দেখে প্রথমে বিস্মিত হয়েছিল নাজিম। পরে তার গুলিবিদ্ধ পুত্রকন্যাদের দেখে, এবং কোথাও ভাবী সাহেবাকে না দেখে, ব্যাপারটা কিছু কিছু সে অনুমান করেছিল। হাসপাতালে আমনদাকে দিয়ে সে গিয়েছিল ভাবী সাহেবার খোঁজে তাঁদের বাড়িতে। এবং যথারীতি ভাবী সাহেবাকে কোথাও পাওয়া যায় নি। তবে কি সেই কানাঘুষোটা সত্য? সাংবাদিক মহলে সে কানাঘুষো শুনেছিল—শহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে সামরিক অফিসারদের জন্য একটি গণিকালয় স্থাপন করা হয়েছে। সংবাদটা যে সত্য তার প্রমাণ পরে নাজিম হাতে হাতেই পেয়েছিল। দিনের বেলা দাসীবৃত্তি এবং রাতে গণিকাবৃত্তি—এই দুই কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে শহরের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েকে। সেখানে তাদেরকে শাড়ি পরতে দেওয়া হয় না, কেবল সায়া প'রে থাকতে হয়। পাছে কেউ গলায় ফাঁস পরে আত্মহত্যা করে সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু সেই ব্যবস্থার মধ্যেও পলি ভাবী তাঁর মুক্তির পথ ক'রে নিয়েছিলেন। কলেজে পড়ার সময় এককালে নাটকে অভিনয় করেছিলেন তিনি। তখন কি তিনি জানতেন যে, সংসার জীবনেও এমনি অভিনয়ের প্রয়োজন কখনো হবে। হাঁ, পলির অভিনয় নিখুঁত হয়েছিল। একটি পাঞ্জাবী অফিসারের সাথে প্রেমের অভিনয় করেছিলেন তিনি। কেন? বাঁচবার জন্য কি? বাঁচার সাধ আর পলির ছিল না। তাঁর বুক থেকে তিন বছরের শিশু কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে চোখের সামনে পাষণ্ডরা যখন গুলি করে হত্যা করল সেই মুহূর্তেই পাষাণ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। পলির পাথর-কঠিন প্রাণে একটি দীপ্ত শপথের পাপড়ি বিকশিত হয়েছিল। তিনি প্রেমের অভিনয় করেছিলেন শুধু সেই প্রতিজ্ঞা পালনার্থে। বাঁচার চিন্তাটা তাঁর মনের ত্রিসীমানার মধ্যে কোথাও ছিল না। তাঁর মনে ছিল, অন্ততঃ একটি পাঞ্জাবী অফিসারকে মারতে হবে। অতঃপর সম্ভব হ'লে আরো কিছু। সেই দৃপ্ত ইচ্ছার তাড়না তাঁকে পথ দেখিয়েছিল। গায়ের জোরে না পারি ছলনার আশ্রয় নেব। ইয়াহিয়া নেয়নি ছলনার আশ্রয়। আপোস আলোচনার নাম ক'রে সামরিক প্রস্তুতির জন্য সময় সংগ্রহের নাম ছলনা নয়? পলিও ছলনা-জাল বিস্তার করেছিলেন।

বাঙালি-নিধন শুরু করার প্রস্তুতি-পর্বে পাঞ্জাবিরা তাদের স্ত্রীদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন নারীবর্জিত জীবনে পলির ফাঁদে সহজেই ধরা দিল সেই তরুণ পাঞ্জাবী অফিসারটি। পলিকে সে-ই উদ্ধার করে ক্যান্টনমেন্টের গণিকালয় থেকে, এবং শহরের মধ্যে একটি বাড়িতে এনে রাখে। কিন্তু এ কোন বাড়ি? এ বাড়ি তো পলির অপরিচিত নয়। এখানে সেই হালিমারা থাকত না? হালিমার স্বামী একজন খুবই স্বনামখ্যাত স্বদেশকর্মী, এবং ধনী। হালিমা পলির স্কুল জীবনের বান্ধবী। রূপ থাকার জন্য রুপেয়াওয়ালার ঘরে বিয়ে হয়েছিল। পলি কয়েকবারই এসেছেন তাঁর বান্ধবীর বাড়ি। হাঁ এই তো

সেই বাড়ি। কিন্তু হালিমারা কোথায়? সুন্দরী হালিমা যদি ওদের চোখে পড়ে থাকে! হায় সেই পাষণ্ডরা এমনি কতো সংসার ধ্বংস করেছে গো! বাংলাদেশের কিছু আর থাকল না।

আহা, ঘর-দোর ঠিক তেমনি সাজানো আছে। এইটে ওদের লাউঞ্জ ছিল না! আহা, এই তো সেই হালিমার খোকার দোলনাটা! তাঁরা বড়ো লোক না হ'লেও এমনি সুন্দর একটি দোলনা কিনে দিয়েছিলেন তাঁর মেয়ের জন্য। মেঝেতে এটা? একখণ্ড কাপড়। পলি তুলে দেখেন, ছোট বাচ্চাদের জাঙিয়া। নিশ্চয় হালিমার খোকার। আব্বুরে, তোকেও ওরা মেরেছে নাকি। জাঙিয়াটা বুকে চেপে ধ'রে পলি হু-হু ক'রে কেঁদে ওঠেন। ওরে আমার সোনামণিরা, মা হয়ে তোদের বাঁচাতে পারি নি। কিন্তু শোধ এর নেব, নেবই নেব।

ওরে হাড়-হাভাতে পাষণ্ডরা! বাংলার এমন কতো সাজানো সংসার তোরা নষ্ট করেছিস? বল কত? আহা কী সুন্দর সংসার ছিল হালিমার! সইয়ের সেই পবিত্র সংসারকে ওরা আজ পণ্যাঙ্গনাবৃত্তির ক্ষেত্র করতে চায়! তার সাজা তোদের পেতে হবে। পড়েছিস পলির হাতে। প্রথম রাতেই পলি হত্যা করেন সেই পাঞ্জাবি অফিসারটিকে। মদ খেয়ে অফিসারটি যখন নিস্তেজ হয়ে বিছানায় প'ড়েছিল ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে হেঁসেল ঘর থেকে বঁটি এনে প্রাণপণ শক্তিতে পাঞ্জাবির গলায় চেপে ধরেন পলি। হারামখোর মিনসের গায়ে এতো রক্তও ছিল। বিছানা ভিজে রক্তের ধারা গড়িয়ে মেঝেয় পড়েছিল। আশ্চর্য, পলি ভাবী একটুও অপ্রকৃতিস্থ হন নি।

কী বিপর্যয় ঘ'টে গেছে পলির উপর দিয়ে। তাতেই তো পাগল হয়ে যাবার কথা। ছোট বোন রোজি পাগল হয়ে গেছে, তাঁকে ওরা বের ক'রে দিয়েছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে। অতঃপর সে যে কোথায় গেছে কেউ জানে না। রোজির মতো অমনি পাগল হ'লে ওই হারামির পোলাগুলোর তাতে কী আসে যায়। আবার কোনো ভদ্রঘরের মেয়ে ধ'রে এনে শূন্যস্থান পূর্ণ করবে। ওতে প্রতিশোধ নেওয়া হবে কি ক'রে? মরেছিই যখন, তখন যে ক'রে হোক একজনকে মারবই।—পলি ভাবী তাঁর এই প্রতিজ্ঞা-পালনে ব্যর্থ হন নি। এবং কেবল প্রতিজ্ঞা পালন ক'রেই খুশি হন নি। পাঞ্জাবি অফিসারটিকে হত্যার পর বেরিয়ে একটা রিক্সা ক'রে সোজা এসেছিলেন নাজিম হুসেনের কাছে।

'ভাই, একটা মাইন জোগাড় করে দিতে পার।'

হয়ত নাজিম হুসেন চেষ্টা করলে তা পারে। কিন্তু ঐটেই এখন বলার কথা নাকি! কয়দিন অদৃশ্য হয়ে থাকার পর সহসা উদিত হয়ে এখন তিনি বলছেন, আমাকে একটা মাইন জোগাড় করে দিতে পার। তার আগে তো শুধাবার ও শুধিয়ে জেনে নেবার জন্য এক ঝুড়ি প্রশ্ন ও কৌতূহল মনে জমা হয়ে আছে। হাঁ, সব প্রশ্নের উত্তর পলি ভাবী দিয়েছিলেন। আদ্যন্ত ঘটনা সব শোনার পর নাজিম হুসেন কী বলবেন ভেবে পান নি। শুধাতে ইচ্ছে হয়েছিল—কই,

আমনদার কথা কিছু তো শুধালেন না ভাবী? না না, ঐ কথা না তোলাই ভালো। প্রচ্ছন্ন ক্ষত-মুখে খোঁচা মারা হবে না সেটা। অতএব সে কথা সে আর তুলল না। তাদের বাড়ি তখন খালি। মেয়েদের সব গ্রামাঞ্চলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা কয়েকজন পুরুষ কেবল থাকে সেখানে। স্বাভাবিক অবস্থায় পলি সেখানে থাকতে পারতেন? এখন কিন্তু কোনো অসুবিধা হ'ল না। স্বচ্ছন্দ্যে সেখানেই কয়েক দিন কাটিয়ে পলি ভাবী একদিন অদৃশ্য হলেন। কেবলি সেই বাড়িটা থেকেই নয়। একেবারে সংসার থেকেই। হাঁ অদৃশ্য বৈ কি। সহসা একটা মিলিটারি-ভরতি ট্রাকের নীচে পলি ভাবী অদৃশ্যই তো হয়েছিলেন। নাজিম হুসেনের সংগ্রহ করে-দেওয়া মাইন-বুকে বেঁধে সেই ট্রাকের সামনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন পলি ভাবী। একটি মুহূর্ত, একটি প্রচণ্ড শব্দ—তার পরের দৃশ্য হচ্ছে, রাস্তার একাংশ জুড়ে ইতস্তত ছিটকে পড়া একটি প্রকাণ্ড ট্রাকের ভগ্নাংশ। আর অমন বিশ-পঁচিশটা শত্রু সেনার লাশ। আর? হাঁ, আরো ছিল। লালপেড়ে শাড়ির ছিন্ন অংশ, ভগ্ন বিক্ষিপ্ত ট্রাকের গায়ে ও রাস্তায় লেপটে-যাওয়া কাঁচা থেতলানো মাংস্ আর রক্ত। ওই গুলোই পলি ভাবী। জ্বালামুখি রোশেনার পথ বেছে নিয়ে দেহের অসম্মানকে ধূলোয় ছুঁড়ে দিয়ে তিনি চ'লে গেলেন। রোশেনা কি শুধুই একটি নাম? সে একটি আদর্শ। সুদীপ্তদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী রোশেনা। বাঙালি-হত্যার শোধ নিতে শরীরে মাইন জড়িয়ে শত্রু সেনার ট্যাঙ্কের নীচে আত্মাহুতি দিয়েছিল সেই বীরদর্পিণী বঙ্গললনা। রোশেনা তাই বাঙালির ঘরে একটি রূপকথার নাম। বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি নবাগত শিশুর কাছে রূপকথার মতোই সমাদৃত হবে রোশেনার কাহিনী—সেই সঙ্গে পলি ভাবীরও।

নাজিমের পলি ভাবীর এই পরিণতি অবশ্যই কয়েক দিন পরের ঘটনা। পরে একসময় নাজিমের সঙ্গে দেখা হ'লে তার কাছে সব শুনেছিলেন সুদীপ্ত। কিন্তু এখন শুনলেন তাঁর সহকর্মী মোসাদ্দেক সাহেবের কথা। মোসাদ্দেক ছিলেন এস. এম. হলের হাউস টিউটর। আশ্চর্য, গতকাল থেকে একবারও সুদীপ্তর মধ্যে এস. এম. হলের চিন্তাটা আসেনি। ঐ হলের উত্তর ও পূর্ব দিকের রাস্তা দিয়েই গতকাল তিনি হেঁটেছেন, অথচ হলে যে তাঁদের ছাত্ররা ছিল, তাঁর কয়েকজন সহকর্মী ছিলেন, তাঁদের কথা তার মনে হয়নি। ইকবাল হলের চিত্র তাকে আচ্ছন্ন করেছিল—হল ক্যান্টিনের কাছে মৃত মানুষের স্তূপটাকে ঘিরে ঘিরে কেবলি এক রাশ প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছিল তাঁর মনে। মানুষ মেরে হত্যাকারী তা লুকাবার চেষ্টা করে, কিন্তু এরা তা কি সকলকে দেখাতে চায়? নিশ্চয়ই না। বোধহয় এতো বেশি মেরেছে যে, তার সবটুকু লুকানো এখন ওদের আয়ত্তের বাইরে। নাকি ওরা এখন সর্বপ্রকার লজ্জা শরমের অতীত? ইস্ কী মর্মান্তিক সেই দৃশ্য। ইত্যাদি নানা কথা ভাবতে ভাবতে এবং নানা দৃশ্যের যন্ত্রণায় বার বার আক্রান্ত অভিভূত হ'তে হ'তে এস. এম. হলের পাশ দিয়ে কখন চ'লে

গেছেন এবং ফিরেছেন ফিরোজের গাড়িতে। অতএব এস. এম. হল সম্পর্কে কোনো ধারণা এখন তিনি অন্যকে দিতে পারেন না। মোসাদ্দেক সাহেবের ওখান থেকে তিনি কি খুব দূরে ছিলেন? বিশ্ববিদ্যালয়ে তো একেবারে পাশাপাশি ঘরে তাঁরা ব'সে থাকেন। স্থানের দূরত্ব কোথাও বেশি নয়। কিন্তু মনের দূরত্ব? হ্যাঁ, ওটাও একটা কারণ হতে পারে যে, নাজিমের কাছে শোনার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সুদীপ্তর মনে মোসাদ্দেক সাহেব সম্পর্কে কোনো কৌতূহল ছিল না। না, কোনো বিরূপতাও নয়। ভদ্রলোককে কেমন যেন সুদীপ্তর পছন্দ হয় না। সকলকেই সকলে পছন্দ করতে পারে? বিশেষত দুজনের বাস যদি দুই জগতে হয়! মোসাদ্দেক সাহেব ছিলেন প্রাচীন আচারের বালুরাশি-আচ্ছন্ন দ্বীপের অধিবাসী।

ক'দিন থেকেই মোসাদ্দেক সাহেব কেমন যেন স্বস্তিতে ছিলেন না। বিশে মার্চের রাতে কাকের ডাক শুনেই তিনি বুঝেছিলেন সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ইস্ কী ব্যাকুল হয়ে কাকটা ডেকেছিল সে রাতে। আবার দেখ না, ঠিক পরের রাতে সেই স্বপ্ন। স্বপ্নে একটা বিশাল বাক্স দেখলেন মোসাদ্দেক সাহেব। এবং ঘুম থেকে জেগেই স্ত্রীকে ডেকে বললেন, এ বাড়ি থেকে চ'লে যাবার আদেশ হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নে তো বিছানা দেখেননি, কেবলি বাক্স দেখেছেন। অতএব বাক্স-বিছানা গুটিয়ে একেবারে চ'লে যাবার নির্দেশ এ নয়। বাক্স বোঝাই ক'রে যা পার সরিয়ে ফেল। বাইশে মার্চেই মোসাদ্দেক সাহেব বয়স্ক পুত্র-কন্যাদের দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সঙ্গে যতোটা সম্ভব টাকা-কড়ি ও গহনাপত্রও সরিয়েছিলেন। বাসায় ছিলেন কেবল তাঁরা স্বামী-স্ত্রী এবং কোলের একটি শিশু কন্যা। অতএব খুবই স্বাভাবিক যে, পাক-জওয়ানরা মোসাদ্দেক সাহেবের বাসায় ঢুকে আদৌ খুশি হয় নি। এ কেমন বাড়ি? রেডিও কৈ? সেলায়ের কল, টি. ভি. কিছুই যে নেই। মাত্র দু'জন বুড়ো-বুড়ি। ছুকরী আওরাত কাঁহা? ধুত্তোর, এ সালা লোগ কো লে যাও, গোলি কর। শিশু-কন্যাকে বুকে নিয়ে ওরা স্বামী-স্ত্রী আগে পিছনে দু'জন জওয়ানের সাথে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মানে, বেরুতে হ'ল। হলের আঙ্গিনায় যেতেই মোসাদ্দেক সাহেবকে দেখে হাউমাউ ক'রে ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল একটি ছাত্র। তাঁরই হলের ছাত্র। হলে ছাত্র সামান্যই ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ওরা ধরতে পারে নি। কেউ পালিয়ে বেঁচেছে, কেউ লুকিয়ে। ধরা পড়েছে জন পাঁচেক। তাদেরই একজন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল মোসাদ্দেক সাহেবকে।

বাঁচান স্যার। আমাকে বাঁচান। আমার বিধবা মায়ের আমি একমাত্র ছেলে। আমাকে বাঁচান।'

মোসাদ্দেক সাহেবের মনে হ'ল, এ তাঁর নিজেরই সেই ক্ষুদ্র শিশু পুত্রটি। ভয় পেয়ে এসে বুকে আশ্রয় নিয়েছে। এমনি ক'রেই ছোট শিশুরা রাতের

আঁধারে ভয় পেয়ে বাপের কোলে মুখ লুকোয়। কিন্তু হায়, বক্ষের সকল অভয়বাণী যে শুকিয়ে গেছে। মুখে কোনো কথা জোগাল না। দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরলেন ভয় পাওয়া সন্তানকে। কিন্তু কেবলি তো স্নেহ দিয়ে যমের কবল থেকে সন্তানকে রক্ষা করা যায় না। সেই মুহূর্তে মোসাদ্দেক সাহেব প্রবল যমের সম্মুখে ভীত অসহায় একটি জননীর প্রতীক হয়ে উঠলেন। আর যমের দোসর একটি জওয়ান এসে ছেলেটির মাথার চুল ধ'রে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল, মোসাদ্দেক সাহেব কি পাষাণ হয়ে গিয়েছিলেন? তাঁর স্ত্রী কিন্তু সম্পূর্ণ বোধটুকু হারান নি। তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন—

'খোদার কসম লাগে, এই বিধবা মায়ের ছেলেটিকে তোরা----'

ভদ্রমহিলার কথার শেষটুকু আর গুলির শব্দে শোনা গেল না। ছেলেটি মাটির বুকে লুটিয়ে পড়ল। তারপর? বাকি ছাত্রগুলিকে ওরা হুকুম করল—

'বোলো জয় বাংলা।'

ছেলেরা কি বলবে। ভয়ে সকলের গলা শুকিয়ে গেছে। তা' শুকোতে পারে। তবু কথা বলবে না এ কেমন বে-আদবি! দেখাচ্ছি মজা। একটি সৈনিক ছুটে গিয়ে একটি ছাত্রের তলপেটে মারল একটা জোর-লাথি। ভারি বুটের লাথি। একটা কাতর শব্দ ক'রে প'ড়ে গেল ছেলেটি। কিন্তু রেহাই মিলল না। মিলল বেয়নেটের খোঁচা। আর সঙ্গে সঙ্গে ভীতস্বরে বাকি ছেলেগুলি বলে উঠল 'জয় বাংলা'।

হাঁ, এই তো পাওয়া গেছে। হে বঙ্গ সন্তান, এবার তোমাদেরকে হত্যা করার হেতু পাওয়া গেছে। মুহূর্তেই তিনটি শব হয়ে ছাত্র তিনটি লুটিয়ে পড়ল মায়ের বুকে। অধ্যাপক মোসাদ্দেক হোসেন যেন দেখলেন, জননী শাহেরবানুর কোলে এলিয়ে পড়ল তাঁর তীরবিদ্ধ সন্তান—এজিদের সৈনিকরা জল চাওয়ার অপরাধে তীরবিদ্ধ করেছে শাহেরবানুর দুধের শিশুকে। জলেরই অন্য নাম জীবন। এ ছেলেরা সেই জীবনকে চেয়েছিল—স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের জীবন। তার পরিবর্তে ভাগ্যে জুটেছে গুলি।

অতঃপর মোসাদ্দেক সাহেবদের পালা। তিনি কলেমা প'ড়ে তৈরি হলেন মরবার জন্য। সৈনিকটিও রাইফেল তাক ক'রে দাঁড়াল। হাঁ, ঠিক এমনি একটা অবস্থার মুখেও তিনি বেঁচেছেন। এবং বেঁচে আছেন। মোসাদ্দেক সাহেবের স্ত্রী উর্দু জানতেন। তিনি সেই মুহূর্তে ছুটে এসে স্বামীকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং সৈনিকটিকে 'বেটা!' সম্বোধন ক'রে পরিস্কার উর্দুতে বলেছিলেন-তোমার পিতাজীর প্রাণ ভিক্ষা চাই বেটা! এ কথায় কাজ হয়েছিল? বহু ক্ষেত্রেই হয়নি। বাপ ডেকেই সর্বত্র কি দুর্বৃত্ত লম্পটের হাত থেকে মেয়েদের রেহাই মেলে? কিন্তু কচিৎ কোন-ক্ষেত্রে মিলতেও পারে। অন্ততঃ মোসাদ্দেক সাহেব রেহাই পেয়েছিলেন। এই প্রৌঢ় দম্পতি-যুগলের মুখের পানে চেয়ে সামান্য একটি পাঠান সৈনিকের মনে কি ভাবের উদয় হয়েছিল তা এ ক্ষেত্রে

অনুমান করা যায়নি। হয়ত তার মন বলে থাকবে—আমি কি করব মা, আমি তো হুকুমের গোলাম। কোনো-কিছু করা না করার ব্যাপারে সাধারণ একটি সৈনিকের স্বাধীনতা কতটুকু? সেটা মোসাদ্দেক সাহেব বা তাঁর স্ত্রী বা তাঁর ছাত্র নাজিম হুসেন কেউই জানেন না। কেবল কয়েক ঘন্টা পর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে মোসাদ্দেক সাহেব দেখেন, নিজের বাসাতেই শয়নকক্ষে তাঁরা ব'সে আছেন—তিনি, তাঁর স্ত্রী, আর ছোট মেয়েটি। আল্লাহ্ তোমার কৃপাতেই এ যাত্রা বাঁচলাম। মনে মনে আল্লাহ্‌র প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় মোসাদ্দেক সাহেব টুইটম্বুর হয়ে ওঠেন। কিন্তু কেমন ক'রে যেন পরক্ষণেই ভাবনাটা আসে—আবার কেউ আসবে না তো! হায়, সেই আশঙ্কাই সত্য হ'ল কয়েক ঘন্টা পর। দুপুর বেলায় নামায পড়বেন ব'লে ওজু করতে গেছেন মোসাদ্দেক সাহেব। মনে সেই আফসোসটা ছিলই। আজ শুক্রবার। শুক্রবারে আজ জুমার নামাযের জামাত হবে না। অগত্যা জোহরের জন্য ওজু করতে ঢুকলেন বাথরুমে। সহসা কন্যার চীৎকারে সেখান থেকে বেরিয়ে দেখেন, দুটি যমদূত। দুজন পাকিস্তানি জওয়ান ঘরের মধ্যে। তাদের একজন মোসাদ্দেককে দেখেই তাঁর বুকের কাছে রাইফেলের নল তুলে ধ'রে দাবি জানাল—রুপেয়া নিকালো।

এতোক্ষণে তাঁদের খেয়াল হ'ল, আলমারিতে কিছু টাকা ছিল বটে। এবং এতক্ষণে তাঁদের নজরে পড়ল, আলমারি খোলা। আগে যারা প্রথম ঘরে ঢুকেছিল তারাই সব লুটে নিয়ে গেছে। এখন তবে এদেরকে দেওয়া যাবে কী? মোসাদ্দেক সাহেবের স্ত্রী উর্দুতে বোঝালেন, যা ছিল সব তো তোমরা আগেই নিয়ে গেছ বাবা, এখন তোমাদেরকে আবার কী দেব?

তবে রে .... বিশ্রী একটা গাল দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল একটা জওয়ান। এবং আর একজন তার কর্ম শুরু করল। গুলি নয়, প্রহার। বুটের লাথি ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে সে কী মার! মোসাদ্দেক সাহেবের স্ত্রীও রেহাই পেলেন না। পাঁচ বছরের কন্যাটি ভয়ে খাটের নীচে লুকিয়েছিল। লুকোতে দেখেও ছিল তারা। কিন্তু তাকে আর টেনে বের ক'রে কী লাভ! ঐকুটু এক রত্তি মেয়ে। মারতে গেলে হয়ত মরেই যাবে। তা মারতে আপত্তি নেই। কিন্তু মেরে লাভ? তার চেয়ে থাক। বড়ো হোক একটু। আমরা তো থাকবই এদেশে। আমাদেরই কোনো বেরাদারের কাজে লাগবে তখন। অতএব বুড়ো-বুড়ি দু'টোকে মেরে অজ্ঞান ক'রে তার বদলে কচি মেয়েটিকে অব্যাহতি দিল তারা। গতকাল কারফিউ উঠলে সেই রক্তসিক্ত জামা-কাপড়েই তাঁদেরকে পথে বেরোতে হয়েছিল। অন্য জামা-কাপড় আর ছিল কোথায় যে, তা বদলে নেবার সুযোগ পাবেন তাঁরা! তাঁদের সঙ্গেই হল থেকে বেরিয়েছিল একটি ছাত্র—মাসুম সিরাজ।

মাসুম সিরাজ বেরিয়ে হল-প্রাঙ্গণেই পেয়েছিল তার বড়ভাই মাসুদ সিরাজের লাশ। সেই লাশ জড়িয়ে ধ'রে তার সে কী কান্না! সেই লাশ থেকে

তাকে ছাড়িয়ে আনা কি যায়! মোসাদ্দেক সাহেব তাকে অনেক বুঝিয়ে নিজের দুর্দশার কাহিনী শুনিয়ে কোনো মতে সঙ্গে ক'রে চ'লে গেছেন। কোথায়? বুড়ীগঙ্গার ওপারে, জিঞ্জিরার দিকে—সেখানে মোসাদ্দেক সাহেবের এক আত্মীয় থাকেন। কোনো গাড়ি না পেয়ে অগত্যা তাঁরা হেঁটেই চলছিলেন ধীরে ধীরে। ঐ অবস্থায় দেখা হয়েছিল নাজিম হুসেনের সঙ্গে। মোসাদ্দেক সাহেবের প্রাক্তন ছাত্র নাজিম হুসেন তার স্যারকে নিজের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে সদরঘাটে পৌঁছে দিয়েছিল।

মাসুম সিরাজ?

সেও গেছে স্যারের সঙ্গে। মাসুম সিরাজ সুদীপ্তর টিউটোরিয়াল গ্রুপের ছাত্র—খুবই ভালো ছাত্র। এস. এস. সি. এইচ. এস. সি-দুটো পরীক্ষাতেই সে প্রথমে দশজনের মধ্যে ছিল। কিন্তু বড় ভাই মাসুদ ছিল মূলত পড়ুয়া নয়, খেলোয়াড়। ক্রিকেটের গোলা ছুঁড়তে তার জুড়ি মেলা ভার। সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-একাদশে তার স্থান ছিল অনড়। এই দুটি ভাই কেউই কখনো রাজনীতির ধার কাছেও ঘেঁষত না। অবশ্যই তা নিয়ে কোনো যে গর্ববোধ তাদের মনে ছিল তাও নয়। ওদের দুই ভাইয়েরই মত হচ্ছে, সব কাজ সকলে পারে না। অতএব নীরবে নিরীহ নির্বিরোধ ছাত্রের ভূমিকা নিয়ে হলের এক কোণে তারা প'ড়ে থাকত। সেই রাতের প্রলয়কাণ্ড শুরু হ'তেই মাসুদ তার ছোট ভাইকে চৌকির নীচে পাঠিয়ে বিছানাপত্র চটপট গুটিয়ে বেঁধে ফেলেছিল। বিছানার পুলিন্দা চৌকির উপর রেখে ভাইকে উপদেশ দিয়েছিল—এক কোণে চুপচাপ ব'সে থাকবি, কখনো গলা বাড়াবি নে। অতঃপর বাইরে এস ঘরে তালা দিয়ে কোথায় যে সে লুকিয়েছিল ছোট ভাই তা জানে না! খালি যাবার সময় বলেছিল—

'আমার জন্য ভয় করিস নে। আমি কোথাও ঠিক ম্যানেজ ক'রে নেব।' কিন্তু হায় সেই ম্যানেজ আর সম্ভব হয় নি। তবে তার বুদ্ধিবলে ছোট ভাই বেঁচে গিয়েছিল ঠিকই। হাঁ, মাসুদের বুদ্ধিতেই মাসুম বেঁচেছিল। তালা দেওয়াকে দুর্বৃত্তরা বিশ্বাস করে নি। দারোয়ান ছাত্রদের তালা দিয়ে রেখে যেতে পারে না? অতএব প্রত্যেকটি তালা ভেঙ্গে তারা ঘরে ঢুকেছিল মাসুমের ঘরে একেবারে চৌকির পাশে গিয়ে বিছানার স্তূপে বেয়নেটের খোঁচা দিয়ে দেখেছিল। সেই সময়ে চৌকির নীচে মাসুম অস্পষ্টভাবে কেবল দেখেছিল পাশাপাশি দুটি ক্ষুদ্র থামের মতো এক জোড়া পা। একেবারে হাতের নাগালে? ধ'রে এক টান দিলে কেমন হয়। হাঁ, নিশ্চয় তা সে দেবে। গুড়ি মেরে চৌকির নীচে নজর দেবার চেষ্টা করলে সে আর খাতির করবে না। তখন মরতে এমনিতে হবে। অতএব মরবার আগে একটাকে মারবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে। মেঝের উপরে ফেলে দিয়ে গলা টিপে ধরতে পারলে কেল্লা ফতে। কিন্তু কেল্লা জয় কি অতই সোজা মাসুম! জওয়ানেরা কখনো একা থাকে দেখেছ? একটাকে তুমি কুস্তির

প্যাঁচ ক'ষে ফেলতে যদিও পার সঙ্গে সঙ্গে অন্য জওয়ানের গুলি খেতে হবে না তোমাকে? ঐ তো আর একটা জওয়ান একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এবং কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেই সঙ্গীকে নিয়ে সে বেরিয়ে গিয়েছিল। অতএব মাসুম বেঁচে গেছে। এবং মাসুম কাঁদছে। এখন সে বড়ো ভাইয়ের খবর নিয়ে কী ক'রে বাপ মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। এক সাথে দু'টি ভাই তারা বরিশালের একটি গ্রামে একত্রে খেলা ক'রে ঝগড়া ক'রে ঈর্ষা ভালোবাসার জোয়ার-ভাঁটার দোল খেয়ে মানুষ— জীবনে কখনো এই দিনটির কথা কি মাসুম চিন্তা করেছিল! তার ভাইয়ের কি দাফন-কাফনও হবে না? ঐখানে প'ড়ে গ'লে প'চে কাক শকুনের খাদ্য হবে? মাসুম তার স্যারের সঙ্গে হাঁটছিল, আর দুই গাল বেয়ে জল ঝরছিল। এখন ফিরে যাওয়া যায় না? ভাইয়ের কাছে ব'সে কোরান পাঠ.........

'মাসুম, ওঠ বাবা, আর তো কিছু করার নেই।'

তাই তো, একটা গাড়ি পাওয়া গেছে। স্যার উঠে গেছেন এবং মাসুমকে উঠতে বলছেন। আর যে হাঁটতে হবে না, সেই কথাটা একবার চট ক'রে মনে প'ড়ে গেল মাসুমের , এবং উঠে বসল নাজিমের ঝকঝকে মরিস মাইনরে।

সুদীপ্ত বাসায় পৌছলেন সাড়ে বারটার দিকে। পৌছেই বুঝলেন তাঁকে ঘিরে একটা উৎকণ্ঠার নিম্নচাপ তীব্র আশঙ্কার ঝড়ে রূপ নিচ্ছিল। আমিনাকে সামলাতে মীনাক্ষী হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন।

'বারোটা থেকে কারফিউ শুরু হয়েছে। কোন্ আক্কেলে বাইরে ছিলে? এলে কি ভাবে?'

নাজিম তার স্যারকে গেটের কাছে নামিয়ে দিয়ে চ'লে গেছে, এঁরা কেউ তা জানেন না। এবং তাঁদের জানা আছে, বারোটা থেকে কারফিউ শুরু হয়ে গেছে। নাজিমও প্রথমে তাই জানত। তাই স্যারকে নিয়ে ঢুকেছিল এলিফ্যান্ট রোডের এক বাড়িতে। ঐখানে তার এক বন্ধু থাকে। নিজের বাড়ি অনেক দূর সেই র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটে। এত অল্প সময়ে সেখানে পৌছানো যাবে না। ফিরোজের বাড়ি পৌছতে হ'লেও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সামনেটা মাড়িয়ে যেতে হবে। এখানে আবার মিলিটারি ছাউনি পড়েছে। অতএব সুদীপ্ত চিন্তা ক'রে দেখলেন, সবচেয়ে নিরাপদ এখন নাজিমের বন্ধুর বাড়ি। কোন মতে বিশ ঘন্টা সেখানেই

কাটাতে হবে। কিন্তু কথাটা কি সুদীপ্ত ভাবেন নি? আমিনাকে একটা প্রবল দুশ্চিন্তা পোহাতে হবে না? তা হ'লেও, এর চেয়ে অধিকতর নিরাপদ কোন ব্যবস্থার কথা মাথায় এল না। সামনে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, বন্দরে বিষণ্ণ উপায়ন্তবিহীন নাবিক—সুদীপ্তর দশা হ'ল অনেকটা তেমনি।

বন্ধুর বাড়ি পৌঁছতেই রাস্তার অনেকখানি জুড়ে রক্তের ছাপ দেখে চমকে উঠেছিল নাজিম। এবং সুদীপ্ত চমকে উঠেছিলেন যখন নাজিমের বন্ধু ওয়াজেদের কাছে শুনেছিলেন—

'ওটা লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের রক্ত। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে মেরেছে।'

সেই তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম প্রধান আসামী লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন? তাঁকেও ওরা মেরেছে নাকি? সার্জেন্ট জহুরুল হককে মেরেছিল ক্যান্টনমেন্টের ভিতরেই। মোয়াজ্জেম হোসেনকে মারবার আগেই আয়ুব খান ভয় পেয়ে মামলা উঠিয়ে নিলেন। নাহ্, ঐ রকম ভীতু আদমী দিয়ে দেশের শাসন চলে না। পাঞ্জাবি আর্মি অফিসারদের মনে মনে দারুণ একটা ক্ষোভ ছিল। আর্মিতে পাঞ্জাবিদের একটা স্পেশাল খাতির আছে না! আশ্চর্য, ঐ মোয়াজ্জেমটা সে কথা মানতে চায় না। পাঞ্জাবি-পাঠান-বালুচ-বাঙালি সব এক ক'রে দেখতে চায়। আর বলে কি না, আর্মিতে বাঙালিদের পথে আমরা কাঁটা বিছিয়ে রাখি! হাঁ বটে, বাধা না দিলে বিস্তর বাঙালি আর্মিতে ঢুকত, আমাদের একাধিপত্য খর্ব হ'ত! অতএব কিছু কিছু বাধা আরোপ দেশের স্বার্থেই করতে হয় আমাদের। বাঙালি তো সব গাদ্দার। পাকিস্তানে সাচ্চা ঈমানদার নাগরিক যদি কেউ থাকে সে তো আমরা—পাঞ্জাবিরা। কথাটা সকলেই মানবে। খালি মানতে চায় না বাঙালিরা। অতএব বাঙালিদের হত্যা করা দেশের স্বার্থে ও ইসলামের স্বার্থে হবে খুবই নেকির কাম! কিন্তু ঐ পাঠান আয়ুবটার ভীরুতার জন্য সেবার একটা জবর গাদ্দারকে খতম করার সুযোগ হারাতে হয়েছে। দিলের ভেতর সাংঘাতিক ক্ষোভ ছিল একটা। সেই ক্ষোভের খানিকটা উপশম হয়েছে এবার। হাজার হাজার মানুষের রক্তে পিপাসার নিবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু মফঃস্বল থেকে কি যে সব খবর আসছে! বাহাত্তর ঘন্টা পর বিজয় মহোৎসবের সেই কর্মসূচীটা কি বাতিল হয়ে যাবে?

মোয়াজ্জেম হোসেনকে ঘরেই পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেই কর্ণেল ওসমানীকে পাওয়া যায় নি। সেইটেই ভয়ের কথা। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই. পি. আর. বিদ্রোহ করল, কর্ণেল ওসমানী অদৃশ্য হলেন—দুয়ের মধ্যে কোনো সংযোগ থাকলে রীতিমত ভয়ের কথা বৈ কি। মোয়াজ্জেম হোসেনকে মারার আনন্দ ইতিমধ্যেই তাই ফিকে হয়ে গেছে। খায়েশ ছিল, মোয়াজ্জেম হোসেনের মতো সন্দেহজনক কিছু বাঙালি সামরিক অফিসারকে সাবাড় ক'রে ভবিষ্যৎটাকে নিরাপদ ক'রে ফেলা হবে। কিন্তু সকলেই মোয়াজ্জেম হোসেনের মতো সহজ

লভ্য হন নি। ওদের মতলব পূর্বেই টের পেতে অনেকে কেটে পড়েছেন—

ওয়াজেদ তখন বাড়ি ছেড়ে ঐ মহল্লা থেকে কেটে পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল-নাজিম তার স্যারকে নিয়ে পৌছল সেখানে। আমরা এলাম, ওরা বেরুচ্ছে। ব্যাপার কি? কারফিউ না? তখনি জানা গেল—

'কারউফিউ যথারীতি চারটে থেকে।'

'ঠিক জানো তো?'

না জানলে এখন সে স্ত্রী ও ভাই-বোনদের নিয়ে বেরুবে কেন? কিন্তু! 'যাচ্ছটা কোথায়?'

'আর ভাই বোলো না। এদের বোঝানো যাচ্ছে না। বলে, পুরোনো ঢাকা নাকি নিরাপদ। তাই বহু কষ্টে সেখানে একটা ঘর জোগাড় করেছি। বিস্তর কষ্ট হবে। কিন্তু কি আর করব। আপাতত সেখানেই কিছুকাল বনবাসে থাকব।

'অনেকে আবার পুরোনো ঢাকা ছেড়ে ধানমন্ডি এলাকায় পারলে চ'লে আসছে তা জান!'

এরি নাম বোধ হয় দিশেহারা অবস্থা! প্রত্যেকে ভাবছে, শহরের ঐ অংশ নিরাপদ । অবশ্য অবস্থাটা কেবল তাদের জন্য যারা শহরে থাকতে চায়। কিন্তু থাকতেনা চাওয়াদের সংখ্যা শতকরা নব্বইয়ের কাছাকাছি। তারা সহসা গান্ধীজীর "গ্রামে ফিরে চল" নীতির ভক্ত হয়ে উঠে বুড়িগঙ্গা পাড়ি দিতে শুরু করেছে। কিংবা গাড়ি থাকলে পালাচ্ছে নরসিংদীর পানে। সাভারের দিকে যাবার উপায় নেই। ওদিকে যেতে পথে মীরপুরের কাছে বিহারিরা গাড়ি থামিয়ে লুটপাট চালাচ্ছে, আর বাঙালি বেঈমান পেলে ধ'রে জবাই করছে।

একটি পরিবারের কথা ওয়াজেদ বলল। গতকাল পালাবার সময় মীরপুর ব্রিজের কাছে বিহারিদের কবলে পড়েছিল। সবাই মারা পড়েছে। কেবল দুজন যুবক নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ডুব-সাঁতার দিয়ে কোনো মতে প্রাণরক্ষা করেছে। বাংলাদেশে ব'সে বহিরাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হাতে বাঙালিকে মার খেতে হল এ অতি নিদারুণ লজ্জা বটে, কিন্তু সময় এলে শোধ নেবার চিন্তাটাও কাপুরুষতা। ওয়াজেদ বলেছিল—

'সময় এলে এবার দেখবেন স্যার, দেশকে বিহারিশূন্য ক'রে ছাড়ব।'

সেটা খুব সহজ! বাংলাদেশে বিহারিদের সংখ্যা কত? সুদীপ্ত সেটা জানেন না। খুব বেশি হলেও সংখ্যাটা শতকরা দশভাগের উর্ধে যাবে না। নব্বইজন ইচ্ছা করলে দশজনকে দশ মিনিটেই সাবাড় করতে পারে। কিন্তু সেটা কি নব্বই জনের পক্ষে গৌরবের কাজ হবে? সুদীপ্ত বললেন—

'কাজটা সেই পাঞ্জাবিদের মতো হবে আমরা এখন যাদেরকে প্রবলভাবে ঘৃণা করছি। আমরা চাইছি নির্ভেজাল গণতন্ত্র! তার অন্যতম মূল কথাটি হচ্ছে, বিনা বিচারে অন্যায়ভাবে কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না। এবং মতামতের স্বাধীনতার সঙ্গে তার দায়-দায়িত্বটাও হবে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত।'

'তা ছাড়া, আমি জানি, নাজিম বলল, অনেক বিহারীই এখনো আমাদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত আছেন। তাঁরা আমাদেরই ভালো-মন্দের সাথে নিজেদের ভাগ্য জড়িয়ে নিয়েছেন।'

সে কথা ওয়াজেদও কিছু কিছু জানে। সেই যে এক বিহারি ভদ্রলোকের দোকান ছিল নিউ মার্কেটে,—মাঝে মাঝে দুএকটা জিনিস কিনত, সেই সূত্রে পরিচয়। কাল থেকে দু-তিনবার অন্ততঃ ওয়াজেদের খোঁজ নিয়ে গেছেন। ওয়াজেদ সে জন্য কৃতজ্ঞ বৈকি ! কিন্তু সেটা তো ব্যক্তিগত ব্যাপার, জাতিগত প্রশ্ন উঠলে ওই জাতকে আর ক্ষমার কথা উঠতেই পারে না। সে বলল—

'হাঁ, সেই রকম দু-চারজনকে বাদ দিয়ে বাকিগুলোকে ধরব আমরা।'

'সেটা বলতে পার।'—নাজিম ওয়াজেদকে সমর্থন জানাল।

'না, তাও নয়।' সুদীপ্ত মাথা নাড়লেন, 'ব্যাপারটা ঠিক উলটো হওয়া উচিত। যারা যারা এখন দুষ্কর্মে লিপ্ত কেবল তাদেরকেই চিহ্নিত ক'রে রাখ। তখন খুঁজে বের ক'রে শাস্তি দেব। শাস্তিটা কখনোই সমষ্টিগতভাবে কোনো সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না।'

এ কথায় কেউই সন্তুষ্ট হ'ল না। নাজিমও না। ওয়াজেদ তো নয়ই। তবু তাদের স্যার বলছেন। অতএব আর তারা কিছু প্রতিবাদ জানাল না। স্যাররা ওই রকম ব'লেই থাকেন। সব শুনলে চলে না।

একটি মেয়ের কথা তাদের শুনতে হ'লো! সদর রাস্তা ছেড়ে একটি গলি পথে অনেকখানি ঘুরে যাচ্ছিলেন তাঁরা। টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মিলিটারি ছাউনি এড়াবার জন্যই এই প্রচেষ্টা। গলিটার বেশ অভ্যন্তরে একটি বাড়ির দরজায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল। পিঠের দিকটায় দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে গালে বাঁ হাত ডান হাত পাশে ঝুলছিল, সে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পায়ের কাছে ব'সে ছিল পোষা কুকুরটা। তাঁদেরকে দেখে মেয়েটি ডান হাত তুলে থামতে ইশারা জানাল। এবং গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে জানলার কাছে এগিয়ে কোনো ভূমিকা না রেখে সরাসরি শুধাল—

'আপনারা ভদ্দরলোক, আমার একটা কথার জবাব কইতে পারেন?'

ব'লেই আনমনে গাড়ির জানলার কাচে নখ ঘষতে শুরু করল।ঐ দিকটায় ব'সেছিলেন সুদীপ্ত । তিনিই অতএব বললেন—

'বলুন।'

'আমি মুরুক্ষু মাইয়া লোক। কিন্তুক পাশের বাড়ির মৌলভি সাব আমারে কন কি, তোর ছাওয়ালের লগে দুখ্‌কু করিস না। জেহাদের ছওয়াব পাইবি। আপনারা কন তো, হেই সব কামেরে কি জেহাদ কয়? আর তাতে ছাওয়াল মারা গেলে কি ছওয়াব হয়?'

ছেলে মারা গেলে কি পুণ্য হয়?—এমন অদ্ভুত প্রশ্ন সুদীপ্ত কখনো শোনেন নি। পুরো বৃত্তান্ত না শুনলে সব বোঝাও যাবে না। তবে এক মৌলভির

রেফারেন্স থেকে তাঁর মনে হ'ল কথাটা বোধ হয় উঠেছে সান্ত্বনা দেবার জন্য। হয়ত মেয়েটির ছেলে এই পাকিস্তানি বর্বরদের হামলার শিকারে পরিণত হয়েছে। এবং তা যখন হয়েছেই তখন অগত্যা সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি? প্রতিবেশী হিসাবে মৌলভি সাহেব তাই সান্ত্বনা দান করেছেন। কাজটা ভালোই তো।

কিন্তু হায় আল্লাহ! এ কি শোনাচ্ছে মেয়েটি ! এই বিধবা মেয়েটির একমাত্র ছেলে মারা গেছে সে এবার তো নয়। সেই উনিশ শো পঁয়ষট্টিতে। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে ! পঁয়ত্রিশ বছরের বিধবাটিকে তখনি যেন আবিষ্কার করেছিল এ পাড়ার সদ্য বিপত্নীক সোবহান মৌলভি । সোবহান ঐ সময় বুঝিয়ে দিয়েছিল—

'এ তো যেমন তেমন লড়াই না। এ হল জেহাদ। হিন্দুস্থানের সাথে পাকিস্তানের জেহাদ। সেই জেহাদে মারা গেছে তোর ছাওয়াল । জেহাদে মারা গেলে আল্লাহ তারে বেহেস্তে লন। তোর ছাওয়ালের লগে লগে তোরেও বেহেস্তে লইবেন। আমাদের তখন ভুলিস না যেন।'

বলতে বলতে সোবহান মৌলভি মিসি দেওয়া কালো দাঁত বের ক'রে হেসেছিল। কিন্তু পরক্ষণে সংযত দার্শনিকের ভূমিকা নিয়ে গম্ভীর হয়ে উপদেশ দিয়েছিল—

'তুই সবুর কইরা থাক। তোর ছওয়াব হইব।'

তা সবুর মেয়েটি করেছিল। এই ক বছরে সে বিস্তর নামায-রোজা করেছে। এবং ছেলের জন্য দোয়া করেছে! একটি মহৎ কার্যের জন্য ছেলে জীবন দিয়েছে এমনি একটি ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হওয়ার পর সে যথেষ্ট সান্ত্বনা পেয়েছিল। এমনি কি মৌলভি যে তাকে নেকা করতে চেয়েছিল সেই সুখের কামটাতেও আর আপত্তি জানাবে না ব'লে প্রায় ঠিক ক'রে ফেলেছিল । এমন সময় এল একাত্তরের পঁচিশে মার্চ। রাত্রে প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়ে তখনি সে ছুটে গিয়েছিল সোবহান মৌলভির কাছে।—

'ওগো মৌলভি সাব কি হৈল গো! একি ওজ কেয়ামত শুরু হইল গো! ওগো আল্লাহ কী হবে গো।'

সোবহান মৌলভি বিবি সাবেরে ঘরে নিয়ে বিস্তর ঝাড়-ফুঁক করেছিল। সাহস দিয়েছিল—

'আরে ভয় করিস না। এ রোজ কিয়ামত না। কাফের গো মারন লগে জেহাদ শুরু হইছে।'

'এ্যা! এ্যারে বুঝি জেহাদ কয়! আমার ছাওয়াল এই জেহাদ করছিল। এই কাম করলে বেহেস্ত পাওন যায়!'

প্রবল বিস্ময়ে ও ভয়ে আক্রান্ত হয়েছিল মেয়েটি। গতকাল কারফিউ ওঠার পর এই জেহাদ সম্পর্কে যতোই তথ্য সে অবগত হয়েছে ততই কেমন যেন হয়ে গেছে মেয়েটি। এ্যারে বুঝি জেহাদ কয়? ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া,

এলোপাথাড়ি গুলি ক'রে মানুষ মারা, মেয়ে ধ'রে নিয়ে যাওয়া— এই সবই জেহাদ বুঝি? এই জেহাদ আবার ক'রে নাকি। একটা গ্রাম্য ক্রোধ তাকে গ্রাস করেছিল। সে কিছুক্ষণ আগেই মৌলভিকে শুধিয়েছিল —

'অরে অ মিনসে, জেহাদ মানুষ কিসের লগে করে?'

'এছলামকে বাঁচানোর লগে জেহাদ করতে হয়। বেশি চেঁচাবি না যা।'

মেয়ে মানুষ হলেও তার ঝাল মাখানো কথা সোবহান মৌলভির সহ্য হয় না। মেয়ে মানুষ বাপু দু-একটু রসের কথা বলবি। তা না, কাল থেকে খালি ফ্যাচর ফ্যাচর। ছাওয়াল হারিয়েছিস তো হয়েছে কি! আমার কথায় যখন রাজি হয়েছিস তখন ছাওয়াল তাড়াতাড়িই পাইবি। সে জন্য বেশি ভাবতে হবে না তোকে।

কিন্তু মেয়েটি তবু ভাবছিল। তার ভাবনারা অনন্ত শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট একটি বিপুল মহীরুহ হয়ে উঠেছিল। আমার ছাওয়ালটাও এমনি ক'রেই জেহাদ করেছে নাকি!...... এমনি করে আগুন দিয়েছে ঘরে ঘরে। এমনি ক'রে মানুষ মেরেছে! মেয়ে ধরেছে । এ্যাঁ! ঐ কামে ছওয়াব হয় নাকি! আর ঐ সব কাম করলে তবেই এছলাম বাঁচে বুঝি! কি জানি ! মুরুক্ষু মেয়ে মানুষ আমরা! কিন্তু--- ।একটা "কিন্তু" কিছুতেই মেয়েটির মন থেকে যেতে চায় না।

সোবহান মৌলভি মেয়েটিকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে ভাবে, ছেলের শোকটা আবার নতুন ক'রে জেগেছে বোধ হয়। তাই সে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল।----

'করিমন বিবি, তুমি ছাওয়ালের লগে আর দুকখু কইরো না। তা হ'লে ছওয়াব পাইবা। জেহাদের কামে...' বাকিটুকু আর সে বলতে দেয় নি মৌলভীকে। পাশেই ঝাটা পড়েছিল। সেটা হাতে তুলে—'তোর জেহাদের গুষ্টি নিপাত করি......বলতে বলতেই খেংরাপেটা শুরু করলে দৌড় দিয়ে পালাতে হয়েছিল সোবহান মৌলভিকে। কিন্তু তারপর এক সময় ভাবতে হয়েছিল মেয়েটিকে —এমনটা না করলেই ভাল হ'ত। হয়ত মৌলভির কথাই ঠিক। ভাবছিল সে। ঠিক এমনি সময় নাজিম তার স্যারকে নিয়ে যাচ্ছিল ঐ গলি দিয়ে। মেয়েটি গড় গড় করে তার কাহিনী বলে গেল। সংক্ষেপে। এবং ততটুকু, যতটুকু একজন বাইরের লোককে বলা যায়। রাতের সেই ঘটনাটা বললনা। সেই রাতে যখন দুনিয়া ফানা হওয়ার যোগাড় তখনি মৌলভী সাব সেই কামটা করল। না, সে বাধা বড় একটা দেয় নি। সাদী করবে ব'লে কথা দিয়েছে যখন তখন আর বাধা দিয়ে লাভ কি? সোবহান মৌলভি তাকে বুঝিয়েছিল—

'এ কামে ছওয়াব আছে তা জানিস। এক একবারের কামে এক একটা কাফের কতলের ছওয়াব হয়।'

মৌলভির সঙ্গে সম্পর্কের এই অংশটুকু মেয়েটা গোপন করল। কিন্তু খেংরাপেটার কথাটা লুকালনা। শুনে সুদীপ্ত কান্নাহাসির মাঝখানে একটা ভারি অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে প'ড়ে গেলেন। নাজিম হাসি চেপে বলল—

'চলুন স্যার আমরা পালাই।'

'একটু দাঁড়াও'—বলে পকেট থেকে তিনি পাঁচটি টাকা বের করলেন। মেয়েটির হাতে দিয়ে একটি উপদেশ দিলেন শুধু —

'মা' আপনি পারলে অন্য কোথাও চলে যান। নাজিম চালাও।'
মেয়েটিকে আর কিছু বলার সুযোগ দিতে চান না তিনি। কেননা এখন তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছতে চান।

শিল্পী আমনের বৃত্তান্ত সকলকে শোনালেন সুদীপ্ত। কিন্তু আশ্চর্য , কেউই তো আমনের জন্য দুঃখিত খুব বলে মনে হ'ল না। বরং সকলেই শিউরে উঠলেন সুদীপ্তর জন্য। সুদীপ্তর সম্ভাব্য পরিণতি ভেবেই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সকলে।

'উহ্ খুব একটা বাঁচা বেঁচেছ। আল্লাহ্ বাঁচিয়ে দিয়েছে।'

'ভাগ্যিস, তিনি তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। নইলে কী যে হ'ত! আল্লাহ্!

সকলের কথাই সুদীপ্ত শুনলেন। কিন্তু ভাবলেন আমনের কথা। অনেকক্ষণ করো সঙ্গে কথা না ব'লে আমনের কথা ভেবে সময় কাটালেন সুদীপ্তর বন্ধু ফিরোজ একবার চেয়ার টেনে পাশে বসলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ বসে এবং কয়েকটি কথা ব'লেও সুদীপ্তর মনের সাড়া পেলেন না। অবশ্যই ফিরোজের কথার উত্তরে সুদীপ্ত মূক ছিলেন না। কথার উত্তরে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু সেইটেই কি সব?

'তুমি যে কখন বেরিয়ে গেলে, একটু অপেক্ষা করলে ফিরে এসে আমিও তোমার সঙ্গে যেতাম।'

'না, ভেবে দেখলাম, বাজার থেকে তোমার ফিরতে কত দেরি হয়, তাই—'

সুদীপ্ত বাক্য অসমাপ্ত রাখলেন। কিছুক্ষণ নীরবতা পোহানোর, পর একটা প্রসঙ্গ তুললেন ফিরোজ—

'স্বাধীন বাংলা বেতারের কথা শুনেছ?'

'কৈ, না তো।'

সুদীপ্তর কী হয়েছে আজ! হাঁ, অনেক কিছুই হয়েছে। তবু স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ শুনে বলার কথা কি শুধু ঐটুকু? আর কোনো কৌতূহল প্রকাশ পাবে না! এতোখানি ফিরোজ আশা করেন নি। সুদীপ্ত তাঁর বন্ধু। সে তো আজকের কথা নয়। কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্সে এক সঙ্গে পড়েছেন তাঁরা এক সঙ্গে তখন কবিতা লিখে মাসিক 'সওগাতে' ছাপাতেন। সেই কবিতা লেখার

সূত্রেই তাঁদের দু'জনের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছে। কিন্তু আজ আর ফিরোজ কবিতা লেখেন না। কবিতা ছেড়ে এখন ব্যবসা ধরেছেন এবং রাজনীতি। সুদীপ্তর ধারণা ফিরোজ কবিতা ভালই লেখে, এবং নিয়মিত লেখা উচিত। কিন্তু ফিরোজের ধারণা, চল্লিশ বছর অবধি কবিতা লিখেও যখন কবি-খ্যাতি বিশেষ হয় নি, তখন আর তা হবার সম্ভাবনাও নেই। মেনে নেওয়া ভালো, কবিতার দেশ বাংলায় যতোখানি ক্ষমতা থাকলে একজনের কবিতা লেখা উচিত ততখানি ক্ষমতা আমার নেই। অতএব কবিতা লেখার চেষ্টা ক'রে অকারণ সময় ও কাগজের অপব্যয় ক'রে কী লাভ? কোনো লাভ নেই, তবে কবিতা পাঠের লোভটা এখনো পুরো মাত্রায় আছে। ফিরোজ নিয়মিত কবিতা পড়েন এবং কখনো বলেন না—কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি।

ফিরোজের পৈত্রিক নিবাস ঢাকা জেলাতে হ'লেও বাল্য থেকে যৌবনের উন্মেষ ও তার পরেও কিছুকাল কাটিয়েছেন কলকাতায়। কলকাতার বিরহ তাঁকেও পোহাতে হয়। ঐ একটা বিষয় আছে সেটা পশ্চিম পাকিস্তানিরা বোঝে না! শিক্ষিত বাঙালির একটা বৃহৎ অংশই একদা কলকাতার সঙ্গে গাঁথা পড়েছিলেন—সেই কর্নওয়ালিসের আমল থেকে। বাঙালি কলকাতামুখি হয়েছে। কলকাতার সঙ্গে তার মেল-বন্ধন সুখের কি দুঃখের সে হিসেব মেলাতে বসা আজ হয়ত অনর্থক নাও হতে পারে, তবে সে ইচ্ছেটা সব সময় মানুষের থাকে না। ফিরোজের একবারও ইচ্ছে করে না হায়াত খান লেনের সেই বাড়িটার মধ্যে দুঃখের খন্ড-মুহূর্তগুলিকে গেঁথে সাজাতে। কলকাতার সৌখিন আলো-হাওয়া সে বাড়িটাকে পছন্দ করে নি। তারা সারাক্ষণ সে বাড়ির দুয়োর-জানলা এড়িয়ে চলত। কিন্তু ফিরোজের মনের জগৎ একটা আছে না। যেখানেও আলো-হাওয়া বিস্তর। তাঁর মনের সেই আলো-হাওয়ারা আজো সেই হায়াত খান লেনের বাড়িটাকে ঘিরে চির অভিসারিকা। কলকাতাকে কি ভোলা যায়? এখনো কোন তারা-ভরা রাতের নির্জন ছাদে চিত হয়ে শুয়ে অতীত সম্ভোগের মধুর মুহূর্তে মনে পড়ে— কলকাতা ঝরে এক ফোঁটা মধু অসীমের শতদলে। কথাগুলোকে সুর দিয়ে গাইতে ইচ্ছে করে। এবং গান পারেন না ব'লে আফসোস হয়। সেই কলকাতা।

ভাষা আন্দোলনের পরের বছর ছোট ভাইকে কলকাতা পড়তে পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর এক মুসলিম লীগের আত্মীয় তখন তাতে আপত্তি তুলেছিলেন এই ব'লে—

'কলকাতায় যা পড়বে তা এই ঢাকাতেও সে পড়তে পারে। যে ডিগ্রী কলকাতা দেবে তা এখন ঢাকাতেও পাওয়া যায়। অকারণে তবে কলকাতা-মুখি হও কেন?'

'এই জন্য যে, ঢাকায় লেখা-পড়া ক'রে একটা ডিগ্রীই শুধু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত হওয়া যায় না। এখানে ডিগ্রীধারী অশিক্ষিত লোকে দেশ

ছেয়ে যাচ্ছে দেখছ না? দেশের মধ্যে কেবল শিক্ষিত হচ্ছে সেই ক'টি লোক যারা বিদেশ যেতে পারছে।'

মতটা একান্তই ফিরোজের। এবং কিছুকাল আগে পর্যন্তও ফিরোজের মধ্যে এ বিশ্বাসের কোনো ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায় নি। তবু সাম্প্রতিক কালে ঢাকা শহরের গায়ে কিছু কিছু আন্তর্জাতিকতার ছাপ পড়তে শুরু করলে তার সেই বিশ্বাসও একটু একটু ক'রে ফিকে হয়ে আসছে। তা হলেও এখনো তাঁর মনে কলকাতার স্মৃতি কেমন একটা সুখানুভূতির উজ্জীবন ঘটায়!

বাঙালির এই অনুভূতিটাকে ওরা চেনে না। চট ক'রে ভুল বোঝে। ফজলুল হককেও ভুল বুঝেছিল ওরা। পশ্চিম পাকিস্তানিদের পক্ষে ওটাই স্বাভাবিক। ফিরোজ ভাবেন! অন্যের মনকে বুঝতে গেলে নিজেরও একটা মন লাগে না? ধর, যাদের মন নেই সেই পশুদের কথা। পশুদের শ্রেষ্ঠ সম্বলই হচ্ছে নখর। আর প্রবৃত্তি দুটি—ক্ষুধা ও রিরংসা। কথাগুলি ইদানিং গভীর ক'রে চেপে ধরেছে ফিরোজকে। দেশের দুই অংশ—পূর্ব ও পশ্চিম। মধ্যে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানটা কি কেবলি ভৌগোলিক? পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে আমাদের নৈকট্য কেবলি ভৌগোলিক তো নয়। তবু পশ্চিম বাংলা বিদেশ। এবং চোখে দেখা সত্য। মনের সত্য হ'তে গেলে যে উপাদান লাগে তার উপস্থিতি কই ঠাহর করা তো যায় না। চিন্তাটা দীর্ঘদিন ফিরোজের হৃদয় মথিত করেছে। পরে এক সময় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে বাস্তব কর্তব্যবোধে। অন্যায় অবিচারকে পিটিয়ে দূর করার কর্তব্যে নামতে হয়েছে অগত্যা।

ফিরোজ সেইদিন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সঙ্গত কারণেই। মানুষ কি শালা রাষ্ট্র নামক যন্ত্রটার কাঁচামাল? —মনে মনে মুখ খিস্তি করে কাকে গাল দিয়েছিলেন তিনি জানেন না। তবে খুবই বিষণ্ন ও অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে বিশ্বস্ত ভৃত্যের, কিছুটা বন্ধুরও। কিন্তু প্রভুর ভূমিকা কিছুতেই নয়। এমন কি সে প্রভু খুব ভালো হ'লেও না।

'কিন্তু একটি ব্যতিক্রম আছে।' ফিরোজের এক বন্ধু রসিকতাচ্ছলে তর্ক তুলেছিলেন, 'আয়ুব খান নিজেকে প্রভু নয়, বন্ধুবলে জাহির করেছিলেন। অতএব তোমার...'

বন্ধুকে বক্তব্য শেষ করতে না দিয়ে ফিরোজ বলে উঠেছিলেন—

'ওইটে হচ্ছে চোরের লক্ষণ। ঠাকুর ঘরে কে? কলা খাইনি। তোমাদের আয়ুবের অবস্থা হয়েছিল তাই।'

সেইদিন এমনি রাজনৈতিক বিতর্কে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করেছিলেন ফিরোজ। সেই প্রথম, কিন্তু শেষ নয়। বরং তিনি তারপর থেকে আরো বেশি করে রাজনীতি সচেতন হয়েছেন। চিরদিন এমনটা অবশ্যই ছিলেন না। কবিতা গান আর বাংলার আকাশ ও প্রকৃতি—এই ছিল তাঁর বাঁচার অবলম্বন। ধানমন্ডির ছোট বাড়িটা পৈতৃক। এবং ঐ বাড়িটাই। সরকারী চাকরি থেকে

অবসর নিয়ে ঐ বাড়িটাই তার আব্বা করতে পেরেছিলেন ছেলে-মেয়েদের জন্য। তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এবং ফিরোজের একমাত্র ভাইটি পাকিস্তান সরকারের বিদেশী দূতাবাসে চাকরি নিয়ে বর্তমানে নাইজেরিয়াতে অবস্থান করেন। অতএব এই পৈতৃক বাড়িটা বর্তমানে একা ফিরোজের দখলে। মা তো আগেই গেছেন, আব্বা গেছেন বছর দুই হ'ল। বন্ধ্যা স্ত্রী এবং সরকারী প্রচার দপ্তরে একটি ছোট চাকরি নিয়ে বেশ ছিলেন এতোকাল। সুখের সংসার।

সুখের সংসার বৈ কি! আর কি চাই জীবনে। হা, আরো চাই। বই চাই। ভালো কবিতার বই। বিদেশী কবিতার বইয়ে ষোল আনা সুখ হয় না। কবিতার স্বাদ মাতৃভাষাতেই সম্ভব—একান্তভাবে ফিরোজের কথা এটি। হয়তো আরো অনেকের কথা। কিন্তু ফিরোজ বলেন—

'বিদেশের কবিতা মাত্রই আমাকে অনুবাদে বুঝতে হয়। কিন্তু কবিতার অনুবাদ হয় না।'

সুদীপ্ত এ যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। তিনি ইংরেজির অধ্যাপক হলেও ইংরেজি কবিতা সব সময় বুঝেছেন মনে মনে মাতৃভাষায় অনুবাদ ক'রে। ভাগ্যিস বাংলা তার মাতৃভাষা। তাই অন্য ভাষায় কবিতা তবু কিছুটা বুঝা যায়। কিন্তু তার মাতৃভাষা পাঞ্জাবি হলে? নিশ্চয়ই কোন পাঞ্জাবি কখনো শেলি কীটস কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতা বোঝে না। তা বুঝলে কি এমন করে মানুষ মেরে বেড়াতে পারে। আমেরিকানরা করেনি মাই-লাই কান্ড? কিংবা, বৃটিশরা জালিয়ানওয়ালাবাগ? না, কথা তা নয়। যাদের মাতৃভাষা দুর্বল তারা তাদের চেয়ে উন্নত ভাষায় কবিতা মোটামুটি বুঝবে না। না, কথা তা নয়। যাদের মাতৃভাষা দুর্বল তারা তাদের চেয়ে উন্নত ভাষার কবিতা মোটামুটি বুঝবে না। কিন্তু এও ঠিক যে, একটা একটা জাতির সব মানুষই কবিতা রসিক হয় না। তাই উন্নত জাতির মধ্যেও বর্বর থাকে। এবং সেই বর্বরতার বিরুদ্ধে আপত্তি সভ্য জাতি হ'লে সে নিজেই তোলে। মাই-লাই-এর বিরুদ্ধে প্রথম কথা বলেছেন একজন আমেরিকানই। ওয়ারেন হেষ্টিংসের অপকীর্তির সমালোচনা বৃটিশরাই করেছিল। পাঞ্জাবিরা হ'লে করত না। মানে, করতে ইচ্ছে করত না এমন নয়। তা করতে হ'লে যে মন লাগে সেইটেই তাদের নেই। অনেকেরই মন থাকে না। হা, থাকে শুধু ক্ষুধা ও রিরংসা।

এহেন পাঞ্জাবিদের কবলে বাঙালি জাতি?—জিজ্ঞাসা তীব্র হয়েছিল ফিরোজের মনে। এবং রাজনীতির ইচ্ছে জেগেছিল। আর্টের চর্চা ভালো। কিন্তু ভালোটাই কি সব সময় সংসারে চলে? অনেক ভেবে এক সময় তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং ব্যবসা শুরু করেছিলেন এবং রাজনীতি। ভদ্রলোক খুব একটা ঝুকি নিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তবু জিতেছিলেন। সে ইতিহাস অনেক গভীর, এবং কিছুটা অপকীর্তিরও। বেশ কিছু অপকীর্তি শিখেছিলেন ফিরোজ। তা নইলে টাকা হয় না। টাকা না হ'লে অধমদের সঙ্গে রাজনীতি চলে না! তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন।

না বুঝে তো উপায় ছিল না। কি নিয়ে বাঁচবেন! দেশ নিজের না হ'লে কোনো মতেই বাঁচা যায় না।

'দেশটাকে আগে নিজের কর, তারপর হবে শিল্পসাহিত্যের চর্চা।'

দেশ নিজের নয়? না। কথটা বন্ধু ঠিক বুঝেননি। ফিরোজ তাঁকে বোঝালেন—

'পাঞ্জাবিদের পঞ্চনদের স্বার্থে কাশ্মীর দরকার। অতএব ভারতের সাথে বিরোধ কর। সে বিরোধে পূর্ব বাংলা উচ্ছন্নে যায় যাক। দেশের রাজনীতি ও রাষ্ট্রক্ষমতা বাঙালির হাতে থাকলে এমন অপূর্ব যুক্তিমালার সৃষ্টিই হত না।'

'তোমার সাথে তর্ক নেই,' বন্ধু বললেন—কথা হচ্ছে, সব কাজ সকলে পারে কি না।'

'সাহিত্যিক সব পারে।'

ইচ্ছে করলেই পারে। গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ কত কাজ পেরেছিলেন সে হিসেব রাখ? বন্ধুকে বুঝিয়েছিলেন ফিরোজ। তিনজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করে ফিরোজ দেখিয়ে দিয়েছিলেন—যুদ্ধ বা রাজনীতি কোনটাতেই সাহিত্যিকের রুচি ও পারদর্শিতা কারো চেয়ে কম হতে পারে না। তা ছাড়া যদি বল, ঐ সবে নামলে সাহিত্য-শিল্পের চর্চায় বিঘ্ন ঘটবে, আমি সেই অবস্থাটা মেনে নিতে রাজি আছি।

'সুকুমার চিত্তবৃত্তির হানি ঘটবে? আমার মতো ক্ষুদে সাহিত্যিকের সুকুমার চিত্তবৃত্তির সমূলে ধ্বংস হয়ে গেলেও জাতির কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমি যদি দুশমনের উপর একটা গুলি ছুঁড়তে পারি তাতে দেশের অনেক লাভ।'

'তুমি গুলিও ছুঁড়বে নাকি!'

'তেমন দিন এলে ছুঁড়তে হবে বৈ কি।'

কিন্তু তেমন দিন যতদিন না আসছে ততদিন করবেন কী? রাজনীতি ও ব্যবসা। রাজনীতিতে নামবেন—ক'দিন থেকেই কথাটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছিলেন। এমন সময়ই চিঠিটা এল। কোন প্রচন্ড চিঠি নয়। কিন্তু ফিরোজর ক্ষোভটা প্রচন্ডই হয়েছিল। ব্যাপরাটা ঘটেছিল একখানা বই নিয়ে।

কবি সত্যব্রত সেন ফিরোজর বন্ধু। পঞ্চাশের দশকে কবিতা লিখে কলকাতায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এবং এ কালের প্রথা অনুসারে উঠতি ছোকরাদের কাছে ষাটের দশকে এসে সম্পূর্ণ সেকেলে প্রমাণিত হয়েছেন। তবু ভয়ে ভয়ে দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ বের ক'রে বন্ধু ফিরোজকে এক কপি উপহার পাঠিয়েছেন! কলকাতার কবি ঢাকার বন্ধুকে বই পাঠাবে—এটা নিঃসন্দেহে পাকিস্তানকে বানচাল ক'রে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। নাকি অন্য কিছু ভেবেছিল পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ। দেড় পৃষ্ঠা ব্যাপি টাইপ করা একখানা চিঠি এসেছিল। পাকিস্তানি কাস্টমস্ বিভাগ থেকে লেখা চিঠিতে ফিরোজের কাছে জানতে চাওয়া হয়ছে—কোন্ অধিকার বলে মহীউদ্দিন ফিরোজ ভারত রাষ্ট্র থেকে বই

আমদানী করেছেন? এ সম্পর্কে তাঁর কোন লাইসেন্স আছে কি না? থাকলে সেই লাইসেন্স তিনি কবে থেকে পেয়েছেন? ইত্যাদি।

বই হাতে পান নি, চিঠি হাতে চুপ ক'রে কিছুক্ষণ ব'সে থাকলেন। মনে, মনে হাসবেন? নাকি গাল দেবেন? এলাহাবাদ থেকে লাহোরে কেউ উর্দু বই পাঠালে কি এমন চিঠি আসত? নিঃসন্দেহে আসত না। যতো আক্রোশ বাংলা বইয়ের উপর। বিশেষ করে কলকাতার বাংলা বই। কলকাতার বাংলা বইয়ে কি ওলা ওঠার বীজ থাকে? নাকি ওগুলো সব বিছুতির পাতা? আমরা তোমাদের শরীরে ঘ'ষে দেব বলে ভয় করে? সরেফ ওটা হারামীপানা। হারামী রাসকেলরা বাঙালিদের সকলকে খোট্টা বানাতে চায়।—মনে মনে সারাদিন গাল দিয়েও গায়ের জ্বালা যেন জুড়োতে চায় না। কিন্তু সব জ্বালাই তবু জুড়োয়। বিছের কামড়ও এক সময় ঠান্ডা হয়ে আসে। ফিরোজও এক সময় ঠান্ডা হলেন। এবং তখনি চিন্তাটা সচ্ছ হ'ল। রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙালির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হ'লে এই অন্যায়ের অবসান হবে না। সেইদিন থেকেই ফিরোজ সক্রিয় রাজনীতিতে নেমেছেন। নামার চিন্তাটা অবশ্য করেছিলেন কয়েক বছর আগে থেকেই।

গত নির্বাচনে ফিরোজ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন। আওয়ামী লীগ এবার বাঙালি শোষণের অবসান দেখাতে চায়। ভালো মানুষ দেখলেই অমানুষদের জিব লক্ লক্ ক'রে ওঠে। এবার ওঠাচ্ছি। পাকিস্তানের দু অংশের মধ্যে হাজার মাইলেরও বেশি ব্যবধান—অতএব দু অংশকেই হতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোন অংশকেই অন্য অংশের উপর নির্ভরশীল করা চলবে না।

কিন্তু একটা ভালো মানুষের যুক্তি। এ যুক্তি মানতে হ'লে তো ভালো মানুষ হ'তে হবে। কিন্তু ভালো মানুষ কি ইচ্ছে করলেই হওয়া যায়? রক্তের মধ্যে তার বীজ থাকতে হবে না! এই গোড়ার কথাতেই ভুল করেছিল আওয়ামী লীগ। কি আশ্চর্য। শিশুর মতো তোমরা বিশ্বাস করলে আলাপ আলোচনার দ্বার খুলে রাখলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

'কচু হবে। এহিয়া তোমাদের কলা দেখাবে।'

ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ সাহেবের আলোচনা চলাকালেই মন্তব্য করেছিলেন ফিরোজ। বঙ্গবন্ধু শেখ সাহেব একজন খাঁটি বাঙালি। তাই সরল। এবং সরলভাবেই প্রতারিত হচ্ছেন। ফিরোজ মনে করেন। কিন্তু সকলে এ কথা মনে করেন না। তাঁদের মতে—

'নিজের বেকুবীর জন্য নিজেই প্রতারিত হবেন ইয়াহিয়া। এবং ধ্বংস করবেন সারা পাকিস্তানকে।'

সারা পাকিস্তানের মানুষকে কি পরিমাণ প্রতারণা তিনি দিয়েছেন একদিন ইতিহাস সে কথা বলবে। পঁচিশে মার্চের বিকেল পর্যন্ত কথাবার্তা কোন্ পর্যায়ে

ছিল? বাইরের লোক সে কথা জানে না। ইয়াহিয়ার ইচ্ছাতেই সে কথা জানাতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আওয়ামী লীগের অন্দর মহলের লোক হয়ে ফিরোজ তো সব জানেন। তাঁর জানা ছিল, ঐদিন সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া ভাষণ দেবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে লেলিয়ে দিলেন সেনাবাহিনী।

ইয়াহিয়ার ভাষণে অবশ্যই আশাপ্রদ কিছু থাকবে না, ফিরোজ জানতেন। এবং জানতেন, কিছুকাল একটা রাজনৈতিক অচলাবস্থার মধ্যে দেশকে হাবুডুবু খেতেই হবে। কিন্তু সেই সময়টা? এবং তারপর? সেই সময় আমাদের কর্তব্য কি হবে? এবং তারপরেই বা দেশের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

পরের কথা পরে ভাবা যাবে, আপাতত চল ইয়াহিয়া কি বলেন শোনা যাক। বন্ধুর কথায় রাজী হয়েছিলেন ফিরোজ। এবং সেই সন্ধ্যায় সকলে তাস নিয়ে বসেছিলেন—সামনে রেডিও। কিন্তু রেডিও বলে না কেন যে, আজ রাত—টার সময় প্রেসিডেন্ট দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন! সকলেই যখন প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের জন্যে উদগ্রীব তখনি এল খবরটা। খবর পাওয়া গেল—

'ইয়াহিয়া সেনাবাহিনীকে শহর দখলের আদেশ দিয়েছেন।'

আওয়ামী লীগের একজন স্বেচ্ছাসেবক খবরটা এনেছিল। শুনেই হাতের তাস খ'সে পড়ল ফিরোজের। এই প্রথম খুব ভালো তাস পেয়েছিলেন। টেক্কা-সাহেব-বিবিসহ ডায়মন্ডের সাতখানা, এ ছাড়া বিভিন্ন রঙের আরো দুই টেক্কা এক সাহেব ও তিন বিবি। এমন চমৎকার তাস সচরাচর হয় না। ভারি উৎফুল্ল হয়েছিলেন ফিরোজ। কিন্তু পরমুহূর্তেই সব উৎসাহ আনন্দ নিভে গিয়েছিল। সেনাবাহিনীকে শহর দখলের আদেশ দেওয়া হয়েছে?

'দখলের আদেশ? কেন? শহর কি তা হলে বেদখলে ছিল এতকাল? শত্রু কবলিত শহরে ইয়াহিয়া তা'হলে এলেন কি ক'রে ? আর সেখানে একদিন দুদিন নয়, প্রায় দু'সপ্তাহ তিনি কাটালেন বহাল তবিয়তে। কি ক'রে সম্ভব হল শুনি?

ঐটাই বাঙালিদের দোষ। চট্ ক'রে যুক্তির কোটরে ঢুকে প্রশ্ন তুলে ধরতে চায়। কিন্তু ঐ সব প্রশ্ন-ট্রশ্ন চলবে না।

সত্যিই তখন কোনো প্রশ্নের কিংবা চিন্তার অবকাশ খুব ছিল না। ফিরোজ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? রাস্তায় ব্যারিকেড। বড়ো বড়ো গাছ কেটে রাস্তায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়েছে। এরি মধ্যে? এতো শীঘ্র

এতো বিরাট গাছটাকে আনল কেমন ক'রে ? আর জনগণ জানলই বা কেমন ক'রে যে, এখনি এই রাতে এসবের প্রয়োজন ! দেশবাসী তবে অনেক এগিয়ে গেছে। বিকেলেও তিনি এই পথ দিয়ে পল্টন ময়দানের জনসভায় গিয়েছিলেন। বিকেলেও যথারীতি জনসভা হয়েছে ন্যাপের। মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সমর্থন জানিয়েছে আওয়ামী লীগকে। বুড়ো বয়সে মাওলানা সেদিন ঘোষণা করেছেন, শেখ মুজিব তাঁর সন্তানতুল্য। না, পঁচিশ তারিখের জনসভায় নয়। সকলেই তো জানে, পঁচিশ তারিখের জনসভায় মাওলানা উপস্থিত ছিলেন না। ঢাকাতেই ছিলেন না। অসুস্থ হয়ে সন্তোষ চলে গিয়েছিলেন। কয়েক দিন আগের অন্য এক জনসভায় বলেছিলেন, শেখ মুজিব আমার সন্তানতুল্য। ঠিক বলেছিলেন। একটা দলের সাথে দ্বিমত যতোই থাক, দেশের স্বার্থ নিয়ে কথা বটে। সেখানে কোনো মতভেদ দিয়ে কথা ওঠে নাকি! এই বৃদ্ধ বয়সেও মাওলানার চিন্তায় কোনো অস্বচ্ছতা নেই। এখন দলের নয়, দেশের স্বার্থ নিয়ে কথা বল। দেশের স্বার্থ নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছে আওয়ামী লীগ। তুমি দেশ প্রেমিক হ'লে অবশ্যই তাকে সমর্থন জানাবে। সোজা কথা। বিভিন্ন আওয়ামী পার্টি, ন্যাশনাল লীগ এখন তাই শেখ সাহেবের সঙ্গে। সঙ্গে নেই জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, পিডিপি আর মুসলিম লীগের বিচিত্র শাখা। এই দলগুলো কি চায়? ঠিক কি যে চায় ফিরোজ বুঝতে পারেন না। ইসলামকে বঁচানোই নাকি এদের লক্ষ্য। যতো সব রাস্কেলের দল। আরে বাবা, ইসলামকে বাঁচানোর জন্য তোরা পাকিস্তান বানিয়েছিলি। কিন্তু ইসলামের অনুসারী অর্ধেক মানুষকেই তো হিন্দুস্থানে ফেলে পালিয়ে এলি তোরা। হ্যাঁ, সেই হিন্দুস্থানে যেখানে তোদের মতে, ইসলাম বিপন্ন। ইসলামের অর্ধাংশকে বিপন্ন করে বাকি অর্ধাংশ বাঁচাতে হবে— এ কোন্ ধরনের পলিটিক্স রে বাবা! আস্ত হাবারামের পলিটিক্স। পলিটিশিয়ানকে খানিকটা দার্শনিকও হ'তে হয়। না ভাববাদি দার্শনিকের কথা হচ্ছে না। সমাজ-বিজ্ঞান ও ইতিহাস-চেতনার উপর দাঁড়িয়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা ক'রে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সে সিদ্ধান্ত সাময়িক ভাবে সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্ট-বিরোধী হ'লেও যিনি তাতে পিছিয়ে যাবেন না তিনিই সত্যকার দেশ-নেতা। সাধারণ মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধির কাছে তিনি নিজের বক্তব্য পৌঁছে দেবেন, কখনো তাদের সেন্টিমেন্টকে উত্তেজিত ক'রে নিজের নেতাগিরি বজায় রাখবেন না। চিন্তা ক'রে ফিরোজ দেখেছেন, প্রকৃত দেশ-নেতার এই গুণাবলি দেশ-ভাগের সময় ছিল অতি অল্প কয়েকজনের মধ্যেই। মুসলিমদের মধ্যে ছিল কেবল মাওলানা আজাদের মধ্যে। কিন্তু জিন্নার অনুগামীদের বক্তব্যটা বর্তমানে কী?

'যেখানে সবটাই ধ্বংস হয়ে যেত সেখানে কায়েদে আজম তবু অর্ধেকটা বাঁচিয়েছেন।'

যুক্তিটা ছিল অধ্যাপক গোলাম কবীরের। নেজামে ইসলামের নেতা

অধ্যাপক গোলাম কবীর। নিজেই তিনি নামের আগে অধ্যাপক লেখেন। কিন্তু কখনো নাকি অধ্যাপনা করেন নি—লোকে বলে। অবশ্যই তারা দুষ্ট লোক। এবং ইসলামের শত্রু। প্রকৃতপক্ষে গোলাম সাহেব অধ্যাপনা করেছেন। তবে কোনো কলেজে নয়, মাদ্রাসায়। কোনো এক আলেয়া মাদ্রাসায় তিন বছর তালবিলিম পড়িয়েছেন। ফাজেল ও টাইটেল ক্লাসের তালবিলিম। টাইলের মরতবা কিছু বোঝ? টাইটেল হচ্ছে এম.এ. এর সমান। অতএব এম.এ. ক্লাসের ছাত্র পড়িয়েছেন গোলাম সাহেব। এম. এ. ক্লাসের ছাত্র যিনি পড়িয়েছেন তিনি অধ্যাপক না হবেন কেন? অতএব মৌলভি গোলাম কবীর অধ্যাপক গোলাম কবীর হয়েছেন। এখন তিনি একজন প্রচন্ড নেতা। এবং ঈমানদার নেতা। তাঁর কথায় চললে ঈমান পাকা হয়। কিন্তু ফিরোজ অধ্যাপক গোলাম সাহেবের কথা মনে নিয়ে ঈমানদার হ'তে চান নি। বলেছিলেন—

'কিন্তু যে অর্ধেকটা আপনাদের কায়েদে আজম বাঁচাতে চান নি, সেই অর্ধেকটাই দেখছি বেঁচে আছে। আর মরে যাচ্ছি আমরা। এই মোজেজাটা ঠিক বুঝতে পারি নে।'

ফিরোজের কথায় বারুদ অবশ্যই ছিল না। কিন্তু গোলাম সাহেবের মনে তা বারুদের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। প্রচন্ড স্বরে ব'লে উঠেছিলেন—

'মোজেজা? মোজেজা কি বুঝেন আপনারা? না-পাক জবানে ঐ শব্দ উচ্চারণ করবেন না।'

'তা না করলেও আমার কথাটার জবাব তো আপনাকে দিতে হবে। না, তাও দেবেন না।'

'না দেবো না। আবোল-তাবোল একটা কিছু বললেই তার জবাব পাওয়া যায় না। হিন্দুস্থানে খাঁটি মুসলমান হয়ে বাঁচা যায় এ কথা দুনিয়া জাহানে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'ভারতের অতগুলো মুসলমান তা হ'লে ?

'হিন্দুস্থানের মুসলমানগুলো ধীরে ধীরে সব হিন্দু হয়ে যাবে।'

'একেবারেই হিন্দু হয়ে যাবে। গুণা হবে না তাতে? এবং গুণা হলে সেটা হবে কার? আপনাদের সেই কায়েদে আজমের না ?

বলাই বাহুল্য, এ কথায় ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন গোলাম সাহেব। লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করেছিলেন। হাঁ, গোলাম সাহেব বেড়াতে বেরুনোর সময় ছড়ি ব'লে যেটাকে সঙ্গে নেন সেটা জাতে লাঠিই বটে। অমন যার বহর তার নাম ছড়ি হয় কি ক'রে? লম্বায় প্রায় চার ফুট বিশুদ্ধ শালের সেই গোল কাষ্টখন্ডের ব্যাস দেড় ইঞ্চির কম নয়। ফিরোজ সেদিন হাস্যকরভাবে দৌড় দিয়ে মাথা বাঁচিয়েছিলেন।

আজো কি তেমনি দৌড়াবেন? সেনাবাহিনী আসছে শহর দখল করতে। শহরের রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে সাধারণ মানুষ বাধা দিতে এগিয়েছে। না,

ফিরোজের হাসি তো পায় নি । নিরস্ত্র মানুষ ব্যারিকেড দিয়ে গতি রোধ করবে কার? আধুনিক সেনাবাহিনীর? ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে হাস্যকর। এবং বাইরের লোক হ'লে তিনি হাসতেনই। কিন্তু ফিরোজ হাসবেন কি ক'রে? এ তো খেলা নয়। অসহায় মানুষের বাঁচবার চেষ্টা। সেই সাতচল্লিশ সাল থেকে গায়ের জোরে আমাদের গলায় আঙুলের চাপ কষতে শুরু করেছে ওরা। টুঁটি টিপে ধরলে মানুষ কতক্ষণ বাঁচে! বাধা দিতেই তো হবে। হয় মুক্তি,না হয় মৃত্যু। দেশবাসী কি বিনা প্রতিবাদে নিঃশব্দে মরবে। অন্ততঃপশ্চিম পাকিস্তানিরা তাই চায়।

ব্যারিকেডের সামনে ফিরোজ গাড়ি থেকে নামলেন। পথের এক পাশ থেকে রাইফেল হাতে একটি যুবক এগিয়ে এলো! সালাম দিয়ে সামনে দাঁড়াল। তাঁদের পাড়ার ছেলে। এতএব চেনা ছেলে। সস্তা দামের সিগারেট খেত, আর ঘুরে বেড়াত। কাজ কিছু করত কি না ফিরোজ জানেন না। শোনা যায় সিনেমা হলের দ্বাররক্ষকের কাজ পেয়েছিল কিছুদিন আগে। সাতই মার্চের পর তা ছেড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিল। ভারি কাজের ছেলে! কিছুকাল আগে একবার কলেজের দুটি ছোকরা পাড়ার একটি মেয়ের পিছু নিয়েছিল, এবং অশালিন মন্তব্য করেছিল। এই ছেলেটাই সেদিন কলেজের ছেলে দুটিকে বেধড়ক মার দিয়েছিল না! হাঁ সে একাই সেদিন দুটি ছাত্রকে পিটিয়েছিল। তোমার সাথে যার পীরিত নেই তার পিছু ধাওয়া ক'রে তাকে নাহক দশ কথা শোনাবে, আমরা পাড়ার ছেলে হয়ে এটা ছেড়ে দেব। সেদিন কলেজের ছেলে দুটিকে সে অমনি ছেড়ে দেয়নি।

এবং বর্বর পাকিস্তানি সেনাদেরকেও সে আজ অমনি ছেড়ে দেবে না।

'ওরা আমাদের মারতে আসছে স্যার। কম ক'রে হ'লেও পাঁচজনকে মেরে মরব।'

ভাই আমার, মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে পারার এই সাহসটুকুই তোদের বাঁচাবে। কিন্তু এমন ক'রে ম'রে কিছু লাভ তো হবে না। শত্রুকে আঘাত করতে হবে তখনি যখন জয়ের সম্ভাবনা থাকবে। নিশ্চিত ধ্বংসের সম্ভাবনার মুখে শত্রুকে বাধা দিতে নেই। তখন কেবল খোঁচা দিতে হবে গোপনে গাঁ বাঁচিয়ে। খোঁচা দিয়ে দিয়ে রক্ত ঝরিয়ে কাবু ক'রে ফেলতে হবে। কিন্তু কথাগুলি এই মুহূর্তেই ফিরোজ বলতে পারলেন না। এই প্রচণ্ড উৎসাহের আগুনে জল দেওয়া কিছুতেই উচিত কর্ম ব'লে তাঁর মনে হ'ল না। তিনি কেবল বললেন—

'হাঁ ওরা আসছে। কিন্তু আমাদেরকে মারতেই যে আসছে সেকথা কে বলল? ফিরোজের এ কথায় কোন চাতুরি ছিল না। এবং শুধু তিনি কেন, কারো মনেই সেই সন্ধ্যায় কোন সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও ছিল না যে, ওরা নির্বিচার গণহত্যার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আসছে। আস্থা অসামরিক শাসন-কর্তৃপক্ষের আয়ত্তের বাইরে ব'লে সেনাবাহিনী শাসন-ভার নিজের হাতে নিতে চায়, কিন্তু সাধারণ

নাগরিককে সেজন্য তারা মারতে চাইবে কেন? এ প্রশ্নের জবাব সেই বাউণ্ডেলে ছোকরার জানা নেই। সে নিজের বিশ্বাসকেই ব্যক্ত করল—

'দেখবেন স্যার, ওরা এখন ক্ষ্যাপা কুত্তা হয়ে গেছে। এখন ওরা ঘরে ঢুকে আমাদের মারবে। তা ঘরের মধ্যে মরার চেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে দু-একটাকে মেরে মরা ভালো।'

ঘরে ঘরে ঢুকে আমাদের মারবে। কথাটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। কিন্তু মনে তবু খটকা লাগল কেন?

অবশ্য ফিরোজের মনে অন্য ধরনের একটা সন্দেহ ছিল। আলোচনার প্রথম দিকেই ইয়াহিয়া যে সামরিক শাসন তুলে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য ছিল? হায় হায়, মানুষ এতো ভণ্ডও হয়! দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে তুমি যখন বললে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তোমার আগ্রহের জুড়ি নেই তখন আওয়ামী লীগ সে কথা অকপটভাবেই বিশ্বাস করেছিল। তারপর? যে সন্ধ্যায় তোমার জনগণের কাছে ভাষণ দেবার কথা সেই সন্ধ্যায় তুমি লেলিয়ে দিলে সেনাবাহিনী। না, সে জন্য আমরা অবাক হই নি। পুরোপুরি বিশ্বাস তোমাকে আমরা কোনো সময়ই করি নি। সন্দেহ একটা মনে মনে ছিলই। কিন্তু যে সন্দেহটা কোনো সময়ই মনে ছিল না এখন যে সেইটেই দেখা দিল। ওরা ঘরে ঘরে ঢুকে আমাদের মারবে। সত্যি নাকি! বিশ্বাস ক'রেও বিশ্বাস করলেন না ফিরোজ। তিনি বাসায় ফিরে এলেন।

বাসায় ফিরেই ফোন ধরলেন। ডায়াল ঘুরিয়ে ঈপ্সিত কণ্ঠ পাওয়া যেতেই বললেন—

'হ্যালো, সব শুনেছেন তো? ....'

কিছু ভেবে পাচ্ছি নে কি করব। আপনি কিছু দিক-নির্দেশ করতে পারেন?

বঙ্গবন্ধু ঠিকই বলেছেন। তিনি এখন সরে পড়লে তাঁর খোঁজে সারা ঢাকা শহর খবিশরা তছনছ করে ছাড়বে।

'তা ঠিক। আমাদের দুর্গতি যতোই হোক, সবের বিনিময়ে এখন বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করা কর্তব্য। আপনারা তাঁকে শীঘ্র সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করুন।'-----

'না তাঁর কথা শোনা হবে না। ওই বর্বরদের হাতে পড়লে এবার তাকে বাঁচানো দায় হবে।'

পাকিস্তানি জালেমদের হাতে এবার বঙ্গবন্ধুকে পড়তে দেওয়া হবে না কিছুতেই। মনে মনে কিছুক্ষণ ছটফট করলেন ফিরোজ। না, মুজিব ভাই বোধ হয় কথা শুনবেন না। ঐ কথাটা একবার যদি তাঁর মাথায় ঢুকে থাকে যে, তাঁকে না পেলে ওরা সাধারণ নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করবে তা হ'লে তাঁকে নড়ানোর সাধ্য কারো হবে না। কিন্তু তাঁর বেঁচে থাকা যে দরকার। আমরা না হয় কিছু মরলাম, কিন্তু তিনি যদি বাঁচেন ..... । আল্লাহ, তিনি যেন নিরাপদে পালিয়ে বাঁচেন — সেই রাতে এই প্রার্থনা শুধুই ফিরোজের ছিল না, বঙ্গবাসী

প্রায় সকলেই কেউ জ্ঞাতসারে কেউ বা নিজের অজ্ঞাতেই শেখ মুজিবের নিরাপত্তা কামনা করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান — শুধুই একটি নাম তো নয়, তা যে বাঙালির আত্মমর্যাদার প্রতীক। এবং আনন্দময় জীবনেরও ।

আর আটাশে মার্চের মধ্যাহ্নে বন্ধু সুদীপ্ত শাহিনের মুখোমুখি বসে ঐ রাতের কথা ফিরোজ স্মরণ করলেন। তার আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। মুজিব ভাই কারো কথা শুনেন নি। ঢাকা ছেড়ে যেতে রাজি হন নি। ধরা দিয়েছেন। আমার দেশের মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে আমি নিরাপত্তার সন্ধানে বেরুব। অসম্ভব। এমন মানসিকতা বহন করতে পারেন একমাত্র বোধহয় ঐ লোকটিই। অন্ততঃ পাকিস্তানে আর-কেউ তা পারেন নি। জিন্না-লিয়াকত আলি ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থনে পাকিস্তান আদায় ক'রে তাদেরকে কি ভাবে কলা দেখিয়েছিলেন সে কথা তৎকালিন কলকাতার অধিবাসী ফিরোজদের তো জানা আছে ভালোভাবেই। তাঁদের পিছে পিছে ভারতের পুঁচকে মুসলিম লীগ নেতারা এক দীর্ঘ লাফে কেউ করাচী, কেউ লাহোর কেউ ঢাকায় পাড়ি জমিয়ে দেশপ্রেমের যে নমুনা দেখিয়েছিল তা দেখবার মতো বৈ কি!

বেটারা, তোদের ভোটের দরকার ছিল, ভোট নিয়ে পাকিস্তান বানিয়েছি। এখন চললাম সে পাকিস্তানকে ভোগ করতে।

নেতাদের পেছনে পেছনে ভারতের চার-পাঁচ কোটি মুসলমান সকলেই যদি তখন বন্যার জলের মতো এসে পাকিস্তানে ঢুকত, তা হ'লে? সেই বন্যায় পাকিস্তানের অস্তিত্ব তলিয়ে যেত না! ভারতীয় মুসলমানরা সব আহাম্মক। আর হিন্দুরাও গবেট। মুসলমানগুলোকে সব পাকিস্তানের দিকে খেদিয়ে দিলে কেমন ক'রে জিন্নার কায়েদেআজমগিরি বজায় থাকত একবার দেখতাম।....নানা চিন্তায় ফিরোজকে বড়ই অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। ....শেষ পর্যন্ত সেই যুবকের কথাই সত্য হ'ল।

দেখবেন স্যার ওরা এখন খ্যাপা কুত্তা হয়ে গেছে। এখন ওরা ঘরে ঘরে ঢুকে আমাদের মারবে।

সত্যিই ওরা ঘরে ঘরে ঢুকে বাঙালিকে মেরেছে। আওয়ামী লীগের কোনো নেতা কি এতটা ভাবতে পেরেছিলেন? পারেন নি। অবশ্যই কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে এতোখানি নারকীয় কাণ্ড কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু সেই যুবকটির কল্পনা তো ঠিকই এগিয়েছিল। আজ সে যুবকের পরিণতি? সুন্দর ক'রে টেরি বাগিয়ে ড্রেনপাইপ ফুলপ্যান্ট পরে সস্তা দামের সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে পথে হাঁটত যখন! একটুও দেখতে ভালো লাগতো না। কিন্তু আজ?

ওরা আমাদের মারতে আসছে স্যার। ঘরের মধ্যে মরার চেয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে দু-একটাকে মেরে মরা ভাল।

আহা, তোমার কথাই সত্য হোক ভাই যদি ম'রে গিয়েই থাক, তবে তার আগে দু'-চারটে শত্রুসেনা তোমার গুলিতে যেন অক্কা পেয়ে থাকে। আহ্ অমনি

বখাটে ছেলে যদি বাংলা মায়ের আরো অনেক থাকতো। হাঁ, আরো অনেক। কেন? ভালো ছেলেরা সবাই সেদিন মায়ের আঁচলে লুকিয়েছিল নাকি! বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ভালো ছেলে প্রাণ দিয়েছে না। না না, কথা ভালো-মন্দ নয়। দেশকে ভালোবাসা নিয়ে কথা। বখাটে ছেলেরা তাদের মাকে ভালো বাসে না? এবং সব ভালো ছেলেই কি কাপুরুষ হয়? এখন তো ভালো-মন্দ বিচারের সময় নয়। এখন চাই মাতৃভক্ত ছেলে। আর সাহসী।

কিন্তু সুদীপ্তর মধ্য থেকে শুধুই সাহস নয়, প্রাণও যেন বিলুপ্ত হয়েছে। প্রাচীন মিসরের মমির মতো একজন ফ্যাকাসে সুদীপ্ত ফিরোজের সামনে সোফার উপর নিশ্চলভাবে প'ড়ে রইলেন। সুদীপ্তর স্ত্রী ঘরে এলেন। হাতের আঙুল ধ'রে পায়ে পায়ে এল তিন বছরের শিশু কন্যা বেলা। আব্বাকে দেখেই বেলা এবার মায়ের আশ্রয় ছেড়ে বাপের কোলে গিয়ে চড়ে বসল। এই বেলার কাছেই সুদীপ্ত পরাজয় স্বীকার করেছেন। এলা কিংবা অনন্ত কখনো তাদের আব্বার কাছে এতো প্রশ্রয় পায় নি। এলা তার বড় ভাই অনন্তর চেয়ে মাত্র দেড় বছরের ছোট। এবং এলার পাঁচ বছর পর বেলা। সুদীপ্তর বারো বছরের বিবাহিত জীবনে সন্তান এই তিনটিই। স্ত্রী আমিনা বললেন—

'নাও, তোমার মেয়েকে সামলাও । ও সেই নীলক্ষেতের বাসায় যাবে।'

কথাটা না বললেও চলত। কেননা বেলাই তার আব্বার গলা জড়িয়ে ধ'রে কানে কানে বলেছে—

'বাসায় যাবে না আব্বু।'

'ও কথা আমরা বিশ্বাস করব না ভাবী', ফিরোজ বললেন, 'আপনিই নিজের কথাটি কন্যাকে শিখিয়ে দিয়ে নিয়ে এসেছেন।'

অন্য সময় হ'লে এ কথার উত্তরে আমিনা কি বলতেন? হয়ত বলতেন ঠিকই তো করেছি। আপনি জানেন না, ছেলেপেলের মা হ'লে মেয়েরা সন্তানদের দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে নেয়। চটুলা রমণী আমিনার সাথে ফিরোজ কখনো কথায় পারেন নি। তাই ফিরোজ একদা মোক্ষম প্রশ্ন করেছিলেন—

'আচ্ছা, বলতে পারেন ভাবী, সুদীপ্ত মুখচোরাটা আপনার সাথে কথা বলে কি করে?'

'আপনার মতো ঠোঁটকাটা স্বামীর সাথে আপনার মুখচোরা লজ্জাবতীটি যেভাবে কথা বলেন ঠিক সেইভাবে।'

ফিরোজের স্ত্রী স্বভাবতই একটু লাজুক। তদুপরি বন্ধ্যা ব'লে সব সময়ই মনে বোধ হয় একটি বিষাদকে বহন ক'রেন। তাই কথা বলেন কম। ফিরোজের এটা পছন্দ নয়। কিন্তু সুদীপ্ত ভারী পছন্দ করেন স্বল্পভাষিণী মীনাক্ষী নাজমাকে। মীনাক্ষী নাজমা—ঠিক এই নামটাই আমিনার হওয়া উচিত ছিল। নিদেনপক্ষে মীনাক্ষী আমিনা। তা না, শুধু আমিনা খাতুন। বাপ-মা আর নাম পান নি। কিন্তু মীনাক্ষী নাজমা? অদ্ভুত নাম। কথিত আছে, ফিরোজ নাম শুনেই মেয়েটিকে পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু সে আজ সাত বছর আগের ঘটনা। মাত্র সাত বছর। সে আর কতটুকু! কিন্তু আজ সেই সাত বছর আগের কথা মনে হ'লে ফিরোজের কেমন ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ ঠেকে। কি আশ্চর্য স্বপ্নময় ছিল সেই দিনগুলো। বিয়ে তিনি একটু বেশি বয়সেই করেছিলেন। বয়স তখন পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। কিন্তু তখনো তাঁর পৃথিবী প্রথম যৌবনের রঙ হারিয়ে ফেলে নি। তারপর সেদিনের পরে গেছে কত শত দিন।

ফিরোজ আজ অবাক হলেন এই দেখে যে, তাঁর ভাবী অর্থাৎ আমিনা খাতুন তাঁর কথার উত্তরে সাড়া দিলেন অত্যন্ত শীতলভাবে—

'না ভাই। ওখানে কি আর ফেরা যায় যে সে কথাটি মেয়েকে শেখাতে যাব।'

কেমন একটা করুণ সুর বাজল আমিনার কথায়। এবং সহসা ফিরোজ উপলব্ধি করলেন, বড় ভুল করে ফেলেছেন তিনি। সত্যিই তো বড়ো বেদনায় বড়ো অসহায় হয়ে তাঁরা গৃহত্যাগ করেছেন। এখন গৃহে ফেরা নিয়ে কোন রসিকতাও যে আঘাত হয়ে বাজবে। তাঁর মতো লোকের সেই এত বয়সে এতো অসাবধানে কথা বলা উচিত হয় নি। তবে কিছু একটা বলতে তাঁকে হ'ত। কেননা সুদীপ্ত কিছু বলছেন না। মেয়েকে কোলে নিয়ে তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে নীরব শুধু সোহাগ করছেন। কিন্তু সুদীপ্তর সোহাগে খুব একটা কাজ হ'ল না। কানের কাছে খুব আস্তে আস্তে মেয়ে অনুযোগ ক'রেই চলেছে—

'হুঁ—উঁ—উঁ, বাসায় চল আব্বু।'

নীরবে মেয়েকে কোলে নিয়ে বাইরে গেলেন সুদীপ্ত। বারান্দা পেরিয়ে বাগানে নামলেন। কয়েকটি গোলাপ ফুটে আছে একটি গাছে। সেদিকে যেতেই মেয়ে হাত বাড়িয়ে দেখাল জবা। সারা গাছ ভ'রে আছে অজস্র জবা। যেন সদ্যরক্তস্নাত গাছটা মধ্যাহ্নকে ব্যঙ্গ করছে। সুদীপ্ত ঐ গাছের সারা সবুজ অঙ্গে রক্তের ছাপ দেখলেন। আর এগোতে পারলেন না। মেয়েকে আরো নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে। কিন্তু মেয়ে হাত বাড়িয়ে দেখাল—

'ঐ ফুল আব্বু।'

তাই তো, ওইগুলি তো ফুলই। তবে দাঁড়িয়ে গেলেন কেন তিনি! তবু এগোতে চেষ্টা করেও এগোতে পারলেন না। পা বাড়াতেই মনে হ'ল—না না,

ওরা ফুল হবে কেন বুলেট-বিদ্ধ অঙ্গের ক্ষত মনে হচ্ছে না? ঠিক তাই ডঃ ফজলুর রহমানের গায়ে গুলির দাগগুলো কেমন দেখাচ্ছিল? ঠিক এমনি প্রস্ফুটিত জবার মতো না? মেয়েকে বুকে জড়িয়ে আবার ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি। হ্যাঁ, ছুটেই গিয়েছিলেন। কেমন একটা হন্তদন্ত ভাব। আমিনা তখনো ঘরে ছিলেন, ইতিমধ্যে মীনাক্ষীও এসে জুটেছিলেন। আর ফিরোজ তো ছিলেনই । তিনজনই সুদীপ্তর ছুটে আসা দেখে কেমন ঘাবড়ে গেলেন যেন।

'কী হ'ল?'

তিন জোড়া দৃষ্টি সুদীপ্তর পানে নিবদ্ধ। ফিরোজ লাফিয়ে উঠলেন সোফা ছেড়ে। মহিলা দু'জন দাঁড়িয়েই ছিলেন। হয়েছে কী?—প্রতিটি চোখে এই জিজ্ঞাসা। সুদীপ্ত কিন্তু সটান সোফাতে এলিয়ে পড়লেন। বেলা কি তার বাপের চিত্ত বৈকল্যের অংশ পেয়েছিল? সেই যেন অভিভূত হয়ে চুপ মেরে গেছে। নীলক্ষেতের বাসা, লাল জবা—কিছুই আর চাইবার নেই যেন।

'কী হয়েছে? আর্মি নাকি!'

শুধুই একটু মাথা নাড়লেন সুদীপ্ত। জানিয়ে দিলেন—না। আর্মি আসেনি। আর্মি ছাড়া এতো ভয়ের কিছু এখন দেশে আছে নাকি! আমিনা স্বামীর মাথায় হাত রাখলেন, ফিরোজ গিয়ে বসলেন পাশে। কিন্তু সুদীপ্ত তাঁর পার্শ্বদেশে যাদের উপস্থিতি তখন উপলব্ধি করছিলেন তাদের মধ্যে ফিরোজের নাম ছিল না। মীনাক্ষী বা আমিনাও ছিলেন না। ছিল কয়েকটি লাশ। অচেনা লাশগুলির স্পর্শে তার চেনা জগতের জীবনগুলি একে একে লাশ হয়ে যাচ্ছে। এবং সেই মড়কের মধ্যে তিনি বুকে চেপে ধ'রে বাঁচাতে চাইছেন তাঁর তিন বছরের কন্যাটিকে। তাই আমিনা যখন কন্যাকে নিজের কোলে নিতে গেলেন তখন বাধা দিলেন সুদীপ্ত। কিন্তু কিভাবে? ওকে বাধা দেওয়া বলে না। এ যেন প্রার্থনা —

'না না, আমার মাকে কেড়ে নিও না আমার কোল থেকে।'

সুদীপ্তর এই মূর্তি ফিরোজ চিনতেন না। বাইরের কর্মজগতে চেনা বন্ধুদের ঘরোয়া পরিবেশের ছবি তো আমাদের অচেনাই থাকে। হ'তেই পারে না। এটা বুঝতে ফিরোজের আদৌ অসুবিধা হ'ল না যে, সুদীপ্তর স্বাভাবিক অবস্থা এটা নয়। এই অবস্থায় তাকে একাকী স্ত্রীর কাছে ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে — ফিরোজ ভাবলেন। উঠে জানলার কাছে গেলেন। এবং জানলা দিয়ে বাইরে কি যেন দেখলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন। ডাকলেন মীনাক্ষীকেও। মীনাক্ষী সুদীপ্তর মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন নীরবে।

স্বামীর মানসিক অবস্থা নিয়ে সচেতন হতে গেলে স্ত্রীদের চলে না। আমিনা স্বামীর মন নিয়ে কখনো মাথা ঘামান না। পুরুষের মনকে প্রশ্রয় দিলে তার আবদারের সীমা বেড়ে যায়। এতো বেড়ে যায় তখন তাকে সামলানো দায় হয়ে ওঠে। মতটা আমিনার। বিদূষী আমিনা বলেন—

'দীর্ঘকালে স্ত্রীদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া স্বামীদের অভ্যাস। সে

অভ্যাসটাকে আরো বাড়তে দিলে মেয়েদের দাসীত্ব কখনো ঘুচবে না।'

অতএব নারীজাতির স্বার্থে আমিনা কখনো স্বামীর মন নামক পদার্থটিকে আমল দিতে শেখেন নি। সেজন্য সংসারের পক্ষে আশঙ্কাজনক কোনো ঝড়ের প্রাদুর্ভাবও লক্ষ্য করা যায় নি। ওটা আমিনার ভাগ্য। ভাগ্যিস্ তুই গোবেচারা স্বামী পেয়েছিস — মন্তব্যটা আমিনার বাল্যসখি সেলিমার।

ফিরোজ ও মীনাক্ষী বেরিয়ে গেলে স্বামীকে এবার একা পেয়ে আমিনা তাঁর কর্তব্য শুরু করলেন। স্বামীর দিকে দু পা এগিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঠিক চোখের উপর চোখ রেখে বললেন —

'দুঃখটা তুমি একাই পেয়েছ নাকি।'

বারো বছরের পুরোনো স্ত্রীকে স্বামীর না চেনার কথা নয়। সুদীপ্ত স্ত্রীর মেজাজ টের পেলেন। স্ত্রী এখন চটেছেন। কিন্তু কি আর করা যাবে! কারো রাগকে আমল দেবেন — এমন অবস্থা এখন সুদীপ্তর কই? হাঁ, কিছু একটা ব'লে এখন স্ত্রীকে শান্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু কারো প্রয়োজন মেটাতে গেলেও একটা শক্তি লাগে। কোনো শক্তিই সুদীপ্তর ছিল না বোধ হয়। চোখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকানোর কথাও মনে এল না।

'হোক তোমার বন্ধু, তা হলেও পরের বাড়ি। এখানে ঐ নাটকটা না করলে চলত না।'

তবু সুদীপ্ত মুখ খুললেন না। স্ত্রী ব'লে চললেন—

'দয়া ক'রে আর বোবা সাজতে হবে না। শোনো এখানেও অবস্থা সুবিধের নয়। যে কোনো সময় ফিরোজ সাহেরেব খোঁজে আর্মি আসতে পারে। অতএব যাবে কোথায় এখন ভাবো।'

প্রাণপণ প্রয়াসে সুদীপ্ত শুধু বললেন—

'আজ এখন আর কোথায় যাই! রাস্তায় যানবাহন নেই।'

'তা নেই। তুমি এখানে এনে কি বিপদেই ফেললে আমাকে! বললাম, চল খালার বাসায় যাই, তুমি শুনলে না।'

হাঁ, আমিনা গতকাল এক ফাঁকে বলেছিলেন সে কথা। তেইশ নম্বরে ফিরোজ তখন সুদীপ্তর ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইকবাল হলের দিকে চেয়ে ছিলেন। একটা ঘরে জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, মশারি টাঙানো আছে। ফিরোজ যেন দেখছিলেন, উতলা বাতাসে জানলা দিয়ে বাইরে উড়ে পালাতে চাইছে মশারিটা। কারফিউ উঠে যাওয়ায় এই অবকাশে ওটা এখন যেন পালিয়ে বাঁচতে চায়। ওর মালিককে তারা গুলি করে মেরেছে। ওকে যদি পুড়িয়ে মারে। এখনও যে পোড়ায়নি সেইটেই ভাগ্য! ফিরোজ এইসব ভাবছিলেন। এবং আমিনা নিভৃতে ডেকে স্বামীকে বলছিলেন—

'ফিরোজ ভাইকে বলি—আমাদের একটু খালার বাসায় পৌছে দিয়ে আসুন।'

তা বলা যেতে পারে, তবে ফিরোজ নিজেই যখন আগ্রহ ক'রে তার বাসায়

নিয়ে যেতে চায়—

বাক্য শেষ করেন নি সুদীপ্ত। তাঁর চিন্তায় ছিল ফিরোজের সেই বিশাল বাড়ি! ওটা প্রায় খালিই প'ড়ে থাকে। ওদের মাত্র স্বামী-স্ত্রীর সংসার। দরকার হলে একাংশ নিয়ে তাঁরা আলাদা সংসার পাততে পারবেন। নীলক্ষেতের যা অবস্থা তাতে অদূর ভবিষ্যতে সেখানে যে তাঁরা ফিরতে পারবেন তেমন সম্ভাবনা কই? অতএব মোটামুটি একটা দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা ফিরোজের বাড়িতে করা যেতে পারে। খালার বাসায় এটা সম্ভব হবে না? ফিরোজের বাড়িতে করা যেতে পারবে। বাসায় যেটা সম্ভব হবে না? ফিরোজের বাসাতেও ব্যাপারটা যে খুব সহজ হবে তা নয়। হয়ত ফিরোজ ব'লে বসবেন — তা হ'লে বেরিয়ে যেতে হবে আমার বাড়ি থেকে এবং সুদীপ্ত বললেন — তা হ'লে তাই যাব। কী আর করা যাবে। বন্ধু ব'লেই তো আর সিন্দাবাদের নাবিকের মতো তোমার ঘাড়ের উপর বৃদ্ধ সেজে অনন্তকাল ব'সে থাকতে পারি নে।—এইভাবে কথা চলবে কিছুক্ষণ। অগত্যা সুদীপ্ত যখন বেরিয়ে পড়তে উদ্যত হবেন, তখন অগত্যা রাজি হ'তে হবে ফিরোজকে। মোটামুটি এইসব সুদীপ্ত ভেবে রেখেছিলেন। এবং আমিনাও খালার বাড়ি খুব একটা পছন্দ করেন এমন নয়। খালা একটু দূর সম্পর্কের । তাঁর মায়ের মামাতো বোন। তা ছাড়া দেখতে হবে, পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে খালার সংসারটি কতো বড়ো। বড়ো মেয়ের না হয় বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু বাকি ছ'জনের সংসারে তাঁরা গিয়ে যুক্ত হ'লে ব্যাপারটা খুব সুবিধার হবে না সেটা আমিনাও বোঝেন বৈ কি। অতএব ফিরোজের বাড়ি সম্পর্কে তিনি খুব আর আপত্তি প্রকাশ করেন নি। কিন্তু এখানে এসেই তিনি ভুলটা টের পেয়েছেন। না, মীনাক্ষী কিছু বলেন নি। এবং ফিরোজ তো বলতেই পারেন না আর বললেও সেটা সুদীপ্তকেই বলবেন। স্ত্রীলোকের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস চলে। কিন্তু যথেষ্ট আশঙ্কাজনক ও সিরিয়াস কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনার পক্ষে ওই জীব একেবারেই অযোগ্য— মতটা ফিরোজের। অতএব বলাই বাহুল্য যে, এ বিষয়ে ফিরোজের আমিনার সাথে কোনো কথা হয়নি। কথাটা আমিনার কানে দিয়েছে পাশের বাড়ির প্রতিবেশিনী আফরোজা সাবির। প্রখ্যাত ব্যবসায়ী সাবির চৌধুরীর স্ত্রী। আফরোজা এক ফাঁকে এসে উপকারটি ক'রে গেছে। ব'লে গেছে—

'আপনারা তো ভাই তপ্ত কড়াই থেকে এসে জ্বলন্ত উনুনে পড়লেন। এঁরা পাড় আওয়ামী লীগার। আর্মির নজর ষোল আনা এদের পরে। আমরা পাশে থেকেই ভয়ে ভয়ে আছি।'

তা ভয় তাদের এখন হচ্ছে। কিন্তু দুদিন আগেও যেটা ছিল সেটাকে কি বলা যাবে? সেকালের ভাষায় বলা যায় ভক্তি। এই পরিবার সম্পর্কে তাদের একটা ভক্তি বোধ প্রকাশ পেত — সাবির চৌধুরী বা তার স্ত্রী আফরোজা সাবির দু'জনেই কাউকে নিজেদের বাড়ির ঠিকানা দেবার সময় বলত —

'আওয়ামী লীগের ফিরোজ সাহেবের বাড়িটা চেনেন? তার পশ্চিম দিকে আমাদের বাসা।'

কোথা থেকে সাবির চৌধুরী শুনেছিল, ফিরোজ সাহেব এবার প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হচ্ছেন। তারপর থেকেই ফিরোজের সঙ্গে দেখা হ'লে সালাম দেওয়া অভ্যাস করেছিল। এবং সে যে ফিরোজ সাহেবের প্রতিবেশী সে কথা যত্রতত্র ব'লে বেড়াচ্ছিল। সেই সাবির চৌধুরী গতকাল গিয়েছিল পুরোনো ঢাকায় খাজা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেখান থেকে ফিরে ব'লে বেড়াচ্ছে, সে নাকি বাসা বদল করবে। আওয়ামী লীগের লোকের পাশে আর থাকবে না।

স্বামীর অনুরূপ স্ত্রী সচরাচর হয় না হয়ত। কিন্তু কখনো তো হয়ও। প্রাচীন সাহিত্যের উপমা অনুসারে হাঁড়ির মতন সরা এযুগেও একেবারে দুর্লভ যে নয় তারই প্রমাণ সাবির চৌধুরী ও তার স্ত্রী আফরোজা সাবির। দুটি নামই অ্যাফিডেভিট করে পাওয়া। সাবির চৌধুরীর পূর্ব নাম ছিল ছাবের আলি এবং আফরোজা ছিল আফজা। আফজা আই. এ. পাস। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। ছাবের আলি বি. এ. ফেল ক'রে প্রথম দিকে একটা অফিসে কেরানী ছিল। মোনায়েম খান গভর্ণর হলে সহসা ছাবের আলি আবিষ্কার করে যে, মোনায়েম খানের স্ত্রী হচ্ছেন তার মায়ের ফুপাতো বোনের ননদ। মায়ের বোন মানে খালা। ছাবের আলি খালাকে ধ'রে গভর্ণর হাউসের কৃপা লাভে সমর্থ হয়েছিল। তারপরেই হয়েছিল বি. ডি. মেম্বার এবং ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কাজে বিস্তর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে অঢেল টাকা কামিয়েছিল। সেই টাকার বলেই আজ সে ঢাকা শহরে মাসে অন্ততঃ কয়েক হাজার টাকা উপার্জনক্ষম ব্যবসায়ী। কিন্তু এই উপার্জন কার বদৌলতে। আয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র না খুললে? কোথায় থাকতো সাবির চৌধুরীর ব্যবসা। সে কি সাবির চৌধুরীই হ'তে পারত? আজো সেই ছাবের আলি হয়ে থাকতে হ'ত। অতএব আয়ুবের পতনে সত্যই যাদের চোখের জল পড়েছিল সেই তাদের একজন ছাবের আলি, ওরফে সাবির চৌধুরী। অতঃপর বড়ো দুর্দিন গেছে সাবিরের। তাকে দুর্দিনই বলে। বহু যত্ন সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের শিবিরে ঢোকার কোনো প্রয়াস তার সফল হয়নি। কিন্তু কোন প্রয়াসই কি পৃথিবীতে একেবারে ব্যর্থ যায়? সহসা এক সময় প্রতিবেশী ফিরোজ সাহেবের কথা মনে হয়েছিল সাবিরের। এবং তার পরেই। আফরোজা সাবির সেদিন বিকেলে একটু বিশেষ রকমের প্রসাধন করে মীনাক্ষীর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিল। হাজার হ'লেও প্রতিবেশী। এতোদিন যে আলাপ-পরিচয়টা হয় নি সেটা দুর্ভাগ্য বৈ কি। আধুনিক নগর জীবনের এই হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো অভিশাপ।

'মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কটা এখানে তাই বড়ো শিথিল, আমার তো একটুও ভালো লাগে না।'

বলেছিল আফরোজা। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এই কথাটি বলবার জন্য অনেক তালিম নিয়েছিল মনে মনে। কিন্তু কাজ হয় নি। মীনাক্ষী অতি সরল মেয়ে। খুব সরল বুদ্ধিতেই তিনি বলেছিলেন—

'তা আর কি করবেন বলুন। সবাই এখানে আপন আপন স্বার্থ নিয়ে ঘোরে কিনা তাই নিঃস্বার্থ হৃদয়-সম্পর্কের কারবারটা বড়ো একটা চলে না এখানে। তা ছাড়া হাতে সময়ও থাকে বড়ো কম। এখানে লোকের কতো কাজ।'

ওহ, মাগী কি সেয়ান দেখেছ। ঠিকই সন্দেহ করেছে গো। অতএব সেদিন আর আলাপ খুব জমে নি। কেবল লাভের মধ্যে এটুকু হয়েছিল, ফিরোজের দেখাটা শেষ পর্যন্ত মিলেছিল। প্রথমেই গিয়ে যখন সে জেনেছিল যে ফিরোজ বাড়িতে নেই তখন বেশ আফসোস হয়েছিল। এতো যত্নের সকল সাজগোজ কি ব্যর্থ হবে? শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ যে হয় নি তাতে খুবই খুশি হয়েছিল আফরোজা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরোজ ঘরে ফিরেছিলেন। আফরোজা তখন বুকের আঁচল ঠিক করতে গিয়ে সম্পূর্ণ আঁচলটাকেই দু-হাতে সরিয়ে নিয়েছিল এবং সাদা ডিমের মতো ফর্সা পেটের ইঞ্চি ছয়েক অনাবৃত অংশে ফিরোজের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে এমন কায়দায় আঁচলটাকে তাড়াতাড়ি ঘাড়ের উপর স্থাপন করেছিল যে সেখানে তা স্থায়ী হয়েছিল কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। রেশমের শাড়ির আঁচল—একটা আদাব দেবার চেষ্টা করতেই ঘাড়ের উপর থেকে খ'সে পড়েছিল। ব্লাউজের নামে আফরোজা যেটা প'রেছিল সেটাকে ব্রেসিয়ারের একটু চওড়া সংস্করণ ব'লেই মনে হয়েছিল ফিরোজের। কেবল স্তন দুটি ছাড়া আর সবি দেখা যায়। কিন্তু দেখতে কি ভালো লাগে? প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারনী আফরোজাকে ফিরোজের ভালো লাগে নি। তবে একটা লোভ হয়েছিল। রমণীর অনাবৃত দেহাংশ পুরুষ-চিত্তে স্বাভাবিক একটা লোভের সঞ্চার করেছিল। ওটা ভালগালা নয়। ভাল লাগা ও লোভ লাগা কি এক। তবে লোভটাকে ফিরোজ অস্বীকার করেন না। আফরোজার দেহ—সৌন্দর্য ফিরোজ অস্বীকার করেন নি। মধ্যবয়সী, তবুও তনু তোমার/আশ্বিন আলো ছড়ায় আমার মনে। ফিরোজ একটু ভেবে দুছত্র কবিতা স্মরণ করেছিলেন। কিন্তু আফরোজার দেহ ঘিরে আশ্বিন আলোর উৎসবকে ফিরোজ কি সত্যিই প্রত্যক্ষ করেছিলেন? তবু দুই চক্ষের প্রশংসা দিয়ে তাকে চেটেছিলেন। আফরোজাকে ঘিরে কোনো কবিতার চরণ স্থানকালপাত্রপোযোগী ব'লে মনে হয় নি। তবু তার সঙ্গেই হেসে কথা বলেছিলেন। যদিও মামুলি কথা, তবু তাতেই খুশি হয়ে আফরোজা বাড়ি ফিরেছিল। বিশেষ ক'রে খুশি হয়েছিল ফিরোজের শেষ বিদায় বাক্যটিতে।—

'আসবেন আবার। আবার দেখা হবে এই আশায় থাকলাম।'

শুনে আফরোজার দেহ ঐ মুহূর্তেই গ'লে জল হয়ে যেতে চেয়েছিল। বেশি নয়, ফেব্রুয়ারি মাসের কথা সেটা। মাস খানেক মাত্র পার হয়ে পঁচিশে মার্চ পৌছতেই ফিরোজের সামনে এখন বেগম আফরোজা সাবির মধ্যযুগীয় কুলবধূ

হয়ে উঠেছে। পর-পুরুষের সামনে লজ্জা দেখাতে হয়।

সেই আফরোজা গতকাল থেকেই ফাঁক খুঁজছিল । গতকাল সুদীপ্তরা যখন এখানে এসে পৌছলেন, তখনই জানলার ফাঁক দিয়ে দৃশ্যটা দেখে নিতে আফরোজা ভুল করে নি। অতঃপর আজ এই বেলা এগারটার দিকে এসে এক সময় আমিনাকে একা পেয়ে ব'লে গেছে—এঁরা পাঁড় আওয়ামী লীগার। আর্মির নজর ষোল আনা এদের পরে।

কথাটা কিছু অস্বাভাবিক তো মনে হয় নি। আমিনার মনে হয়েছিল এ কথা আগেই তাঁরা ভাবতে পারতেন। ভাবা উচিত ছিল। হাঁ তো, আওয়ামী লীগারদের এখন বিপদ বৈ কি। এবং সে বিপদ এখানে এলে তাঁদের ঘাড়েও কিছুটা পড়তে পারেই তো। অতএব সরে যাওয়া কর্তব্য। সেই কর্তব্যের কথা তিনি স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। এবং ঐ পর্যন্ত। রাস্তায় যানবাহন নেই। অতএব অচলাবস্থা।

স্বামী-স্ত্রী, সুদীপ্ত ও আমিনা, দুটি পৃথক সোফায় নিঃশব্দে মুখ গুঁজে ব'সে রইলেন।

মন যে ঘুরে ঘুরে ঐখানেই যেতে চায়। ঐ সেই নারকীয় রাত্রির চত্বরে। তেইশ নম্বরে শেষ দুটি রজনীর নানা প্রহরের গলিতে নিশী-পাওয়া ব্যক্তির মত ঘুরে ঘুরেই মরতে হবে? যে-কোন মুহূর্তে নির্জন পেলেই সুদীপ্তর মন তৎক্ষণাৎ সেই দুটি রজনীর অধিবাসী হয়ে উঠে।

কিন্তু আমিনা? তিনি এখন ঠিক তেমনিভাবে ব'সে আছেন যেমন ব'সে ছিলেন সেই গতকাল সকালে। কারফিউ উঠার সময়। কারফিউ উঠলে আমিনা ঘর থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে এসে বারান্দায় বসেছিলেন। ইকবাল হলের দিকে চোখ রেখে একটা চেয়ারে যেন সহসা পুতুল হয়ে গিয়েছিলেন। সুদীপ্ত যখন বাইরে যাবার পোশাকে ঘর থেকে বেরিয়ে স্ত্রীকে বলেছিলেন—

'আমি একটু নীচে থেকে আসি।'

আমিনা তখন কোনো কথা বলেন নি। ছত্রিশ ঘন্টা পর সবে তখন কারফিউ উঠেছে। রাস্তায় মানুষ বেরুতে শুরু করেছে। নীচেও জমা হয়েছে কিছু মানুষ। সুদীপ্ত দোর-গোড়া পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলেন। আমিনা বাধা দিচ্ছেন না দেখে খুবই অবাক হয়েছিলেন তিনি। বললেন—

'আশে পাশে একটু ঘুরে দেখে আসব। আধ ঘন্টা খানেক দেরি হতে পারে। তোমরা ঘাবড়ে যেও না যেন। আর তৈরি হয়ে থেকো। এখানে থাকা যাবে না। কোথাও কেটে পড়তে হবে।

না। তাও কিছু বললেন না তাঁর স্ত্রী। স্ত্রীকে এমন অনুগত তাঁর বিবাহিত জীবনে একদিনও দেখেন নি সুদীপ্ত। স্ত্রীর মুখের উপর সেই মুহূর্তে কী দেখেছিলেন সুদীপ্ত। প্রায় সারা রাত না ঘুমিয়ে ভোরের দিকে গুলি-গোলার আওয়াজ কিছুটা কম হ'তেই ছেলে-মেয়েরা একটু ঘুমিয়েছে। এখনো ঘুমিয়েই আছে তারা। কিন্তু স্বামী স্ত্রী কেউ ঘুমোন নি। কেউ কাউকে কথাও খুব একটা বলেন নি। স্ত্রী আমিনার চোখে কেমন একটা নির্বিকার ভাব। স্বামী এখন কোথায় যেতে চায়, এখনি বেরুতে গেলে কোন বিপদ হ'তে পারে কি না, একান্তই যদি বেরুতে চায়, কতক্ষণে তবে ফিরতে পারবে—ইত্যাদি বহু প্রশ্নই তো এখন আমিনার থাকার কথা। কিন্তু কোন প্রশ্নই স্ত্রীর চোখে সুদীপ্ত দেখলেন না। এখন সুদীপ্তও যেন কেমন হয়ে গেছেন। তা না হ'লে এমন নিরুৎসুক, যেন প্রাণহীন স্ত্রীকে রেখে কি বেরিয়ে পড়তে পারতেন? মেয়েটার হ'ল কি—এমন একটা প্রশ্ন অন্ততঃ একবারও তো মনে জাগতে পারত। কিন্তু জাগেনি। বিশ্বাস, বিস্ময়, উৎসাহ এবং কৌতূহলের যে সকল গ্রন্থি জীবনকে নানা জগৎ-ব্যাপারের সঙ্গে গ্রথিত রাখে তার সব কটি কি ম'রে গেছে সুদীপ্তর মধ্যে? তা হলে এখন বাইরে বেরুনোর ঝোঁকটাই বা মাথায় চাপে কেন?

সত্যকার বাইরে বেরুনো কাকে বলে সেটা বারান্দায় বেরিয়েই কিঞ্চিৎ টের পেয়েছিলেন সুদীপ্ত। গত ছত্রিশ ঘন্টা এই বারান্দায় তাঁরা কেউ পা দিতে পারেন নি। ঘরের সংলগ্ন বারান্দা। সেখানেও পা দিতে ভয়! ভয় তো হবেই। বারান্দায় পা দিলেই ইকবাল হলের মসজিদের ছাদে মরা মানুষের সারি সারি লাশগুলো দেখা যাচ্ছিল। এখনো দেখা যাচ্ছে। এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। কাক-শকুনে খেয়ে নেবার পর সেখানে কঙ্কাল প'ড়ে ছিল আঠারোই এপ্রিল পর্যন্ত। সুদীপ্ত সে সব জানতেন না। জানতেন না যে, তাঁদেরও ছাদে তিরিশ-চল্লিশ জনের মৃতদেহ, অবশেষে কঙ্কাল, অমনি পড়েছিল এপ্রিলের আঠারো তারিখ পর্যন্ত। অতঃপর সরানো হয়। সরানো না হতেও পারতো। কিন্তু বাহির বিশ্বে পাকিস্তান যে সকলের মুখ হাসিয়েছিল। কেলেঙ্কারি যা করেছিল তা নিয়ে বাইরের লোকের কানাকানির অন্ত ছিল না। সর্বত্র বদনাম কুড়োতে হচ্ছিল। অতএব সতীত্ব প্রমাণের তাগিদেই তখন কিছু কিছু সাংবাদিককে এ দেশ দেখে যাবার অনুমতি না দিয়ে তার আর উপায় ছিল না। এবং তখন অতি দ্রুত তার কুকীর্তির চিহ্নগুলি মুছে ফেলার জন্য তাকে তৎপর হতে হয়েছিল। অতএব কঙ্কালগুলি সরানো হয়েছিল, বস্তির আধ-পোড়া টিন-কাঠ প্রভৃতি সরিয়ে তার উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণের পাঁয়তারা শুরু হয়েছিল। এবং কামানের গোলায় বিধ্বস্ত বাড়ি ও দেওয়াল মেরামতের হিড়িক

পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা পাকিস্তানিরা যত সহজ ভেবেছিল আসলে তত সহজ ছিল না। অত ধ্বংসস্তূপ ক'দিনে মানুষ সরাতে পারে। সরাতে গেলে তো সময় আরো বেশি লাগে। অতএব সোজা উপায় — পোড়ানো বস্তির উপর দিয়ে বুলডোজার চালিয়ে পার্ক কিংবা রাস্তা বানিয়ে দাও। তাতে সময় বাচানো যাবে, কর্মীও লাগবে কম। কর্মী পাওয়াটা শহরে তখন একটা সমস্যা। গরীব লোকগুলো বেশির ভাগই হয় সংসার ত্যাগ কিংবা শহর ত্যাগ করেছে। এত দ্রুত সকলে শহর ত্যাগ করেছে যে, নিকট আত্মীয়ের মৃতদেহ পর্যন্ত কেউ সরাবার এবং গোর দেওয়ার বা দাহ করার কথা ভাবে নি। জননীও তার কোলের ছেলেকে কাক-শকুনের কাছে সঁপে দিয়ে পালিয়েছে, কিংবা পালাতে গিয়ে বন্দিনী হয়ে ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় পেয়েছে — দেশের জওয়ানদের মনোরঞ্জনের ভার নিতে হবে তাকে। হবে না! জওয়ানরা তোমাদেরকে বাঁচানোর জন্য এসেছে সেই সুদূর পাঞ্জাব মল্লুক থেকে, আর তাদেরকে একটু আমোদ দেবার জন্য তোমাদের মেয়েরা সতীত্বটুকু দিতে পারবে না! এই তোমাদের দেশপ্রেম! দেখছ না, জওয়ানরা তোমাদের জন্য কতো যুদ্ধ করেছে!

অবশ্যই নিরস্ত্র বাঙালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু সেইটুকুর জন্যই সেনাবাহিনীর পূর্ণশক্তি পাকিস্তানকে নিয়োগ করতে হয়েছিল। গোলন্দাজ বাহিনী, ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া বাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ বাহিনী — বাকি ছিল কোনটা? কিচ্ছু না। শুধু যদি বিমান বাহিনীর ব্যবহার না করতে, তা হলেই দেখা যেত কত বীর তোমরা। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল পাকিস্তানের বীর সৈনিকের দল? অসহযোগ আন্দালনে ব্রতী দেশবাসীর বিরুদ্ধে। হাতে অস্ত্র নিয়ে কেউ অসহযোগ আন্দোলনে নামে না। বাঙালির হাতে পদাতিক বাহিনীর অস্ত্রও ছিল না — বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর কথা তো ওঠেই না। এ হেন বাঙালির বিরুদ্ধে নৌ, বিমান ও সাঁজোয়া বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণ। তাও সে বীরপুঙ্গবেরা দিনের আলোয় বেরুতে সাহস করে নি। এসেছিল রাতের আঁধারে। সুদীপ্তরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

প্রলয়-গর্জনে সুদীপ্তর যখন ঘুম ভেঙ্গেছিল তখন কত রাত? ঐ মুহূর্তে তিনি ঘড়ি দেখেন নি। এতো শব্দ কিসের —সেই কথাটিই সুদীপ্ত বিছানায় শুয়ে থেকে একটু ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন। ক্লাব থেকে ফেরার সময় গত সন্ধ্যাকে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়েছিল কি? ক্লাবেও তো কোনো অস্বাভাবিকতার আভাস মেলেনি।

উহ্, কী ভয়ঙ্কর শব্দ রে বাবা! এ যে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে মালা গাঁথার দুশ্চেষ্টা। টা-টা-টা-টা....... পট্-পট্-পট্......গুড়ুম—দ্রুম্ ...হুড়ুম। একই সঙ্গে শব্দের এতো বিচিত্র চেহারাকে সুদীপ্ত কখনো দেখেন নি। ঠিক ঘটছেটা কী? ইতিমধ্যে আমিনাও জেগে উঠেছেন।

'ওগো কী হয়েছে! শুনছো?'

'আমি তো অনেকক্ষণই শুনছি।'

সুদীপ্ত উঠে বাইরে এলেন। উত্তর দিকের বারান্দায় গিয়ে দেখেন, পশ্চিম দিকের রেল-কলোনির ঘর-বাড়ি জ্বলছে। উত্তর-পূর্ব কোণেও আগুন। আগুন কোন্‌দিকে নেই? আর সব দিক থেকে ভেসে আসছে অসহায় মানুষের আর্ত চীৎকার। শুরু হয়েছেটা কী? ফজলুর রহমান সাহেবকে ডাকবেন নাকি! দক্ষিণের বারান্দায় এলেন সুদীপ্ত। রান্নাঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়ালেন গিয়ে। ওইখানে দাঁড়ালে নিচের তলায় ফজলুর রহমান সাহেবের বারান্দা দেখা যায়। ভদ্রলোকের স্ত্রী বিলেতে। পি. এইচ. ডি. করতে গেছেন। কয়েক মাসের মধ্যে রহমান সাহেবও যাবেন কথা আছে। আপাতত বিরহ যাপন করছেন। এ নিয়ে প্রায়ই সুদীপ্ত আজকাল রহমান সাহেবকে জ্বালিয়ে খাচ্ছিলেন। 'জ্বালিয়ে খাওয়া' কথাটা রহমান সাহেবেরই।

'আপনি আমাকে জ্বালিয়ে খেলেন দেখি। দাঁড়ান, কালই প্লেনের টিকিট কাটছি।'

'ব্যাস্, একখানা টিকেটেই বিরহের অবসান! রঙ্গ-রসিকতার মূল্য কতো টুকুই বা! কিন্তু এই সব নিয়েই চলছিল উপরে-নিচে দুজন অধ্যাপকের পাশাপাশি দুটি জীবন-ধারা। কয়েক ঘন্টা আগেই ঠিক এই রান্নাঘরের দোর গোড়াতে দাঁড়িয়েই সুদীপ্ত ফজলুর রহমানের খাওয়া-দেখছেন। বারান্দায় টেবিল পেতে সেখানে রহমান সাহেবেরা খাওয়া-দাওয়া করেন এবং সে জায়গাটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। সুদীপ্ত দেখছিলেন। আর মনে মনে আগামীকাল কী-ব'লে রহমান সাহেবকে বিব্রত করবেন তার একটা রিহার্সাল দিচ্ছিলেন।

দেখুন রহমান সাহেব, অন্যায় একটা করেছি। তবে আপনার গৃহিণী থাকলে করতাম না।

এইভাবে ভনিতা ক'রে কথা শুরু করতে হবে। তারপর তুলতে হবে সেই ডাল মেখে ভাত খাওয়ার কথা। কিন্তু হায়, সুদীপ্ত কি তখন জানতেন যে, সে কথা তুলবার কোনো সুযোগই সারা জীবনে আর পাবেন না।

কয়েকবার সুদীপ্ত রহমান সাহেবের নাম ধ'রে ডাকলেন। কিন্তু বাইরের এতো আওয়াজে সুদীপ্তর ক্ষীণ আওয়াজ কারো কানে গেল না বোধ হয়। ইতিমধ্যে আমিনা এসে হাত ধ'রে সুদীপ্তকে ডাকলেন—

'ওগো পাগল হ'লে তুমি। শিগ্‌গির ঘরে এসো। দেখছ না, কীভাবে চারপাশে গুলি ছুটছে। তোমাকে লাগতে পারে তো।'

তা তো পারেই। খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। স্ত্রীর সঙ্গে সুদীপ্ত ঘরে এলেন। ছেলে-মেয়েরা তখন সকলেই জেগে উঠেছে। ঘরের মধ্যেও জানলা দিয়ে গুলি এসে তাঁদেরকে লাগতে পারে। আমিনা অতএব খাটের নিচে ঢুকলেন অনন্ত ও এলাকে নিয়ে। ছোট মেয়ে বেলা বাপের কোলে। বাপের কোল যখন পাওয়া গেছে তখন সে নিঃসন্দেহে নিরাপদ। নিরাপত্তার বোধটুকু

বেলার ক্ষুদ্র বুকে সঞ্চারিত হওয়া মাত্রই ভীতি প্রকাশের সাহস পেল মেয়ে। এতক্ষণ কাঁদতেও যেন ভয় পাচ্ছিল।

'আব্বু, ওইখানে চল না। ভয় করে।'

খাটের নিচে আঙুল দিয়ে দেখাল মেয়ে।

'হ্যাঁ মা, চল যাই!'

খাটের নিচে বস্তায় এক মণ চাল ছিল। সুদীপ্ত সেই বস্তাটাকে সামনের দিকে একটা আড়াল সৃষ্টির চেষ্টা করলেন। কিন্তু এক মণ মাত্র চালের আড়ালে ক'জন আর লুকোতে পারে!

গুড়ুম্ — দ্রুম্ ..ট্রা-রা-রা-রা.....টা-টা-টা-টা-.....ট্রা-রা-রা-রা....টা-টা...দ্রুম — গুড়ুম......।

কতো রকমের মারণাস্ত্র ব্যবহার করছে ওই বর্বরের দল! এবং আমাদের বিরুদ্ধে। আল্লাহ্, আমাদের হাতে দুটো মর্টার কিংবা মেশিনগান যদি থাকত! একটা বন্দুকও নেই যে! এমনি খালি হাতে মরতে হবে। একে-বারে খালি হাতে দাঁড়িয়ে মরতে হবে—কথাটা মনে হ'তেই সুদীপ্তর কান্না পেল। পৃথিবীতে আজোও বর্বর দানবের অস্তিত্ব যখন আছে তখন পুরোপুরি অস্ত্র বর্জন ক'রে লেখনী হাতে নেওয়া বাঙালির উচিত হয় নি। ঠিক এমন একটা অবস্থার মুখোমুখি না হ'লে এই জ্ঞানোদয়টা সুদীপ্তর কখনোই হ'ত না।

ওরা এবার খুব কাছাকাছি এসে গেছে মনে হচ্ছে। তাঁদের বিল্ডিংয়ের পাশেই ওদের চিৎকার ক'রে বলা দু-একটা কথা কানে আসছে। কিন্তু কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা গেল আমিনার কণ্ঠস্বর—

'ওগো আল্লাহ্‌কে ডাক'।

ছাদে কিছুক্ষণ আগে থেকেই পদশব্দ শোনা যাচ্ছিল। সম্ভবতঃ রেলকলোনির মানুষ ওরা। ওদের কলোনি আক্রান্ত হ'লে যারা পেরেছে কোনো মতে প্রাণ নিয়ে এসে লুকিয়েছে।

কিন্তু লুকিয়েছে কোথায়? এই তো, তেইশ নম্বরও এখন তিন দিক থেকে গুলিবিদ্ধ হচ্ছে। সুদীপ্তদের জানলার কাঁচ ভেঙ্গে দু-একটি গুলি ঘরের মধ্যে এসে পড়তে শুরু করেছে।

'ওগো , ওরা আমাদের মেরে ফেলবে। আল্লাহ্ বাঁচাও। ইয়া আল্লাহ্। ওগো তোমরা সব আল্লাহ্‌কে ডাক।'

'আল্লাহ্, তোমার শক্তি এই মুহূর্তে কয়েকখানা মর্টার-মেশিনগান হয়ে আমাদের হাতে আসুক।'

—সহসা প্রচণ্ড ক্রোধে সুদীপ্তর দু'চোখ জ্বলে উঠল। কিন্তু নিভে গেল পরক্ষণেই। এদিকে সুদীপ্তর বুকের মধ্যে বেলা তার আব্বার কথা একটুও বোঝে নি। কিন্তু মায়ের কথা বুঝেছে ঠিকই। সে ততক্ষণে তার মায়ের অনুকরণে শিশু-কণ্ঠে আল্লাহ্‌কে ডাকতে শুরু করেছে—

'আল্লাহ্ আল্লাহ্—আচ্ছা আব্বু, ওরা আমাদের মারবে কেন?

মা গো, এ কথার কি জবাব তোমাকে আমরা দেব! ওরা আমাদের মারবে কেন?—মানব-শিশুর এই প্রশ্নের উত্তর আমরা চাইব কার কাছে? মানুষের কাছেই তো। কিন্তু মা, ওরা যে মানুষ নয়। মানব-জীবনের মূল্যবোধ নিয়ে কথা উঠলে ওরা যে, পশুর পর্যায়ে পড়ে। হাঁ, এই সবি ছিল সুদীপ্তর মনের কথা। বলতে পারলে এই সব কথাই সে মেয়েকে বোঝাত। কিন্তু সেই মুহূর্তে সব কথা বুকের মধ্যে শুকিয়ে গিয়েছিল। কোনো কথাই সুদীপ্ত বলতে পারেন নি।

সিঁড়িতে পদশব্দ সুদীপ্ত শুনতে পান নি। কয়েকটি ভারি বুটের শব্দ বুলেটের আওয়াজে ডুবে গিয়েছিল। সিঁড়ির প্রতি ধাপে তারা গুলি করতে করতে এগিয়েছিল। প্রথমে ছাদের উপরে। ছাদের ছুটাছুটির শব্দ, আর বেধড়ক বুলেটেবাজি। কেবল একপক্ষের বুলেট আর-এক পক্ষ দাপাদাপি ক'রে মরছে? মারছে না? কী দিয়ে মারবে? শেখ সাহেব অহিংস আন্দোলন শুরু করেছিলেন। অস্ত্রের কথা কেউ তো ভাবে নি। এবং সকলেই ভেবেছিল, নিরস্ত্র মানুষকে ওরা প্রচণ্ডতম অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানবে এটা হ'তেই পারে না। কিন্তু "ওরা" মানে কারা—সেই কথাটা কারো চিন্তায় একবারও আসে নি।

'ওগো ছাদে কারা গো! সব মেরে ফেলল।'

আমিনার কণ্ঠস্বরে বঙ্গজননীর মমতা ও করুণ কোমলতা প্রকাশ পেল। কিন্তু সুদীপ্তকে তা স্পর্শ করল না। তিনি তখন একটি স্বার্থপরতাকে আঁকড়ে ধ'রে ভাবতে চাইছিলেন, ছাদ থেকে এবার ওরা নেমে যাবে। ছাদের লোকগুলিকেই ওরা মারতে উঠেছে। তাদের ঘরে ওরা ঢুকবে না নিশ্চয়ই। কেন ঢুকবে? তারা নিরীহ শিক্ষক বৈ তো নন। হাঁ, রাজনৈতিক মত একটা তাদের আছে। সে তা সব মানুষেরই থাকে। কিন্তু সক্রিয় রাজনীতি তো কখনো করেন নি। অতএব—। নেহি বেরাদর, কোনো অতএব নেই। টিক্কা খাঁর ঢালাও হুকুম—বাঙালিদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দাও, তাদের হত্যা কর, তাদের রমণীদের ধর্ষণ কর। অতএব সুদীপ্তর ফ্ল্যাটে প্রবেশ-দরজায় ধাক্কা পড়ল। প্রচণ্ড ধাক্কা। কিন্তু ধাক্কা দিয়ে খোলা যাবে না! সুদীপ্ত জানেন তাঁদের প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের প্রবেশ—দরজা দুটি—একটি দিয়ে ঢুকলে প্রথম পাওয়া যায় বারান্দা, অন্যটি দিয়ে এলে পাওয়া যায় বাইরের বসবার ঘর। দু'টি দরজাই বেশ মজবুত এবং ভেতর থেকে শক্ত ছিটকিনি দিয়ে আঁটা। তা হ'লেও সামরিক বাহিনীর লোকেরা কি আর চেষ্টা করলে ঐ খিল ভাঙতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। কিন্তু কষ্ট কিছুটা হবেই। এবং কষ্ট ক'রেই যদি ওরা ঢোকে তা হ'লে ভাগ্যে নির্ঘাত মৃত্যু। তার চেয়ে নিজে খিল খুলে দিয়ে ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করাই তো ভালো। সুদীপ্ত মন স্থির করতে সময় নিয়েছিলেন দু-চার সেকেণ্ডের বেশি নয়। বেলাকে বুক থেকে সরিয়ে মায়ের কাছে দিয়ে চট্ ক'রে বেরিয়ে এলেন

খাটের নিচ থেকে। জামা গায়ে পরতে পরতেই ঘর-খুললেন! কিন্তু বারান্দায় পা দিতেই অনুভব করলেন পেছন থেকে স্ত্রী তাঁকে জড়িয়ে ধরেছেন।

'ওগো তুমি পাগল হ'লে! ওই হাইয়ানদের সামনে যেতে আছে! শিগ্‌গির ঘরে এসো।'

ঠিক সেই মুহূর্তে। সৈনিকদের গুলিতে ড্রয়িং-রুমের প্রবেশ-দরজার ছিটকিনি ভেঙ্গে গিয়ে প্রবল শব্দে দরজা খুলে গেল। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ। ড্রয়িং-রুমে ওরা কি আস্ত ব্যাটেলিয়ানের মুখোমুখি হয়েছে? ঘরটা যে গুলি ক'রে ঝাঁঝরা ক'রে ফেলল! কিন্তু সুদীপ্তর ভাবনারা তখন কোথায়! সেই যে চিন্তাটা তাঁকে ঘর থেকে বারান্দায় এনেছিল সে হঠাৎ অদৃশ্য হ'ল যেন। প্রচণ্ড ঝড়ে আন্দোলিত ডালে কি পাখি থাকতে পারে? স্বামী-স্ত্রী দু'-জনেই ছুটে এসে ঢুকলেন খাটের নিচে। ঘরের দরজা পর্যন্ত ভেজানোর বুদ্ধিটুকুও তখন তাদের লোপ পেয়ে গেছে-খাটের নিচে বাপ-মা তাদের পুত্র-কন্যাদের বুকে জড়িয়ে ধ'রে মেঝেতে মাথা গুঁজলেন। আল্লাহ্, রক্ষা কর। রক্ষা কর। বাঁচাও।

হ্যাঁ, আল্লাহ্ই তাঁদেরকে বাঁচালেন। তা না হ'লে ঘরে ঢুকে বিছানা খালি দেখেই ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াবে কেন তারা? একটু উঁকি মেরে খাটের নীচেটা দেখার কথা তো সহজেই মনে হ'তে পারত। হয় নি যে, ওইটুকুই আল্লাহ্‌র রহমত। এমনি ক'রেই তাঁর প্রেম নেমে আসে মানুষের জন্য। আরো দেখ, সৈনিকরা যাবার সময় খালি বিছানার এক কোণে শেল মেরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল। কাণ্ডটা তারা বিছানার মাঝখানে করতে পারত, কিংবা একাধিক শেল ছুঁড়তে পারত সারা বিছানা ভ'রে। কিন্তু না। এক মুহূর্তও দাঁড়ায় নি তারা। ঘরে তাদের স্পর্শযোগ্য কিছু ছিল না। কেবল বই ছিল—রাশি রাশি বই। ও ভি শায়তান কা হাতিয়ার—বই হচ্ছে শয়তানের হাতিয়ার। অতএব সেই দিকেও তারা একটা শেল ছুঁড়ে দিয়ে একটা আলমারিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল এবং ঐটেই আল্লাহ্‌র কৃপা যে, বই—বিছানা সব পুড়ে-যাওয়ার দৃশ্যটা তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে নি।

'সালা বাঙালি কুত্তা ভাগ গিয়া।'

বলতে বলতে বেরিয়ে চ'লে গেল ওরা। একটা আলমারিতে ও খাটের এক কোণে আগুন ধ'রে গেছে ততক্ষণে। আর তো খাটের নিচে থাকা চলে না। কিন্তু সৈনিকরা যদি বাইরে ওত পেতে ব'সে থাকে। না, থাকবে না। ওরা না জেনে গেছে, বাঙালি কুত্তা ভাগ গিয়া। তবু যদি---। না, না যদি-র কোন অবকাশ নেই। পুড়ে মরার চেয়ে গুলি খেয়ে মরা ভাল। সকলে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে স্নান-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ভাগ্যক্রমে কলে পানি ছিল। আগুন তখনও খুব বেশি ছড়ায় নি। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে সহজেই সে আগুন নিভিয়ে ফেললেন। আর তাঁরা কেউ খাটের নিচে গেলেন না। মেঝেতে বসে থেকেই

এখন বাকী রাতটুকু কাটাবেন। কিন্তু কাটাবেন কী ক'রে। ওরে মা রে, এ কি আওয়াজ!

এতো প্রচণ্ড আওয়াজ সুদীপ্ত কখনো শোনেন নি। এতক্ষণ এই আওয়াজটা কই ছিল না। সম্ভবতঃ কামান দাগছে ওরা, কিন্তু কোথায়? সারা এলাকার ঘর-বাড়ি সব ধূলিসাৎ ক'রে দেবে নাকি। গুলির হাত থেকে বেঁচে এখন ছাদচাপা প'ড়ে মরতে হবে। উহ্ কি বিকট আওয়াজ। আর গন্ধ। বিশ্রী ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস ভরে গেছে। ছাদ যদিও মাথায় না ভেঙ্গে পড়ে তা হলেও এই গন্ধেই মরতে হবে। এই কূটগন্ধ দূষিত বাতাস কিছুক্ষণ টানলেই নির্ঘাত মৃত্যু। সুদীপ্ত জানলা বন্ধ করতে গেলেন। উত্তর দিকের জানলা বন্ধই ছিল। পূর্ব ও দক্ষিণের জানলা দুটো পর্দা-আড়ালে দেহ লুকিয়ে বহু সন্তর্পণে তিনি বন্ধ করলেন। পায়ের নিচে অনুভব করলেন ভাঙা কাচের টুকরো। তখনি মোজা-জুতো পরিয়ে দিলেন ছেলে-মেয়েদের পায়ে।

চারদিকে ফর্সা হয়ে এলে অতি সন্তর্পণে জানলার পর্দা একটু ফাঁক ক'রে পুব দিকের খোলা মাঠের পানে তাকালেন সুদীপ্ত। এ্যাঁ! এ কী কাণ্ড! এত মৃতদেহ! মাঠের এক কোণে অনেক লাশ প'ড়ে আছে। অনেক লাশ! ওদেরকে কোথাও মেরে ঐখানে জমা করেছে? নাকি, জ্যান্ত ধরে এনে ঐখানে দাঁড় করিয়ে গুলি করেছে? যাই ওরা করে থাকুক, ঐখানে এমনি ক'রে ফেলে রাখার কারণটা কি? লাশের আদমশুমারী করবে নাকি!

দক্ষিণ দিকের জানলা দিয়ে এবার দৃষ্টি ফেললেন সুদীপ্ত। ইকবাল হলের মসজিদের ছাদে কয়েকটি লাশ। একটি লাশ প'ড়ে আছে সেখানে পাইপের একটি বড় ছিদ্র দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল পড়ছে। বোধ হয়, গুলি খাওয়ার পরও জীবিত ছিল ছেলেটি, এবং পিপাসার্ত হয়েছিল। তখনি বোধ হয় সে কোনো মতে নিজেকে ঐ জলধারার নিচে নিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু মুখ তো জলের নাগাল পায় নি। পানির পেয়ালা হাতে পেতেই প্রাণ নিঃশেষিত হলে? সে পানি পাওয়া না-পাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে? —হায় হায়, ছেলেটা পিপাসা নিয়েই মরেছে। সুদীপ্ত দেখলেন, জলের ধারা ঝরছে তার গলার কাছে বুকের উপর। তখনও ঝরছে। কয়েকদিনই ঝরেছিল অনবরত। এবং ঝ'রে ঝ'রে তার গায়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে। বিশুদ্ধ পিপাসার জল। কিন্তু পিপাসা-নিবৃত্তির প্রয়োজনে লাগে নি।

শুক্রবার ছাব্বিশে মার্চ সারাদিন সুদীপ্তকে ছেলেমেয়ে নিয়ে শোবার ঘরে কাটাতে হ'ল। বারান্দায় বেরুনোর উপায় নেই। সামনে ইকবাল হলের নিচের তলায় প্রভোস্ট অফিসে আগুন জ্বলল বেলা প্রায় এগারোটা অবধি। আর ইকবাল হল ও তেইশ নম্বর বিল্ডিংয়ের মাঝখানে বাবুর্চি-বেয়ারাদের জন্য যে ঘর বানানো হয়েছে তার বারান্দা অধিকার ক'রে কয়েকটি মিলিটারি জওয়ান বসে থাকল সারাদিন। তেইশ নম্বরের বারান্দা ঠিক মুখোমুখি। এখন তা হলে

ছেলে-মেয়েদের খাওয়ানো হবে কী? হামাগুড়ি দিয়ে শরীর লুকিয়ে রান্নাঘরের কাছে পৌঁছানো যায়। কিন্তু পৌঁছানোই যায় শুধু। লাভ তো কিছু হয় না। তালা খুলবার জন্য মাথা তুললেই ওদের নজরে পড়তে হবে যে! পুব দিকের মাঠে যেখানে রাশি রাশি লাশ প'ড়ে আছে যেখানে মিলিটারি জওয়ান টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর, শকুনেরা লোভ ও সতর্কতা নিয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে। সত্যি, শকুন বলেই মনে হচ্ছে এই টহলদার সৈনিকগুলোকে। শকুনেরাই ভালবাসে মৃতদেহ—মৃতদেহ ঘিরে ব'সে থাকে, ঘুরে বেড়ায়। শকুনেরা ভালোবাসে প্রাণ নয়, মৃতের শরীর। প্রাণবান মানুষকে দেখলেই তাকে শব বানাবার ইচ্ছে জাগবে ওদের, মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠবে হাতের রাইফেল। অতএব বাঁচতে হ'লে ওদের দৃষ্টি এড়াতে হবে। কিন্তু রান্নাঘরের তালা খুলতে গেলে ওদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা পৌণে ষোলো আনা যে। তা হ'লে ছেলে-মেয়েদের খাওয়ার কী হবে? ঘরে শুধুই চাল আছে। আর কিছু নেই। ইলেকট্রিক হিটার রান্নাঘরে। রান্নাঘরের মিটসেফে গতরাতের বাসি ব্যঞ্জনও আছে। নষ্ট হয় নি। জ্বাল দিয়ে খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে কথা আমিনা এখন মনেও আনলেন না। পানিতে চাল ভেজাতে দিলেন। ঘরে চিড়ে থাকত যদি! কতো কাল তারা চিড়ে খায় নি। এই মুহূর্তে মনে হ'ল চিড়ে অতি উত্তম খাদ্য। ঘন্টা খানেক পরে চালগুলো ভিজে একটু নরম হ'লে তা-ই একটু চিনি দিয়ে ধরলেন ছেলে-মেয়েদের সামনে। নিজেরাও খেলেন। খাওয়া মানে দু বার মুখে দিয়ে এক গ্লাস করে পানি খাওয়া। কতো জনের এই খাওয়া জন্মের মতো ঘুচে গেল এই রাতে! তাদেরও যেতে পারত।....এমন চিন্তায় আক্রান্ত হ'লে কোনো-কিছু আর খেতে ভালো লাগার কথা নয়। সুদীপ্তর ক্ষিধে কোথায় উরে গেল।

...আচ্ছা, তখন ম'রে গেলে আমরা এখন কোথায় থাকতাম! ওই যে লাশগুলো প'ড়ে আছে ওর মালিকরা গেছে কোথায়?—খুবই ছেলেমানুষের মতো একটা ভাবনা এল সুদীপ্তর মধ্যে। বোধ হয়, মনে মনে খুবই দুর্বল হয়ে বাল্যভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তিনি আর ভাবছিলেন—মরবার পর একবারও কি এই ফেলে-যাওয়া সংসারে বেড়াতে আসা যায় না। হ্যাঁ, তা গোপনেই তো। তাঁর এই বিছানা-বালীশ, টেবিল-চেয়ার সবি ঠিক এমনিই থাকবে, কোনো সময় কেউ না থাকলে, গোপনে এসে একবার তিনি ব্যবহার ক'রে যাবেন। ঐ আলমারির বইগুলি মাঝে মাঝে এসে নেড়েচেড়ে দেখবেন। সম্ভব নয় সেটা? না না, এ প্রচণ্ড অবিচার। তাঁর সব কিছু থাকবে, কেবল তিনি থাকবেন না—এ কখনো হয়, না। কিন্তু সংসারে সেইটেই তো হয়। পরকালের বাগানের একটি ফুলও মর্ত-সংসারের কাউকে উপহার দেবার অধিকার তোমার নেই। পুব দিকের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে অকারণেই নানা চিন্তার সুলভ শিকারে পরিণত হ'তে দিচ্ছিলেন নিজেকে। ঐখানে না দাঁড়ালেই তো হয়। বার বার তবু এই পুব দিকের জানলার পাশেই দাঁড়াচ্ছিলেন এসে। এবং একটি মাত্র

চোখ মেলে দেওয়া যায় এমনি একটুখানি পর্দা ফাঁক ক'রে বাইরে দেখছিলেন। প'ড়েই আছে সেই লাশগুলো। কতগুলো হবে? গুণে দেখবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হলেন। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি হয়ে এমনভাবে সেগুলো প'ড়ে আছে যে, গণনার চেষ্টা বৃথা। আজ রোদটাও হয়েছে অতি প্রখর। লাশগুলো ঝলসে যাচ্ছে। জীবনে ওরা নিশ্চিন্ত ছায়ার আশ্রয়ে দু'দিন বাঁচতে চেয়েছিল।

'তুমি অত করে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো না তো।'

আমিনা তাড়া দিলেন সুদীপ্তকে। হ্যাঁ, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। তাছাড়া, জানলার বাইরে তো দৃশ্য আজ একটাই। সকাল থেকে যেমনটি দেখে আসছেন ঠিক তেমনি ওই মাঠ, মাঠের এক কোণে মরা মানুষের স্তূপ, ওই সেই আপন আপন জায়গায় দাঁড়িয়ে-থাকা গাছগুলি, ওই বিপুল সুউচ্চ জলাধার, ওই ক্লাব, ক্লাবের ওপাশের লাল দো-তালা বাড়িটা...সব স-ব আছে—একটি মাত্র ছবির মতো। অন্যদিকে? হাঁ এরাই জন্ম দেয় প্রতি মুহূর্তের কতো অজস্র দৃশ্যমালার। আজ সেই দৃশ্যেরা কোথায়? ক্লাব-প্রাঙ্গণের গাছটা কতো নিঃসঙ্গ। সুদীপ্তর নিঃসঙ্গতাকে সে যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে ওইখান থেকে।

শেষ পর্যন্ত জানলার কাছ থেকে স'রে এলেন সুদীপ্ত। স্ত্রীর কথাতেই স'রে এলেন। কিন্তু। স'রে এলেই বা স্বস্তি কই? উত্তর দিকের জানলায় আবার চোখ রাখলেন অতি সন্তর্পণে। সামনের একতালা পাশাপাশি দুটো বাংলো। খালি প'ড়ে আছে। পুব দিকেরটাতে থাকতেন উর্দু ও ফারসী সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ সাদানী। কবি ও পণ্ডিত হিসাবে তাঁর খ্যাতির কথা সুদীপ্ত শুনেছেন। শুনেছেন। কেননা জানবার অবসর জীবনে পাননি। দেখা হ'লে সুদীপ্ত তাঁকে সালাম দিয়েছেন বহুবার। এবং উত্তর পেয়েছেন। তার অতিরিক্ত একটা কথাও নয় কিন্তু। ওই দিক থেকে, সুদীপ্ত ভেবে দেখেছেন, একজন মানুষের মতো মানুষ ছিলেন অধ্যাপক ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব, সংক্ষেপে জি. সি. দেব। সুদীপ্ত সবে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে দেখা হ'তেই যথারীতি আদাব দিয়ে তিনি স'রে যাচ্ছিলেন। গোবিন্দবাবু যেতে দিলেন না। নতুন মানুষ দেখে পরিচয় শুধালেন। এবং সুদীপ্ত অবাক হলেন এই দেখে যে নাম শুনেই গোবিন্দবাবু তাঁকে চিনলেন। তাঁর সদ্য-প্রকাশিত কবিতার বইটি তিনি পড়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সাহিত্যের অধ্যাপকও তা পড়েন নি। এতো বিচিত্র পিপাসা ছিল ভদ্রলোকের। দর্শনের অধ্যাপক হয়েও কবিতার পিপাসা, হিন্দু হয়েও ইসলামকে জানার পিপাসা, বিশুদ্ধ বাঙালি হয়েও বিশ্বমানবের সকলের সঙ্গে মিলনের পিপাসা। পক্ষান্তরে প্রফেসর সাদানী? বাংলাদেশে অমন কম ক'রে হ'লেও তিরিশ বছর বাস করেছেন। সাহিত্যের অধ্যাপক। তাও আবার কবি। অথচ কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষা বাংলার প্রতি কোনো আগ্রহ কখনো তার মধ্যে দেখা যায় নি। বাংলা বলতেও শেখেন নি। এবং তা না শেখার জন্য তাঁর নাকি একটা গর্ববোধ ছিল মনে মনে। সামাজিক

কুপমণ্ডুকতা সৃষ্টি ক'রে রক্তের বিশুদ্ধি রক্ষার মতো তিনি নাকি তাঁর জবানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছেন। অনার্য বাঙালির সঙ্গে বেশি মাখা-মাখি তিনি পছন্দ করতেন না। সেই সাদানী গতবার মারা গেলে বাঙালিরাই বুক ভাসিয়েছিল সভা ক'রে। বলা হয়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্তম্ভ নাকি খ'সে গেছে। কিন্তু ঐ স্তম্ভটা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কি শোভা বাড়াচ্ছিল সেটা সুদীপ্তর কাছে স্পষ্ট হয় নি কোনদিনই।

ডঃ সাদানীর বাংলোর পশ্চিম-সংলগ্ন এই বাংলোতে থাকতেন অধ্যাপক মনিরুজ্জামান—পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান। বাংলোটা এখন খালি। সপ্তাহ দুয়েক হ'ল, তিনি চৌত্রিশ নম্বর দালানের একটা ফ্ল্যাটে চ'লে গেছেন। ভালোই করেছেন। বেঁচে গেছেন ভদ্রলোক। তাঁর ভাগ্যই তা'কে এই অভিশপ্ত এলাকা থেকে সসম্মানে নিরাপদ এলাকায় নিয়ে গেছে। কী আশ্চর্য বোকার মতো সুদীপ্তর তখন মনে হচ্ছিল, একমাত্র তাঁদের এলাকা ছাড়া ঢাকা শহরের আর সকলে দিব্যি সুখে আছে খাচ্ছে, গল্প করছে, কিংবা ঘুমুচ্ছে। না হয় তাস খেলছে। মানুষ বোধ হয় নিজের ট্রাজেডিকেই বড়ো ক'রে দেখতে ভালোবাসে। আবার স্ত্রীর তাড়া খেলেন সুদীপ্ত—

'জানলার ধারে এতো কি দেখছ তুমি! তুমি দেখছি একটা বিপদ না বাধিয়ে ছাড়বে না?

তাই তো। কি এতো দেখছেন তিনি! উত্তরের এই জানলাটা দিয়ে ওই প্রধান সড়কের কিয়দংশ দেখা যায়। সেই মুহূর্তে একটা ট্যাঙ্ক ছুটে যাচ্ছিল। সুদীপ্ত জীবনে এই প্রথম ট্যাঙ্কের দৌড় দেখলেন! ঢাকা শহর কি তা হ'লে এতোই বিদ্রোহী হয়েছে! ট্যাঙ্ক ব্যবহার না করলে হালে পানি পাচ্ছে না পাক-বাহিনী!

আমিনার তাড়ায় জোহরের নামায প'ড়ে কোরান শরীফ নিয়ে বসতে হল সুদীপ্তকে। নামাজ ও কোরান পাঠের জন্য ইতিপূর্বেও তিনি একাধিকবার স্ত্রীর তাড়া খেয়েছেন। কিন্তু অধম স্ত্রীজাতির কথাকে কখনো আমল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন নি। আজ কিন্তু ভারি সুবোধ অনুগত স্বামীর ভূমিকা পালনে প্রবৃত্ত হলেন। মনে পড়ল, সেই কবে কতো কাল আগে মরণাপন্ন মায়ের কাছে ব'সে কোরান পড়েছিলেন। তিনি তো জানতেন না, আজো তিনি যে কোরান নিয়ে বসেছেন তাও একটি মৃত্যু-শিয়রের পাশেই। তিনি জানতেন না যে, নিচের তলায় প'ড়ে ডঃ ফজলুর রহমানের মৃতদেহ, নাকি হতচেতন দেহে মৃত্যু আসতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল তখনো। ডঃ রহমানের নিকটতম জীবিত ব্যক্তি সুদীপ্ত কোরান নিয়ে বসেছেন। আহা, এই এলাকার কতো জনই তো মরেছে আজ! সকলের আত্মার কল্যাণ হোক। অনেক বছর পর অনেকক্ষণ ধ'রে কোরান শরীফ পাঠ করলেন অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন। ক্রমে সন্ধ্যা এল।

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমিনা গিয়ে রান্নাঘর খুললেন।

স্বামী ও ছেলে-মেয়েদের সামনে যখন ভাত-তরকারি তুলে ধরলেন তখন কত রাত। তাকে রাত বলে না। সন্ধ্যা আটটা। সেই সন্ধ্যা আটটাতেই তখন ঢাকা শহরকে মৃত প্রেত-পুরী মনে হ'তে লাগল। কোথাও কোনোদিকে একটু আলো জ্বলুক! কিম্বা কোনো শব্দ! ওহ্, কী ভয়াবহ। সুদীপ্তর মনে হ'ল, ছোট-বড় মিলিয়ে তাঁরা এই পাঁচজনই কেবল সমগ্র ঢাকা শহরে জীবিত আছেন। এক বিশাল আলবট্রসের পাখার নিচে সমগ্র নগরী যেন দুঃস্বপ্নগ্রস্ত। খেতে গিয়ে একটি গ্রাসও মুখে তুলতে পারলেন না সুদীপ্ত। উঠে পড়লেন।

বেশিক্ষণ কিন্তু এ অবস্থাটা থাকল না। আলো দেখা গেল। পাকসেনারা আবার আগুন দিয়েছে শহরের বিভিন্ন এলাকায়। আবার গুলি চালাচ্ছে। তবে আশে-পাশে কোথাও ব'লে মনে হচ্ছে না। একটু দূরে দূরে। বোধ হয়, গতকাল তাঁদের এলাকার কাজ শেষ ক'রে আজ অন্য এলাকা ধরেছে। এমনি চলতেই থাকবে নাকি! আচ্ছা জাতাকলে ফেলেছে রে বাবা! সারা শহরে কারফিউ দিয়ে রেখে দিব্যি এখন একটা একটা করে ধ'রে সাবাড় করবে সকলকে। মানে, সকল বাঙালিকে? এতো ঔদ্ধত্য ওই পশ্চিম পাকিস্তানিদের!

পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্ধত কণ্ঠস্বর রেডিওতে বেজে উঠল—শেখ মুজিবুর রহমান দেশের শত্রু, বিশ্বাসঘাতক..। কে বলছে এ কথা? স্বয়ং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। কিন্তু বাঙলাদেশের প্রত্যেকটি ছেলেবুড়ো জানে, শেখ মুজিবুর রহমান তাদের বন্ধু। বাঙলার বন্ধু শেখ মুজিব। কিন্তু বাঙলার শত্রুরা কী বলে শোনো।...দেশকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। সে জন্য তাঁর শাস্তি না হয়ে যায় না। ...শেখ মুজিবুর রহমানের শাস্তি! দেবে ইয়াহিয়া খান! অভিযোগ? পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ কথা শুনে এখন মুখ খিস্তি করতে ইচ্ছে করে,—ওরে খবিশের বাচ্চারা, পাকিস্তান বানিয়েছিল কারা? তোরা তখন তো ইংরেজ সরকারের বন্দুকের নল সাফ করতিস। আর শেখ মুজিব তখন তরুণদের মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আজ মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি হ'ল? শেখ মুজিবের পেছনে আজ সাড়ে সাত কোটি মানুষের সমর্থন আর তোর পেছনে? কয়েকটা বন্দুক আর গোলাবারুদ। কিন্তু বন্দুক মানুষেই বানিয়েছে না? মানুষের চেয়ে সেই বন্দুকের ক্ষমতা কখনো বেশি হয় নাকি। নিশ্চয়ই মানুষের জয় হবে। জয় হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের। কত রক্ত নেবে পিশাচেরা! বঙ্গবন্ধু তো বলেই দিয়েছেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি প্রয়োজন হ'লে আরো রক্ত দেব। দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইন্‌শাআল্লাহ্।'...বঙ্গবন্ধুর সেই সাতই মার্চের কণ্ঠস্বর। একবার তা যে বাঙালির কানে গেছে জীবনের মতো সে হয়ে গেছে অন্য মানুষ। কিন্তু হয় নি যারা? তারা মানুষ নয়। তারা ওই রক্তলোভী পিশাচের দলে। রক্তপায়ী জীবটা এখন বলে কি! পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।....আবার মুখে গাল এসে গেল সুদীপ্তর। অমন যে নিরীহ অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন, তিনিও ক্রোধে প্রায় দিশেহারা হলেন—ওরে হারামের হাড়, সংহতি মানে কী? বিনা

বাধায় পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ত চুষতে দেওয়ার নাম সংহতি? তোদের ওই সংহতির নিকুচি করি। রাগে রেডিওটাকেই এখন তুলে আছাড় মারতে ইচ্ছে করছে। নাহ্ রেডিওর কাছ থেকে এখন স'রে যাওয়াই ভালো। ঘরের অন্য কোণে চলে গেলেন সুদীপ্ত। খাটের একাংশ পুড়ে গেছে, শুতে গেলে ভেঙ্গে পড়তে পারে। অতএব মেঝেতে সপ বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন—ঘুমোনোর উদ্দেশ্য নয়। সাতই মার্চের রেসকোর্স মাঠে এখন ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। অতীতের কোন আনন্দক্ষণে আত্মনিমজ্জনের মধ্যে বেঁচে ওঠার কোন রসদ যদি মেলে। হাঁ বেঁচে ওঠার একটি মন্ত্রই আজ বাঙালি জপ করতে পারে সেই অগ্নিমন্ত্রের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। না, নাম-জপ নয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশকে জপমন্ত্রের মতো সারাক্ষণ মনের মধ্যে জাগ্রত রেখে কর্মের পথ বেছে নিতে হবে...'আর যদি আমার মানুষের উপর একটি গুলি চলে, তোমাদের উপর নির্দেশ রইল, ঘরে ঘরে দুর্গ গ'ড়ে তোলো'।...আমরা যদি প্রত্যেকে নিজের ঘরকে এক-একটি দুর্গ ক'রে তুলতে পারতাম। মুজিব ভাই, তোমার বাংলাদেশ একদিন ওদের জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ হবেই। কিন্তু তার আগে একটি নয়, বহু গুলি তারা চালাবে তোমার দেশের মানুষের উপর।

উহ্, আবার সেই কাল রাতের মতোই গুলি-গোলা শুরু হ'ল। বকসিবাজারের দিকেই আগুনের শিখাটা যেন বেশি দেখা যাচ্ছে। আগুন আর গুলি-গোলার আওয়াজ। সেই রাতও গুলি-গোলার বিচিত্র শব্দ শুনে কাটল। কারফিউ উঠল সকালে একটু বেলা হওয়ার পর।

আর কারফিউ উঠে যেতেই সেই ইচ্ছেটা প্রবল হ'ল সুদীপ্তর মধ্যে। একটু সে ঘুরে দেখবে কী-ঘটেছে গত ত্রিশ ঘন্টায়। কিন্তু দেখবার বহু কিছু তার ঘরেই ছিল। বসবার ঘরের প্রবেশ-দরজা খোলাই প'ড়ে আছে। দরজার গায়ে তিনটে গুলির দাগ। কয়েকটি ছবি টাঙানো ছিল ঘরে—রাফায়েল, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, জয়নুল আবেদীন ও কামরুল হাসানের আঁকা কয়েকখানি ছবি। প্রত্যেকটাতে গুলি করেছে সেই বর্বরের দল, কিন্তু ভারি আশ্চর্য তো। পুব দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ অক্ষত আছেন। সুদীপ্ত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকেঃ তোমাকে দেখলে বর্বরও বর্বরতা ভোলে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে গুলি করে নি ওরা। আর গুলি করেছে সর্বত্র—ঘরের মেঝেতে, দেওয়ালে, এমন কি তাঁর সখের ক্যালেণ্ডারখানিতেও।

সুদীপ্ত বেরিয়ে গেলেন। প্রথমেই গেলেন তিন তলায়। ডঃ ফজলুর রহমানেরও ড্রয়িং রুম খোলা। লোকটি ড্রয়িং রুমেই পড়ে ছিল। ডঃ রহমানের বৃদ্ধ বাবুর্চি। মুখভরা দাড়ি, পরহেজগার মানুষ। রহমান সাহেবদের গ্রামেই বাড়ি। ছেলে-বেলায় এর কোলে-পিঠে চ'ড়ে রহমান সাহেব মানুষ হয়েছেন। তিনিই প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন—

'চাচা মিঞা, চল। তোমাকে ঢাকা নিয়ে যাই। দুটো রেধেবেড়ে খাওয়াবে, আর থাকবে আমাদের সঙ্গে।'

মন্দ কি! গ্রামেও তার তিন কুলে কেউ নেই যখন। অতঃপর ঢাকায়

এতোকাল বেশ ভালোই কেটেছে। কিন্তু হঠাৎ এ কী ঘ'টে গেল! জওয়ানরা এসে ধাক্কাধাক্কি শুরু করলে নিজেই গিয়ে কপাট খুলে দিয়েছিল সে। বুড়ো মানুষের গায়ে কি আর ওরা হাত দেবে! সভ্য মানুষের মতোই চিন্তা করেছ তুমি। কিন্তু পাকিস্তানিদের চিন্তা অন্য রকম। মানে কী রকম সেটা? ঐ বৃদ্ধের সর্ব শরীরে তার পরিচয় আছে। না, মেরে ফেলে নি। মাত্র দুটো গুলি করেছে—একটা পায়ে এবং একটা হাতে। রক্তের ধারা গড়িয়ে মেঝে ভিজে গেছে। সে প'ড়ে আছে। সুদীপ্তকে দেখে শুধু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকাল তাঁর পানে, কোনো কথা নেই মুখে। কেবল চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে গেল।

এবং তখনি মনে হ'ল ডঃ ফজলুর রহমানের ভাগ্যেও কি তবে...? না, তা না হ'তেও পারে। তাঁদের মতোই তিনিও লুকিয়ে বাঁচতে পারেন না? হাঁ, বেঁচেই আছেন হয়ত। আশাটাকে দু'হাতে বুকে চেপে সুদীপ্ত ভেতরে গেলেন। হায় হায়, কাঞ্চন যে! শয়ন কক্ষের সামনে বারান্দায় কাঞ্চনের লাশ প'ড়ে আছে। ডঃ ফজলুর রহমানের ভাগনে কাঞ্চন। মামার কাছে থেকে কলেজে পড়ত। কলেজে? ব্যাস, তবে আর কথা নেই। এ ছেলে রাষ্ট্রদ্রোহী না হয়ে যায় না। রাষ্ট্রদ্রোহী যে, তার আরো প্রমাণ আছে। স্বাস্থ্য ভালো ছিল কাঞ্চনের। খেলাধুলা করা সবল সুস্থ একজন বাঙালি যুবক। ওরে বাবা। তা হ'লে তো একে বাঁচতে দেওয়া যায় না। ভাগনে কাঞ্চনকে মেরে শোবার ঘরে ঢুকে মামাকে মেরেছে। দেয়াল-আলমারির পাশে কাত হয়ে প'ড়ে আছেন ডঃ ফজলুর রহমান। আলমারি খোলা! আলমারিতে ডঃ রহমান কিছুই রাখতেন না নাকি! নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু রাখতেন। কিছুই তার অবশিষ্ট নেই। রহমান সাহেবের গায়ের সৌখিন পাঞ্জাবীতেই সাক্ষ্য দিচ্ছে, তিনি ভদ্র পোশাকে ভদ্রলোকের মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। এবং ঐখানেই ভুল করেছিলেন। ভুল করতে যাচ্ছিলেন সুদীপ্তও। স্ত্রীর বুদ্ধিতে বেঁচে গেলেন, স্ত্রী ছিলেন না ব'লে রহমান সাহেবের ভুল শুধরে দেবার কেউ ছিলেন না। কিন্তু অনেকেরই তো স্ত্রী ছিলেন। যেমন অধ্যাপক মনিরুজ্জামনের, ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার, ডঃ মুকতাদিরের। তাঁদেরকে ভালো মানুষ সেজে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরেছে। কিন্তু সাদেক সাহেবকে তো মেরেছে স্ত্রীর সামনেই গুলি ক'রে। না, কোনো এথিক্‌স্ মেনে ওরা কাজ করে নি। যা ইচ্ছে করেছে। যা ইচ্ছে? এমনি ক'রে ইচ্ছার লাগাম ছেড়ে দেওয়া কি মানুষকে সাজে। বার বার চিন্তায় ভুল হয়ে যাচ্ছে সুদীপ্তর। তাঁর চিন্তা কেবলি বিবর্তিত হ'তে চাইছে মানুষকে কেন্দ্র ক'রে। অতএব এ হেন চিন্তা সম্পদ নিয়ে অমানুষের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা তিনি কেমন ক'রে পাবেন? হুহু ক'রে শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন সুদীপ্ত। ভাই ফজলুর রহমান, দু'জনে সেদিন কত তর্ক করলাম রে! তর্ক হয়েছিল সংস্কৃতির ব্যাখ্যা নিয়ে। ডঃ রহমান সংস্কৃতির বিকাশে ধর্মের গুরুত্বকে স্বীকার করেন

প্রবলভাবেই। সুদীপ্ত করেন না। তাই নিয়ে তর্ক। কিন্তু মনোমালিন্য নয়। মাত্র চার দিন আগের কথা। সদ্য তিনি অসুখ থেকে উঠেছেন। পানিবসন্তে ভুগে কেমন ম্লান দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে। কিন্তু মুখের সেই হাসিটুকু ঠিকই ছিল। আর সেই হাসি সুদীপ্ত কখনো দেখবেন না। চোখের পানি মুছতে মুছতে তিনি বেরিয়ে এলেন। এবং তখনি মনে হ'ল ছাদটা একবার দেখা দরকার। পরশু রাতে অত দাপাদাপিটা শোনা গিয়েছিল কিসের? ভাবতে ভাবতেই আর নিচে না নেমে উপরে চললেন। সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে একটি কাঁথার উপরে পড়ে আছে একটি শিশু-কন্যা। থমকে দাঁড়াতে হ'ল। এতো কচি মেয়েটাকেও ওরা মেরেছে। গলায় গুলির দাগ। নাকি বেয়নেটের খোঁচা! কত বয়স হবে? দু'মাস? তিন বা চারমাসের বেশি কিছুতেই নয়। কিন্তু মেয়ের মা কৈ? ছাদে কোনো যুবতী স্ত্রীলোকের লাশ সুদীপ্ত দেখলেন না। বয়স্ক পুরুষের লাশও না। বেশির ভাগই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং কয়েকজন ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। সব মিলে প্রায় তিরিশ-চল্লিশ জন হবে। ছোট ছেলে-মেয়েরা প্রাণের ভয়ে গড়িয়ে গিয়ে পানির চৌবাচ্চার নিচে লুকিয়ে ছিল। সেই খানেই গুলি ক'রে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হাঁ, ঘুমিয়ে থাকার মতোই দেখাচ্ছে। অনেক কটি ভাই-বোন এক শয্যায় শুয়ে ঘুমালে সকাল বেলায় তাদের কেমন দেখায়? কে কোথায় পা রেখে, কোথায় মাথা রেখে এলোপাথাড়ি ঘুম দিচ্ছে, কোনো চিন্তা-ভাবনা কিংবা সৌজন্যবোধের বালাই নেই—এ যেন অনেকটা তেমনি। তেমনি? এমনি রক্তের উপর প'ড়ে থাকে নাকি তারা! আহা, এতোগুলি কচি ছেলে-মেয়েকে মারতে ওদের হাত পা কাঁপেনি! ফজলুর রহমানকে দেখে সুদীপ্ত কেঁদেছিলেন। কিন্তু এতগুলি মানবসন্তানের এই নিষ্ঠুর পরিণতি সুদীপ্তকে লজ্জা দিল। বনের পশুও তো কেউ এমন ক'রে মারে না। দু'মাসের শিশুকে বনের বাঘও তো আক্রমণ করবে না। ক্ষুদ্র মানব-শিশু রমুলাসকে লালন করে নি বনের এক বাঘিনী? হ্যাঁ, মানুষ পশুরও অধম কখনো হয়। কিন্তু সব মানুষ হয় না। যারা হয় তাদের সঙ্গে কি একত্র থাকা চলে? না, আর ওদের সাথে নয়। ফিরোজ ঠিকই বলে। ফিরোজ বলে, ব্রিটিশ রাজত্বে বাংলাদেশের অবস্থা যেমন ছিল এখনো ঠিক তেমনি আছে। স্বাধীনতা-সংগ্রাম এখনো তাই শেষ হয় নি। শেষ কী? শুরুই তো হয় নি এতোকাল। শুরু হয়েছে গত ৭ই মার্চ থেকে। মুজিবুর রহমান গণ-আন্দোলন শুরু করলেন।...আমাদের এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। স্বাধীনতা? প্রশ্ন তুলেছিলেন সুদীপ্ত। বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করেছিলেন। কিন্তু আর তো তর্কের অবকাশ নেই। পাকিস্তান নামে কোনো দেশ পাঞ্জাবসিন্ধু অঞ্চলে থাকতে পারে, বাঙলায় নেই। থাকলে তো ওরা-আমরা মিলেমিশে একই দেশের অধিবাসি হতাম। এবং তা হ'লে এমনি ক'রে নির্বিচারে নারী-শিশু-বৃদ্ধ সকলকে ওরা হত্যা করতে পারে? নিজের দেশের লোক হ'লে এমনি করে নিরপরাধ জনসাধারণকে মারতে পারে কেউ? পরের দেশেও এমন ঢালাও গণহত্যার কথা কচিৎ শোনা গেছে!

গতকালের দেখা সেইসব দৃশ্যাবলি সুদীপ্তর চোখে এখনও ভাসছে। এখন তাঁর মনে হচ্ছে, জীবনে আর কখনো বোধ হয় কোনো মুহূর্তটি একা ব'সে কাটাতে পারবেন না। একা হ'লেই ওরা এসে ঘিরে ধরে যে। চিলেকোঠার ছাদে সে বাপ-ছেলের লাশ! আর সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দু-মাসের শিশু-কন্যা। কিংবা দেখ, জলের ট্যাঙ্কের নিচে সেই জড়াজড়ি ক'রে পড়ে থাকা ছেলেরা। কে যেন কান ধ'রে ঐগুলোই দেখাতে নিয়ে যায় বারে বারে।

দু'তলার সিঁড়িতেই দৃশ্যটা ছিল সবচেয়ে মর্মান্তিক। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে সুদীপ্ত প্রায় মূর্ছা যাচ্ছিলেন। দেয়ালের গায়ে স্ত্রীলোকের মাথার চুল। মনে হচ্ছে দেয়ালের শরীর ফুঁড়ে বেড়িয়েছে। একটা দুটো নয়, এক গোছা চুল—প্রায় দু ফুট দীর্ঘ। ঠিক তার সামনেই দুধাপ পরে রক্তের ধারা জমাট বেঁধে আছে। সুদীপ্তর মনে হয়েছিল ছাদের ঐ তিন-চার মাসের শিশু-কন্যার সাথে এই রক্তের যোগ আছে। যুবতী মায়ের কোল থেকে ঐ শিশুকে ছিনিয়ে কাঁথার উপর ফেলে দিয়ে মাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বর্বরের দল। সন্দেহে কয়েকবার চীৎকার করেছিল সেই যুবতী জননী, তারপর সংজ্ঞা হারিয়েছিল! অসংবৃতার বিস্রস্ত দেহলতা চারতলা দালানের ছাদ থেকে চুল ধ'রে টেনে নামাচ্ছে। দৃশ্যটা কল্পনায় আসতেই সুদীপ্ত শিউরে উঠলেন। ঠিক অমনি ক'রে চুল ধ'রে টেনে হিঁচড়ে যদি না নামাবে তা হ'লে এক খাবলা মাংসসুদ্ধ চুলের গোছাটা এমন ভাবে উঠে আসবে কেন? আর উঠে আসতেই তারা সেটাকে ছুঁড়ে মেরেছিল দেয়ালে। কাঁচা মাংস দেয়ালে গাঁথা প'ড়ে চুলের গোছাটা এখন ঝুলছে। আর সেই মেয়েটি? মাংসসুদ্ধ মাথার চুল উঠে যাওয়ার ফলে নিশ্চয়ই বীভৎসদর্শনা হয়ে গিয়েছিল। তাই গুলি করে সেই মুহূর্তেই মারা হয়েছিল তাকে। এই রক্ত তার। আর এক তলায় নেমে সিঁড়ির প্রশস্ত চাতালের সেই রক্ত? ওখানেও পিশাচেরা কাউকে গুলি ক'রে থাকবে। কাকে? তার নাম নেই। কিন্তু চিহ্ন রেখে গেছে। ওই দেখ, ময়লা কাঁথা-বালিশের পুঁটলি, আর গুঁড়ো দুধের পরিত্যক্ত টিনপাত্রে কিছু চাল—বড়ো জোর সের খানেক হবে। ওই নিয়েই বাঁচতে এসেছিল এখানে। ওই সবি ফেলে এখন কোথায় গেছে? যেখানে গেছে আর সেখানে মৃত্যু নেই। প্রতি মুহূর্তে কি একটা আগলে-বেড়ানোর দায় নেই। অতএব শঙ্কাও নেই।

এতো শঙ্কা বয়ে বেড়াচ্ছি কেন আমরা? বাঁচতে চাই ব'লে? প্রতি মুহূর্তে শঙ্কা বুকে বয়ে বেঁচে থাকা যায় নাকি! বাঁচার নাম আনন্দ—সে জন্য শঙ্কা-পোষণ কেন? আনন্দ কুসুমের জন্ম সাহসের বৃন্তে। অতএব সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করলেন সুদীপ্ত। সাহস প্রার্থনা করলেন। তাও ব্যর্থ হ'ল। এখন কেবলি তাঁর শঙ্কিত হওয়ার পালা?...

সে কে? তার ভিক্ষাপাত্রে এক সের চাল ছিল, সেই যুবতী জননীর কোলে শিশু-কন্যাটি ছিল। সব ফেলে তারা চ'লে গেছে। বাসায় এক বস্তা চাল ও

কয়েক হাজার টাকার বই ও আসবাবপত্র ফেলে সুদীপ্তও চ'লে এসেছেন। কিন্তু সেই শঙ্কাটাকে সঙ্গে এনেছেন ঠিকই।

সেই শঙ্কাটা এখানেও সুদীপ্তকে তাড়া করল—ফিরোজের এই সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমের মধ্যেও। দেয়ালে ঝুলে-থাকা সেই চুলের গোছা সুদীপ্তর চোখের সামনে ভেসে উঠল। কে যেন একখণ্ড ভারি পাথর ঝুলিয়ে দিল বুকের উপর। আমিনা কখন উঠে চ'লে গেছেন। এখন তিনি ঘরে একা। এবং সেইটেই সব চেয়ে যন্ত্রণার। সামনের সাদা দেয়াল ফুঁড়ে এখনি যদি অমনি দীর্ঘ চুল গজায়? আরো তীক্ষ্ম একটা ভয় তাঁকে আক্রমণ করতে এগুচ্ছিল। কিন্তু তিনি বাঁচলেন একজন ভদ্রলোকের আগমনে। ভদ্রলোকের মুখ-ভরা দাড়ি। মৌলভী সাহেব বোধ হয়। পরিধানে পাজামা ও সেরওয়ানী, মাথায় টুপি। তিনি এসেই পরিষ্কার উর্দুতে ফিরোজ সাহেব ভেতরে আছেন কি না জিজ্ঞাসা করলেন। সুদীপ্ত একেবারে অবাক। এই ধরনের মানুষের সাথেও ফিরোজের দোস্তি আছে নাকি! সুদীপ্ত একটু বিস্ময় অনুভব করলেন। এবং বিস্ময় তাঁর সপ্তমে চড়ল যখন ফিরোজ এসে আগন্তুককে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন।—

'যাক তুমি এসে গেছ তবে। এখন খবর কি বল?

কিছু বলতে আগন্তুক ইতস্তত করছিলেন। ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি আছেন। ফিরোজ তা বুঝতে পেরে বললেন—

'হ্যাঁ, এর সামনে স্বচ্ছন্দে মুখ খুলতে পার। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। চেষ্টা করলেও আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

'বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সম্পর্কে তোমার ধারণা তো বেশ উচ্চমানের বোধ হচ্ছে।'

আগন্তুক ভদ্রলোক এবার পরিষ্কার বাংলায় ব'লে উঠলেন—

'আপনি ভাই রাগ করবেন না আপনাদের কিছু সংখ্যক অধ্যাপক সম্পর্কে আমাদের ধারণা সত্যই খুব নিম্ন মানের। উপকার-অপকারের প্রশ্ন বাদ দিন, কোনো কিছু করার ক্ষমতাই তাঁরা রাখেন না। কয়েকটা কথা মুখস্থ ক'রে সেইগুলি বছরের পর বছর ধ'রে আওড়ে অর্থোপার্জনটা একজন যথার্থ তোতা পাখির কর্ম ছাড়া কি?'

এ্যাঁ। এই মৌলভী সাহেব ধরনের লোকটি বলছেন এ কথা! চমকে উঠতেই তো হয়। মৌলভী সাহেব হ'লেই কেবলি হাদিস কোরানের কথা জানবেন তার কি মানে আছে! সুদীপ্ত বললেন, 'সে কথা, ধরুন, আলাদা ভাবে ব'লে কিছু লাভ নেই। কর্মজীবনের নানা স্তরে অমনি তোতা পাখিদেরই তো সংখ্যাধিক্য। যেমন দেশ, দেশের মানুষ যেমন, তেমনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও তেমনি। সমাজের কোনো-একটা অংশকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে পারেন কি?

'বুঝলে হে কোরায়শী' ফিরোজ বললেন, 'এই জন্যই এ ভদ্রলোক আমার বন্ধু! তুমি যতোই ঘা দিয়ে কথা বল, চটবেন না। তুমি রাগাতে চাইলেই উনি রাগবেন ভেবেছ!

সুদীপ্ত বুঝলেন, ফিরোজ কথার মোড় অন্য দিকে ফেরাতে চাইছেন। অতএব তিনি চুপ মেরে গেলেন। এবং যথারীতি আলোচনা অন্য মোড় নিল।

কোরায়শী নামক আগন্তুকটি জানালেন—

'তোমার বাড়িতে থাকা চলবে না। ওদের প্ল্যান হচ্ছে, আওয়ামী লীগের সকলকে ওরা হয় সাবাড় করবে, না হয় নীতি বিসর্জন দিয়ে দালালির কাজে লাগতে বলবে।' সামনে খুব দুর্দিন।'

'কিন্তু পালাতে হ'লে তো আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতে হয়। সে সব কলাকৌশল তো আমার জানা নেই'

মুশকিল ঐখানে। আওয়ামী লীগ সোজাসুজি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির রাজনীতি জানে। তার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধর্মঘট, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তগত করার কৌশলটুকুই তার আয়ত্তে। কিন্তু এর প্রত্যেকটিই হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশে উদ্ভূত পন্থা। কোরায়শী একদিন তর্ক করেছিলেন ফিরোজের সঙ্গে—

'তোমাদের নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন-এ সবের কোনটা দিয়ে তুমি মধ্যযুগে ক্ষমতায় যেতে পারতে শুনি!'

হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। মধ্যযুগের রাজনীতি ছিল যুদ্ধের রাজনীতি। কোরায়শী ভুল বলেন নি। ফিরোজদের পথ এ কালের পথ। একালের ধ্যান-ধারণায় যারা বিশ্বাসী হবে কেবল তাদের সঙ্গেই একত্রে এই পথে যাওয়া চলে। তর্ক করব, আলোচনা চালাব, এবং জনগণের মত যাচাই ক'রে যদি দেখি আমার পেছনে তাদের সমর্থন নেই তা হ'লে নিঃশব্দে স'রে দাঁড়াব; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই গায়ের জোর খাটাব না।—এই নীতি মধ্যযুগে কেউ কি মানত? এবং এখনো কি মানবে যারা মধ্যযুগে বাস করে? তাদের জন্য তো সেই মধ্যযুগীয় পন্থাই উত্তম। এসো, যে যাকে পারি, জোর যার, মুলুক তাঁর। এই কথাই মাও-সে-তুঙ্ বলেছেন একটু আধুনিক ভাষায়—ক্ষমতার উৎস হচ্ছে বন্দুকের নল। বন্দুকের নল দেখিয়ে বিগত চব্বিশ বছর পাকিস্তানের একটি সংখ্যালঘু অংশ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে শাসন ও শোষণ ক'রে আসছে। কি কচুটা তোমরা করতে পেরেছ শুনি! আওয়ামী লীগের মধ্যে কোরায়শী ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষপাতি। পঁচিশে মার্চের রাতের পর কোরায়শী সাহেবের মর্যাদা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন কোরায়শী সাহেবের যুক্তি-পরামর্শ সকলের কাছেই গুরুত্ব পাচ্ছে। ফিরোজকে তিনি পরামর্শ দিলেন—

'আণ্ডারগ্রাউণ্ডে তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আপাততঃ কেবল ঢাকা ছাড়লেই চলবে। কিন্তু বাড়ি ছাড়তে হবে আজই।'

'আজ বাড়ি ছাড়ব, কাল ঢাকা ছাড়ব। তারপর? দেশ ছাড়ব কবে?

'দরকার হ'লে তাও ছাড়তে হবে। কিন্তু সে পরের কথা। আমরা আপাততঃ চেষ্টা করব, পাকিস্তানিদের কেবলি ঢাকা শহরে আবদ্ধ রাখতে।'

না পারলে? সে সম্ভাবনা কোরায়শী সাহেব একেবারে অস্বীকার করেন না। তখন বাংলার যে-কোন খানিকটা অঞ্চলকে মুক্ত ক'রে রেখে সেইখানে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার করতে হবে এবং ধীরে ধীরে সারা বাংলাকে মুক্ত করতে হবে।

কথাগুলো শুনতে শুনতে সুদীপ্তর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার—স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা—এ সব কি বলছেন কোরায়শী সাহেব! এ সব তো তাঁর নিজের মনের কথা। বোধ হয় শুধু তাঁরই নয় প্রত্যেকটি বাঙালির মনের কথা। যে মন স্বপ্ন দেখে সেই মনের কথা। এবং একদিন যে তা সত্য হবে তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন সে কথা ভাবা যায়!

কেন, দু'দিন আগে সে কথা তোমরা ভাবো নি? সেই শিল্পী-সাহিত্যিকদের মিছিল। রাইটার্স গিল্ড থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত শোভাযাত্রা। কিংবা ঢাকা শহরের সকল শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের সেই মিলিত শোভাযাত্রা—বায়তুল মোকাররম থেকে শহীদ মিনার। সেখানে তোমরা শ্লোগান কি দিয়েছিলে, মনে আছে? মনে আছে। পাক-বাহিনী খতম কর—বাংলাদেশ স্বাধীন কর। বাংলাদেশ স্বাধীন কর—বীর বাঙালি অস্ত্র ধর। সেই স্বাধীনতার কথাই তো এখন বলছেন কোরায়শী সাহেব। অস্ত্রবলে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার কথা বলছেন। তা হ'লে? তা হ'লে আর কী! ভালো কথাই বলেছেন। কিন্তু? একটা 'কিন্তু" কিছুতেই মন থেকে দূর হ'তে চায় না।

কোরায়শী সাহেব চ'লে যেতেই ফিরোজের তাড়া খেয়ে সুদীপ্ত স্নানের ঘড়ে ঢুকলেন। পেছনে পেছনে ওরাও ঢুকল। সেই ভাবনাগুলি। ছেলেবেলায় সুদীপ্ত একবার একটা কুকুর পুষেছিল। কিছুতেই সে পেছন ছাড়তে চাইত না। লাথি মেরে তাড়াতে চাইলে সে আরো বেশি ক'রে পায়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়ে লেজ নাড়ত। আজ তার ভাবনাগুলি তেমনি অনুগত কুকুরের মতো হয়ে উঠেছে। ঐ দেখো, সে জল ভরতি টবে লাফিয়ে প'ড়ে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। চৈত্র মধ্যাহ্নের তপ্ত আবহাওয়াতে ঐ জলটুকু লোভনীয় ছিল বৈ কি। কিন্তু এখন যেন তা অস্পৃশ্য হয়ে গেছে! তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন সেই টবের সামনে।-----এখন তবে যাই কোথায়! ফিরোজের তো নিজেরই এখন অত্যন্ত দুর্দিন। তাঁর স্ত্রী একটু আগেই যা বলেছিলেন সেটা তা হ'লে খুবই সত্যি কথা। আমিনার কাল সকালের যুক্তিটাই বোধ হয় ভালো ছিল! কিন্তু কাল সকালে তখন কোনটা যে ভালো ছিল, আর কোনটা খারাপ, সে সব চিন্তার কোন অবকাশ ছিল নাকি! কী তাড়াতাড়ি তখন এক চক্কর ঘুরে এসেছিলেন! তাও আবার ফিরেছিলেন

ফিরোজের গাড়িতে। কিন্তু তার জন্যই কতো রাগ আমিনার।

'তোমার আক্কেলের বলিহারী যাই। কই, তাকিয়ে দেখ দেখি একবার, নীলক্ষেত এলাকায় কারা এখনও ব'সে আছে!'

সত্যি কথা! ইতিমধ্যেই তখন নীলক্ষেত এলাকা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। কিন্তু পথে এতোখানি বুঝা যায় নি। সেখানে অনেক মানুষ তখনও ছিল। অনেক অস্বাভাবিক মানুষ। আতঙ্ক-অঙ্কিত ললাট নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় সন্ধানে পথে-বেরুনো আদম-সন্তানেরা। তার মধ্যে তাঁর মতো কেবলি দেখতে বেরিয়েছে এমন মানুষও ছিল। দেখলেই চেনা যাচ্ছিল তাদের। তাদের হাতে কোনো বোঁচকা নেই বা সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক কি শিশু নেই। যানবাহনের দুর্ভিক্ষই সব চেয়ে বেশি। ভদ্র ঘরের নবনীকোমল মেয়েরাও ভারি ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে হেঁটে চলেছেন। তাঁদের অনেকেরই হয়ত গাড়ি আছে। কিন্তু গাড়ির তেল নেই। পেট্রোল পাম্পগুলি পাকিস্তানিরা নষ্ট ক'রে দিয়েছে, অথবা ঐ রাতে ওখানকার কর্মচারীদের সব মেরে ফেলেছে। দরিদ্র রিক্সাচালক কিংবা স্কুটার-ড্রাইভার বেশির ভাগই বোধ হয় মারা পড়েছে গত দু'দিনে। তা না হ'লে এখানে-ওখানে রিক্সা-স্কুটার অনেক প'ড়ে আছে, কিন্তু চালক নেই কেন?

সুদীপ্ত অবশ্য বেশি দূর যান নি। ইকবাল হল পেছনে ফেলে, সলিমুল্লাহ্ হল-জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন শহীদ মিনার পর্যন্ত। এবং ঐ পর্যন্তই আর এগোতে পারেন নি। ফিরেছিলেন ফিরোজের সঙ্গে। হায় হায়, ঐ, সব কি চোখে দেখা যায়! না, চোখে দেখে এগোনো যায়। জগন্নাথ হলের লাশগুলি অধিকাংশই ওরা পুঁতে দিয়েছিল। কিন্তু ইকবাল হল ক্যান্টিনের কাছে স্তূপীকৃত লাশগুলি ওরা সরায় নি। সেই লাশের স্তূপের মধ্যে একটা গুলি-ক'রে-মারা কুকুরও দেখা গেল। কি বলতে চায় ওরা? আমরা ওদের চোখে কুকুরের সমান? কোনো বাঙালির এ দৃশ্য সহ্য হবার কথা নয়। যারা দাঁড়িয়ে দেখছিল তাদের মধ্যে একজন কুকুরটার একটা ঠ্যাং ধ'রে একটু দূরে সরিয়ে রেখে এল। সুদীপ্ত স'রে ইকবাল হল সংলগ্ন দিঘির দক্ষিণ দিকের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। কয়েকজনকে সেখানে দাঁড়াতে দেখেই তিনি গেলেন। কী দেখছে ওরা? ওরে বাবা, কি বিরাট গর্ত ইকবাল হলের দেয়ালে।

'কামান দেগেছে ঐখানে।'—ভীড়ের মধ্যে একজনের মন্তব্য।

আর একজনের মন্তব্য শোনা গেল—

'ওরে বাবা, ঐ দিকেও কামান দেগেছে দেখা যায়। এ বিল্ডিং দুটোতেও ছাত্র থাকত নাকি!'

দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বিল্ডিং দু'টোর কথা। ওইখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস-কর্মচারিগণ থাকেন। ওদের বিল্ডিংয়ের দেয়াল যে একেবারে ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছে। ওখানে কেউ থাকলে তিনি কি বেঁচে আছেন। তাঁদের তেইশ নম্বরেও তা হ'লে এমনি ক'রে কামান দাগতে পারত। পারত বৈ

কি। সুদীপ্ত আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন। তাঁরা তেইশ নম্বরে অনেকের চেয়েই সুখে ছিলেন। তাঁদের সেই অবস্থাটা যদি সুখের অবস্থা হয় তা হ'লে, হায় গো, দুঃখ কাকে বলে? জগন্নাথ হলের দেওয়ালের গায়েও অমনি কামানের গোলার আঘাতে প্রকাণ্ড ছিদ্র সুদীপ্ত দেখলেন। এ হলের অবস্থা কি হয়েছিল? কে বলবে কি হয়েছিল! কিছু বলার জন্য কেউ বেঁচে আছে নাকি! কিন্তু ম'রে গিয়েও তো অনেক কথা বলা যায়। যেমন বলছেন এই মেয়েটি। সামাজিক মর্যাদার কোন ধাপের এ মেয়ে তা এখন আর বুঝবার উপায় নেই। কেননা অঙ্গে বস্ত্র অলংকার কিছু নেই! তবে উলঙ্গ শরীরে অলঙ্কারের চিহ্ন আছে। কানের মাকড়ি খুলে নেবার ধৈর্য দুর্বৃত্তদের ছিল না। কান ছেঁড়া দেখেই বুঝা যায়, কী পৈশাচিক প্রক্রিয়াতে সেটা তারা হস্তগত করেছিল! চুড়ি খোলার সময় হাতের মাংস ছিড়ে ছিড়ে গেছে-সে সব স্থানে রক্ত জমাট বেধে আছে। আর মুখের মধ্যে দাঁতে লেগে আছে কাঁচা মাংস। কামড়ে তুলে নিয়েছিলেন বোধ হয়। বোধ হয় কেন, সুদীপ্ত যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, সম্ভ্রম রক্ষার শেষ চেষ্টায় অসহায় নারী প্রাণপণে কামড়ে ধরেছেন বর্বরের পূতি-দুর্গন্ধ দেহ। দাঁতে লেগে থাকা মাংস তারই সাক্ষ্য। ঠিক এমনি কিছু না হ'লে তো ক্যান্টনমেন্টের গণিকাবৃত্তি ভাগ্যে জুটত। পেটের অবস্থা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রমণী সন্তান সম্ভবা ছিলেন। এবং পাষণ্ডরা গুলি করেছে পেটের মধ্যে সন্তান থাকার সেই জায়গাটিতেই—তলপেটে, আর একটা বুকে। পেটের সন্তানকেও গুলির হাত থেকে রেহাই দেয় নি ওরা। ওই শবের পানে অধিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলেন না সুদীপ্ত। মা গো, তোমার লজ্জা আমরা ঢাকব কি দিয়ে।—দু'হাতে চোখ ঢেকে সেখান থেকে স'রে এলেন সুদীপ্ত।

কোথায় এলেন তিনি। এখানে শহীদ মিনার ছিল না? সেটা কোথায়? কোন চিহ্নই নেই। তবু চিহ্ন আছে। প'ড়ে আছে বালি-সিমেন্টের স্তূপ। ডিনামাইট দিয়ে গোড়াসুদ্ধ নির্মূল ক'রে দিয়েছে বাঙালির মর্যাদার প্রতীক সেই প্রাণ প্রিয় শহীদ মিনার। এই তো ক'দিন আগে এইখানে শপথ নিয়েছিলেন তাঁরা—ঢাকার শিল্পী-সাহিত্যিকেরা। কবিবন্ধু শামসুর রাহমানের কণ্ঠে সুদীপ্তদের সকলের দৃপ্ত শপথ বেজে উঠেছিল—আমরা লেখনীকে আজ দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের হাতিয়ার করব। তা করতেই হবে যে। আর তো ফুল খেলবার দিন নয়, ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে এখন যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করলেন সুদীপ্ত। হাঁ তো, অবিকল সেই সুভাষদার কণ্ঠস্বর। সুদীপ্তর কানের কাছে মুখ রেখে তিনি বলে যাচ্ছেন— মৃত্যুর ভয়ে ভীরু ব'সে থাকা, আর না/পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা/ প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয়, অদ্য/এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা/দুর্যোগে পথ হোক দুর্বোধ্য/চিনে নেবে যৌবন-আত্মা।

এবারের একুশে ফেব্রুয়ারিতে রাত দুপুরের অনুষ্ঠানে সুদীপ্ত এখানে

এসেছিলেন। কেননা শুনেছিলেন, স্বয়ং শেখ সাহেব ঐ সময় আসবেন। এসেছিলেনও শালপ্রাংশু বজ্রমানব শেখ মুজিবুর রহমান। কেমন যেন ম্লান দেখাচ্ছিল না মুজিব ভাইকে? ওকে ম্লান বলে নাকি! ঠিক কেমন যে দেখাচ্ছিল কোনো শব্দ দিয়ে তা যেন প্রকাশ করা যায় না। দুর্জয় সেনাপতির প্রতিজ্ঞা, জননীর মমতা এবং ষড়যন্ত্রসঙ্কুল ভবিষ্যতের আশঙ্কা–সবকে এক পাত্রে ঢেলে মিশালে যা দাঁড়ায় মুজিব ভাইয়ের মুখে-চোখে ছিল সেই ভাবের অভিব্যক্তি। বাইরের শত্রুর কাছে এতো কঠোর এতো দুর্দমনীয় যে ব্যক্তিত্ব, ঘরের লোকের কাছে তার একি রূপ! সুদীপ্ত তাঁর চোখের দিকে তাকালেন। সেখানে তো কৈ সেই আগুন নেই! তবু আগুন আছে। আগুন চাপা দেওয়া আছে এবং চারপাশে আপন জনের উদ্দেশ্যে উৎসারিত হচ্ছে—বন্ধুর প্রীতি, শিশুর সারল্য আর বয়স্ক হৃদয়ের বাৎসল্য। এখন তিনি অকঠোর, কিন্তু সেই সঙ্গে অনমনীয় শপথে আকীর্ণ। সেই আত্মপ্রত্যয়বিদ্ধ দুর্দমনীয়তার সঙ্গে কি-একটা এসে মিশেছে যেন। কি তার নাম? অপার্থিব দীপ্তি? স্বর্গীয় আভা? নাম যাই হোক, তিনি যে তখন ঐশীবাণীর আশীর্বাদ প্রাপ্ত ছিলেন তাতে তো কোনোই ভুল নেই। তা না হ'লে কি ক'রে তখন উচ্চারণ করেছিলেন সেই অমোঘ বাণী!—

'এই শহীদ মিনারে আপনাদের সাথে এই বোধ হয় আমার শেষ দেখা।'

শহীদ মিনারের সামনে থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বঙ্গবন্ধু আরো বলেন—

'আমি যদি নাও থাকি, আপনারা থাকবেন। এই শহীদ মিনারকে ওরা যদি গুঁড়িয়ে দেয়, তবু থাকবে আপনার দেশের ধুলো-কাদা-মাটি। কখনো এই দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না।

কি কোমল প্রীতিস্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর! ইনিই কি সেই দু সপ্তাহ পরের বজ্রমানব শেখ মুজিব। একুশে ফেব্রুয়ারির ঠিক দু সপ্তাহ পর। রমনা রেসকোর্সে সাতই মার্চের সেই বজ্রকণ্ঠ। সেই কণ্ঠ বিধ্বস্ত শহীদ মিনারের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আবার স্মরণ করলেন সুদীপ্ত। কাল থেকে কতো বারই তো স্মরণ করলেন। সেই কণ্ঠ ইতিপূর্বে কখনো কোনো বাঙালি শুনেছে? হয়ত কখনো শুনেছে শশাঙ্কের কণ্ঠে, হুসেন শাহের কণ্ঠে কিংবা সিরাজের সেনাপতি মোহনলালের কণ্ঠে। অতঃপর এই সেদিন নেতাজী সুভাষের কণ্ঠে। নেতাজীর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু! তোমার প্রয়াস ব্যর্থ হবে না। আমরা ব্যর্থ হ'তে দেব না। সাতই মার্চের রমনা রেসকোর্সে যারা গিয়েছিল তারা কি জীবনের মতো অন্য মানুষ হয়ে যায় নি? অন্ততঃ সুদীপ্ত হয়েছিলেন। রাজনীতির ডামাডোলে সুদীপ্ত কখনো ছায়া মাড়ান না। কিন্তু সাতই মার্চের রমনা রেসকোর্সের দৃশ্য দেখার পর এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতায়, তাঁর সমস্ত চিত্ত ও দেহের প্রতি রক্ত কণা একটি দৃঢ় প্রত্যয়ের বৃন্তে সংহত সূর্যমুখি হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা-উন্মুখ অনির্বাণ সূর্যমুখি।

আমাদের এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম...এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।....

সুদীপ্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু অন্যেরা কেউ দাঁড়াচ্ছেন না। তবে রুমাল বের ক'রে চোখ মুছে নিচ্ছেন সকলেই। সুদীপ্ত চোখ মুছলেন না। দুই গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে গেলেও তিনি সেই ভগ্নস্তূপের পানে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। বরকত-সালামের মুখ মনে পড়ল। একই সময়ের ছাত্র তাঁরা। তাঁর জীবনের কতো স্মৃতির ইতিহাস গাঁথা হয়ে আছে ওদের ঘিরে। বরকতের বৃদ্ধা জননীর সেই কান্না মনে পড়ল। না, তিনি তো শুধুই বরকতের মা নন। কোটি কোটি বাঙালির অসহায় বঙ্গজননীর প্রতীক। নিজের মুখের ভাষা সন্তানকে শেখানোর অধিকার তোমার নেই, তোমার আম-কাঁঠালের ছায়া-ঢাকা প্রাঙ্গণে নিজের মতো হয়ে বাঁচার অধিকার তোমার সন্তানের নেই, তোমার ভাঁড়ারের রত্নসামগ্রী বিদেশীরা অপহরণ ক'রে নিয়ে যাবে, তা আগলে রাখার অধিকার তোমার সন্তানের থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লক্ষ্য করেছিলেন—আমাদের মা দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা তাঁর নেই, তিনি ভালোবাসেন, কিন্তু রক্ষা করতে পারেন না।...কিন্তু মা গো, তোমার ছেলেরা এখন বড়ো হয়েছে না! এখনো সন্তানকে রক্ষার প্রশ্ন ওঠে নাকি! এবার আমরাই তোমাকে রক্ষা করব।

'এই সুদীপ্ত'

সুদীপ্ত তাকিয়ে দেখেন ফিরোজ। গাড়ির জানলা দিয়ে হাত বের ক'রে তাঁকে ডাকছেন।

দুপুরের খাওয়ার টেবিলে এক পাশে একটা ছোট ট্রানজিস্টর রেখে তাঁরা একই সঙ্গে খাওয়া এবং সংবাদ শোনার কাজ সারলেন। ভারতীয় বেতার আকাশবাণীর সংবাদ। পরম আগ্রহে শুনলেন সকলে।

'নাহ্, ওরা এখনো আমাদের দুর্গতির খবর বিশেষ কিছু শোনে নি। এখান থেকে আমাদের কারো যাওয়া দরকার।'

'কিন্তু ভারত আমাদের জন্য কতোখানি করবে? এবং কেন করবে?

ফিরোজ প্রশ্ন তুললেন একজন খাঁটি রাজনীতিবিদের মতো। কিন্তু যাঁর সামনে তুললেন তিনি কখনো রাজনীতির তর্ক করেন না। তিনি তাঁর মতো ক'রেই বললেন...

'মানুষের এত বড়ো বিপর্যয় ওরা দেখবে চুপচাপ!'

'কিন্তু অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোন কিছু করার সুযোগ তাদের কতখানি?'-আমিনা আলোচনায় যোগ দিলেন।

অতএব সুদীপ্ত চুপ থাকতে পারেন না। তিনি বললেন—

'তাই ব'লে পাশের বাড়িতে এক ভাই আর-এক ভাইকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে আর আমরা প্রতিবেশী হয়ে চুপচাপ তা দেখব? বলব, ওটা ওদের ঘরোয়া ব্যাপার!'

এ যুক্তির কাছে ফিরোজ নতি স্বীকার করলেন। এবং সুদীপ্তর ঐ কথাটা মেনে নিলেন যে, এখনি বিশ্বের সর্বত্র আমাদের লোক ছড়িয়ে পড়া দরকার। এই বিংশ শতাব্দীতেও আসুরিক শক্তির কাছে সভ্যতাকে মৃত্যু বরণ করতে হচ্ছে এ সংবাদ তাদের জানা দরকার।

কিন্তু জানা সম্ভব ছিল না। পাকিস্তান বেতার থেকে প্রচার হচ্ছে অবস্থা সব স্বাভাবিক। বিদেশী সাংবাদিকদের পূর্বাহ্নেই প্রদেশ-ছাড়া করা হয়েছে। এখন এরা যা বলবে তাই সত্য হবে। অর্থাৎ? সকলে জানবে, কতকগুলো বাজে লোক দেশে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিল, তাদের দমন ক'রে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ধন সম্পত্তি রক্ষা করা হয়েছে। দেশবাসী এখন পরম সুখলাভ ক'রে সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে ব্যস্ত।

'শালাদের. . . . . ., বলতে থেমে গেলেন ফিরোজ। আমিনার উপস্থিতি তার কারণ। নিজেকে তিনি সংযত ক'রে নিয়ে জলের গ্লাসে হাত বাড়ালেন! এক ঢোক পানি খেয়ে অতঃপর তাঁর বক্তব্য ভদ্র ভাষায় প্রকাশ করলেন—

বর্বর পাকিস্তানিদের ঠাণ্ডা করতে হ'লে ডাণ্ডা ছাড়া কোনো ওষুধ নেই। আপাততঃ ভারত যদি আমাদের হয়ে দু'ঘা দিত ওদের পিঠে!'

'কিন্তু পঁয়ষট্টি সালে তোমরাই তো বাধা দিতে এগিয়েছিলে। তা না হ'লে ওদেরকে ডাণ্ডা সেবার ভারতের হাতে ভালো করেই খেতে হ'ত।

সে কথা ওই বর্বরগণও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টই পঁয়ষট্টির যুদ্ধে ওদের লাহোর রক্ষা করেছিল। নিশ্চয়ই আজ আর ঐ কর্মের ভালোমন্দ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। যাই হোক, তবু আমরা তখন পাকিস্তানি ছিলাম। যা তখন করেছি, একজন নাগরিকের কর্তব্য হিসাবেই তখন তা করেছি। কিন্তু পঁচিশ মার্চ থেকে আমরা আর পাকিস্তানি নই। অতএব এখন আমাদের এই স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের বুক থেকে পাকিস্তানিদের নিশ্চিহ্ন করাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য। ওরা পাকিস্তানি, ওদের দেশ পাকিস্তান, মানে পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচিস্তান ইত্যাদি। আমরা বাঙালি, আমাদের বাংলাদেশে ওরা বিদেশী। আলোচনা এগোতে থাকলে কথাটা এক সময় এই ভাবেই মোড় নিল। ফিরোজ এই আলোচনার সূত্রে বললেন—

'আজ বিদেশী শত্রুদের স্ব-দেশভূমি থেকে বিতাড়িত করতে প্রতিবেশী

বন্ধুদের সাহায্য চাই। অতি সরল কথা।

'কেমন সব পুরুষ আপনারা!' আমিনা আবার মুখ খুললেন, 'বাইরে থেকে কারা এসে আপনাদের সাহায্য করবে, তারপর দেশকে মুক্ত করবেন, সেই আশায় গোঁফে তা দিচ্ছেন এখানে ব'সে!'

সহসা গর্তে প'ড়ে গেলে কিভাবে লাফ দিয়ে পালাতে হয় সে কায়দা ফিরোজ জানতেন কিছুটা। ব'লে উঠলেন—

'আমার কিন্তু গোঁফ নেই ভাবী, এই দেখুন!'

'সেই জন্যই ভারি সুন্দর দেখায় মুখখানা, ঠিক মেয়েদের মতো।'

না, আমিনা নয়, মীনাক্ষী বললেন কথাগুলি। এ্যাঁ, মীনাক্ষী ভাবী এমন ক'রে বলতে পারেন! সুদীপ্ত মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকালেন। মীনাক্ষী কথাটা ব'লেই যেন লজ্জা পেয়েছেন এমনভাবে মুখ নামিয়ে নিয়েছেন। তার ফলেই আরো সুন্দর দেখাচ্ছে তাঁকে। এমন চমৎকার রসিকতাও জানেন মীনাক্ষী ভাবী!

এই রসিকতার ফল কিন্তু ভালো হ'ল। কিছুক্ষণের জন্য অন্তঃত সকলে তাঁরা বর্তমানের উদ্বেগাকুলতা থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু শীঘ্রই তারা এল। খাওয়া শেষ হ'তেই আবার সেই দুশ্চিন্তার কুয়াশায় দৃষ্টির সম্মুখবর্তী অতি নিকট ভবিষ্যতও অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। অতএব কর্মসূচী স্থির করতে অক্ষম হয়ে সুদীপ্ত সব ভার স্ত্রীর উপর ছেড়ে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। অগত্যা কথা যা হ'ল তা ফিরোজের সাথে আমিনার। কিন্তু আমিনার কথা অনুসারে কাজ হ'ল না। খালার বাড়ি আজ কিছুতেই নয়, সে আগামীকাল দেখা যাবে।

'না, তা ব'লে এ বাড়িতে থাকতেও বলছি নে আপনাকে। বিশ্বাস ক'রে চলুন না আমার সাথে। নিশ্চয়ই বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছি নে।'

'ইচ্ছে করলেই তা পারবেন নাকি! এখান থেকে বঙ্গোপসাগর কতো দূরে জানেন। সেখানে পৌছবার সাধ্যই নেই আপনার।'

অবশ্যই নেই। ফিরোজ আমিনার যুক্তি মেনে নিলেন বিনা প্রতিবাদে। অতঃপর মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই। ফিরোজ-মীনাক্ষী, সুদীপ্ত-আমিনা এবং তাঁদের তিন সন্তান-ফিরোজের ভক্স্ওয়াগনে বেরিয়ে পড়লেন। নীরবে, এবং নত নেত্রে।

পথে দু-একটি গাড়ি চলছিল, কিন্তু হেঁটে-চলা মানুষ একটিও না। নিউ মার্কেটের পাশ দিয়ে যাবার সময় সুদীপ্ত দেখলেন, বলাকা বিল্ডিংয়ের ফুটপাথের ধারে আমনের লাশ তখনও প'ড়ে আছে। ফিরোজও দেখলেন। কিন্তু মেয়েদেরকে দেখানো হ'ল না। তাঁরা নিজেরাই তখন দেখছিলেন। অন্যদিকের ফুটপাথেও কয়েকটি শব তখনও ছড়িয়েছিল। কিন্তু অন্য সময় কতো মানুষ থাকে ঐ পথে। চব্বিশ ঘন্টার এক মুহূর্তও এ স্থান জনশূন্য থাকে না।

মোড় ঘুরতে গর্তের মধ্যে কয়েকজনকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল-

একজনের পায়ের কয়েকটা আঙ্গুল এখনো দেখা যাচ্ছে। সহসা দেখা যায় না। কিন্তু আমিনা। কিভাবে যেন দেখে ফেলেছেন। তিনি শিউরে উঠলেন। তিতাস গ্যাসের পাইপ বসানোর জন্য রাস্তার পাশে গর্ত করা হয়েছিল। সেই গর্তকেই গোর বানিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের ঈমানদার মুসলিম বেরাদরগণ। হাজি মহসিন হলের মাঠের কাছে গাড়ি আসতেই পচা দুর্গন্ধে সকলের নাক যেন জ্ব'লে উঠল। নাকে রুমাল চাপলেন সকলে। আর্টস্ বিল্ডিংয়ের কাছে পৌছবার মুখে গন্ধ আরো তীব্র হ'ল। বাঁ দিকের মাঠে মৃতদেহ ছিল কতগুলি? কাক চিল শকুন কিন্তু অনেকগুলি দেখা গেল। ডানদিকে উপাচার্যের শূন্য বাড়িটার দিকে সুদীপ্ত একবার তাকালেন। উপাচার্য আবু সাঈদ চৌধুরী এখন দেশের বাইরে না? হাঁ তো, পনেরোই এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর বাইরে থাকার কথা। আশ্চর্য, তিনিও বাইরে চ'লে গেলেন, এদিকে বিদায় নিলেন প্রদেশের গভর্ণর, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আহসান সাহেবও। আহসান সাহেবের মতো ভদ্রলোক পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন? কেন? পশ্চিম পাকিস্তানের সকলেই ইয়াহিয়া-টিক্কার মতো হবে নাকি! সেখানে আজম খান, ইয়াকুব খাঁন ছিলেন না? তোমাদের এখানে মোনায়েম খান নেই? ঐ একটা সমাবেশ ঘটেছিল বটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে—আচার্য মোনায়েম খান, আর উপাচার্য ওসমান গনি। আচার্য বললে মোনায়েম খান চটতেন।—

'আমারে কি তোমরা হিন্দু ঠাওরাতেছ? মুসলমানের আচার্য কওয়া বড়োই দুষের (দোষের) কথা। কুটি কুটি (কোটি কোটি) টাকা খরচ কইরা তোমাদেরে আচ্ছা কইরা শিক্ষা দিবার লাইগা এই যে বিল্ডিং বানাইয়া দিছি তা কি এমনি কাফের হওন লাইগা? কেন, আমারে তোমরা চ্যাঞ্চেলর কইতে পার না!'

'চ্যান্সেলর কথাটা মোনায়েম খান ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারতেন না, কিন্তু ঐ পদের গৌরবটুকু ভোগ করতেন ঠিকই। এক সভায় সম্মুখে উপবিষ্ট ওসমান গনি সাহেবকে দেখিয়ে বলেছিলেন—

'এই যে আপনারা ওসমান গনি সাবরে দেখতেছেন, আমি হ্যারে ভাইচ চ্যাঞ্চেলর বানাইলাম। হেইডা ল্যাখা-পড়ায় বালো ছাওয়াল আচিল। আমি তার মতো পি-এইচ, ডি এম এইচ ডি কিছুই করবার পারি নাই। কিন্তু আল্লাহ আমারে গভর্ণর কইরা চ্যাঞ্চেলর বানাইয়া দিল। আর ওইটা আমার অধীনে ভাইচ চ্যাঞ্চেলর হইল।'

মোনায়েম খানের অধীনে অতি দোর্দণ্ড প্রতাপে ভাইস চ্যান্সেলরগিরি করেছেন জনাব ওসমান গনি। কি যে ভয়ে ভয়ে তখন কেটেছে সুদীপ্তদের দিনগুলি! কবে কোন ছাত্র এসে তাঁদের পিটিয়ে দেয় সেই এক ভয়। তার উপর ভয় চাকরির। কোনো কারণে অপছন্দ হ'লেই হ'ল, কোন দিক দিয়ে ফাঁক বের ক'রে দয়া করে একটা চিঠি পৌছে দেবে তোমার বাড়িতে—অমুক দিন থেকে

তোমার চাকরির দরকার নেই আর। ওদের দু'জনের মধ্যে একজন তো ছিলেন পাঁড় মূর্খ—বাংলা বিভাগের তৎকালিন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাইকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত রচনার ফরমায়েস দিয়েছিলেন। এবং আর একজন? কেবল নিজের উচ্চাভিলাষ পূরণের জন্য যিনি একজন মূর্খের তাঁবেদার হ'তে পারেন তাঁর নাম কি দেওয়া যেতে পারে? সে কি যেমন তেমন তাঁবেদারি? হুজুরের নির্দেশে ছাত্রদের ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া থেকে শুরু ক'রে ছাত্রনামধারী গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে অধ্যাপককে পিটানো পর্যন্ত কোনোটাই বাদ যায় নি। অতঃপর আবু সাঈদ চৌধুরী যখন এলেন! উনিশ শো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের পনেরোই আগস্টের মতো মনে হয়েছিল দিনটাকে। ধোঁয়া-ভরতি বদ্ধ ঘরে দম আটকে মরতে মরতে সহসা যদি নির্মল নদীতীরের বাতাসে মুক্তি মেলে তা হ'লে কেমন লাগে সেটা? ওসমান গনির পর আবু সাঈদ চৌধুরী ছিলেন ঠিক তেমনি। এখন বাইরে, বেঁচে গেছেন ভদ্রলোক। হাঁ, বেঁচেছেন। এখানকার সব চোখে দেখলে শোকেই হয় তো ম'রে যেতেন। ছাত্র-শিক্ষকদের যা ভালোবাসতেন? সকল মানুষকেই ভালোবাসতেন। ভালোবাসার তো মৃত্যু নেই। তিনি যেখানেই থাকুন দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে কর্মের পথ দেখাবে।

উপাচার্যের বাসার বিপরীত দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন। কলাভবনের প্রাঙ্গণে সেই সুপ্রাচীন বটবৃক্ষ। এই বটতলার এক বিশাল সভায় প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। গত দোসরা মার্চ। পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে উড়িয়েছিল বাংলাদেশের পতাকা। আইনের চোখে ওটা দোষের? কিন্তু বেআইনী কর্ম তো গত তেইশ বছর ধ'রে তোমরাই চালিয়ে আসছ। সৈনিক দিয়ে দেশ শাসন করাটা কি আইনসম্মত? আইনের শাসন তোমরা পাকিস্তানে চলতে দিয়েছ কবে শুনি? পাকিস্তানের তেইশ বছরের ইতিহাসে দেশে সাধারণ নির্বাচন হয়েছে মাত্র একবার। কিন্তু সেই নির্বাচনের রায়কেও বানচাল করার জন্য তোমরা যখন ষড়যন্ত্র শুরু করলে তখনই তো ক্ষিপ্ত হয়ে ছাত্ররা, তাও ছাত্ররাই, পাকিস্তানের পতাকা পুড়াল, বাংলাদেশের পতাকা উড়াল। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার শপথ নিল তারা এই তো সেদিন। এই বটতলায়। হাঁ, শহীদ মিনারের মতো এই বটতলাও ছাত্রদের সংগ্রামী-প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। সে জন্য—

'শহীদ মিনারের মতো এই বটতলার উপরেও ওদের তো রাগ থাকার কথা।'

'রাগ আছেই তো। একদিন দেখবে, বটগাছটাকে ওরা নির্মূল ক'রে দিয়েছে।'

'গবেটদের পক্ষে ওটাই সম্ভব বটে।'

সুদীপ্ত বললেন। এবং রোকেয়া হলের সামনে এসে আমিনা বললেন—

'একটু দাঁড়ান না!'

আমিনার এক বান্ধবী এখানকার হলের হাউস টিউটর। একবার তাঁর খোঁজ নেওয়া যায় না! ফিরোজ গাড়ি থামালেন। কিন্তু নামবার সাহস কারো হ'ল না। সকলেই দেখলেন, রোকেয়া হলের প্রাচীরের একাংশ ভাঙা। রোকেয়া হলের ভেতরের প্রাঙ্গণে কোনো গাড়ি যাবার পথ না থাকায় কামান দেগে ভেতরে যাবার পথ করে নিয়েছিল পাক-ফৌজের দল। তারপর? ওরা কেউ ভেতরে গেলে দেখতেন, আট-দশজন মেয়ের মৃতদেহ তখন গলতে শুরু করেছে! শকুন ছিল মাত্র তিনটি কি চারটি আর গুটি কয়েক কাক ও একটা কুকুর। কতো আর খাবে তারা। বহু মৃতদেহই এখনো পাখি কিংবা কুকুরে স্পর্শ করে নি। পথে পথে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। কেউ গেলে দেখতেন, দু'টো লাশ তখনও সনাক্ত করা সম্ভব। কোথাও একটু ক্ষত চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কেবল মনে হয়, শরীরটাকে কে যেন ধ'রে দুমড়ে মুচড়ে রেখে গেছে।

তার কারণ তারা গুলিতে মরে নি। পঁচিশ তারিখের রাতে কামান দেগে প্রাচীর ভেঙ্গে যারা ঢুকেছিল তারা মেয়েদের সন্ধান বিশেষ পায় নি। ঘরে ঘরে ঢুকে মেয়ে খোঁজার সময় ছিল না তাদের। এদিকে ওদিকে এলোপাথাড়ি গুলি ক'রে সামনে ঝি-চাকর যাদের পেয়েছিল তাদের মেরে চলে গিয়েছিল তারা। আওরাত-সন্ধানী সৈনিকেরা এসেছিল ছাব্বিশ তারিখের দিনের বেলা। বেলা তখন দেড়টা কি দু'টো—জুমার নামাযের সময় তখন। গত রাত্রি থেকে একটানা কারফিউ থাকায় কেউ পালাতে পারে নি। যাঁতীকলে ইঁদুর আটকে থাকার মতো হলের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তারা। এবং সকাল বেলাটা আশঙ্কায়-উদ্বেগে অতিবাহিত হওয়ার পর দুপুরের দিকে মেয়েরা একটু নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল—কেন করেছিল তার কোন কারণ নেই। সম্ভবতঃ দীর্ঘক্ষণ ধ'রে শঙ্কিত থাকার ক্ষমতা মানুষের নেই। নাকি তারা ভেবেছিল, জুমার দিনে কি আর তাদের ওপর ওরা অত্যাচার করবে! ওরা মুসলমান না! যে ভাবেই হোক, একটু নিশ্চিত বোধ হ'তেই ক্ষিধে পেয়েছিল মেয়েদের। সারা সকাল অভুক্ত থাকলে ক্ষিধে তো হবেই। ওরা তখন আলু সিদ্ধ-ভাতের ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে সবে খেতে বসেছিল। এবং তখনই আক্রান্ত হয়েছিল। সৈনিকদের আগমন টের পেয়ে পাতের অন্ন পাতে রেখেই তারা ছাদে উঠে গিয়েছিল। ছাদের কর্মসূচী আগে থেকেই ঠিক করা ছিল তাদের। মুসলমান মেয়েরা মনে মনে কলেমা প'ড়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তৈরি হয়ে গেল। একজন হিন্দু মেয়ে ছিল তাদের মধ্যে, সে মনে মনে মা কালিকে স্মরণ করল। তারপর আওরাত-লোলুপ রাইফেলধারিদের আবির্ভাব হ'তেই এক সঙ্গে সকলে ঝাঁপ দিল নিচে। খুবই সামান্য ঘটনা। সৈনিকরা ফিরে চলে গেল। এর জন্য আবার আফসোস কিসের? এতোগুলো চমৎকার শিকার যে হাতছাড়া হয়ে গেল সে জন্যও একটু দুঃখ হ'তে পারত। ধুত্তোর, ঢাকা শহরে আবার আওরাতের অভাব!

সকালে গোপনে কয়েকজন সাংবাদিক এসে এই মেয়েদের ছবি নিয়ে

গেছে। হয়ত ফিরোজও ছবি নিতেন। একটা ক্যামেরা তাঁর হাওয়াই সার্টের নিচে গোপনে রক্ষিত আছে। কিন্তু গাড়ি থেকে নামতেই কেমন যেন ভয় করতে লাগল। মনে হ'ল হাঙর-সঙ্কুলিত সমুদ্রে একটি ক্ষুদ্র ভেলায় তিনি ব'সে আছেন। হলের ভাঙা দেয়ালের পানে তাকিয়ে মাত্র কয়েক সেকেন্ড কিছু একটা যেন ভাবতে চেষ্টা করলেন। অতঃপর গাড়িতে ষ্টার্ট দিতে দিতে বললেন—

'না ভাবী, যেতে পারবেন না। ভয়াবহ অবস্থা।'

অবস্থার ভয়াবহতা নিয়ে কেউ আর কোন প্রশ্ন তুললেন না। গাড়ি এগিয়ে গেল। কিন্তু বেশি দূরে এগোতে পারল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–শিক্ষক-কেন্দ্রের কাছে সেনাবাহিনীর দু'জন জওয়ান পথ আটকাল। সামনে দু'খানা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। ফিরোজের গাড়ি হ'ল তিন নম্বর। পরক্ষণেই আর-একখানা গাড়ি এসে থামল ফিরোজের পেছনে। ফিরোজ দেখলেন, কেবল তাঁর গাড়ির ছাড়া আর প্রত্যেকটিতেই একটি ক'রে ছোট পাকিস্তানি পতাকা শোভা পাচ্ছে। আর সামনের গাড়িটার নম্বর দেখলেন উর্দুতে লেখা। গতকালও গাড়ির নম্বর ছিল সব বাংলাতে। এক রাতেই তা পালটে উর্দু হয়ে গেল! আর এক রাত পেরোলে বাংলার পরিবর্তে সবি উর্দু হয়ে যাবো নাকি! এইভাবে বাঙলার অস্তিত্বই বিলুপ্ত করার খোয়াব দেখছে নাকি আমাদের মুসলিম বেরাদরগণ! সে গুড়ে বালি।

কিন্তু এটা কি মুসকিলে পড়া গেল! পাকিস্তানি পতাকা লাগিয়ে গাড়ি বের করতে হবে এমন তো জানা ছিল না ফিরোজের। এর জন্য আবার শাস্তি পেতে হবে না তো! হ'লে তা কি ধরনের। মনে মনে একটু তিনি ঘাবড়ে গেলেন বৈ কি। কিন্তু ঘাবড়াবার সময় তো ছিল না। এখন কৈফিয়ৎ দিতে হবে! হাঁ, গাড়ি সার্চ হবে। সে পরের কথা। তার আগে কৈফিয়ৎ দাও, তোমার গাড়িতে ঝাণ্ডা নেই কেন? জানতাম না বললে রেহাই মিলবে না—ফিরোজ জানতেন। অতএব বুঝতে চেষ্টা করলেন—

'সকলেরই গাড়িতে পতাকা লাগানোর অধিকার তো নেই। সে অধিকার থাকতেও নেই।'

ফিরোজ পরিষ্কার ইংরেজিতে তাঁর বক্তব্য পেশ করলে পাকিস্তানি জওয়ান তার কিছুই বুঝল না। তবু প্রচুর বুঝেছে এমনি ভান ক'রে বলল—

'নেহি। তোম হামারা সাথ মে চালো।'

তোমার ও-সব কিছু শুনতে চাই নে। আমার সঙ্গে চল। যেতে হ'ল। দু'জন মহিলা ও তিনজন শিশু নিয়ে ফুটপাথের উপর একাকী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন সুদীপ্ত। ফিরোজ গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–শিক্ষক-কেন্দ্রের অভ্যন্তরে, যেখানে সেনাবাহিনীর একজন মেজর ছিলেন। এবং ফিরোজের সৌভাগ্য। মেজরটি ছিলেন করাচীর অধিবাসী, জাতিতে বালুচ। তিনি ফিরোজের বক্তব্য শুনলেন। এবং জওয়ানটিকে আদেশ দিলেন—গাড়িতে ঝাণ্ডা

থাকার দরকার নেই। যাও। জওয়ানটি ফিরে এসে প্রত্যেকটি গাড়ি থেকে পতাকা নামিয়ে ফেলার হুকুম জারি করল। কিন্তু ফিরোজের পেছনের গাড়িটা ছিল হাইকোর্টের একজন জাস্টিসের। তাঁর গাড়ি থেকেও পতাকা নামাতে হবে নাকি। না বললেও চলে, তাঁর গাড়িতে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা ছিল না, ছিল হাইকোর্টের নিজস্ব পতাকা। এ আবার কী ধরনের ফিলাগ? জওয়ানটি কয়েক সেকেণ্ড পতাকাটাকে দেখল, এবং ভাবল। স্বাধীন বাঙলার পতাকা সে বিস্তর দেখেছে। এটা সে জিনিস নয়। তবে কোনো বিদেশী কূটনীতি মিশনের পতাকা? না তো। গাড়ির মালিক এই তো দাঁড়িয়ে আছেন! দিব্যি মালুম হচ্ছে দেশী আদমী। এবং বাঙালি। তা হ'লে! দূর, আর চিন্তা করা যায় না। গাড়িতে পতাকা থাকবে না কারো। মেজর সাহেব ব'লে দিয়েছেন। ব্যাস্। ওই নিয়মই চলবে। পতাকা নামিয়ে ফেল। নীরবে পতাকা নামিয়ে গাড়ির ভেতর রাখা হ'ল। আইনের বিচার যেখানে নেই, সেখানে বিচারকের সম্মানই বা থাকে কোথায়!

অতঃপর গাড়ি সার্চ করার পালা। ফিরোজদের গাড়িতে আলপনা আঁকা একটা লক্ষ্মীর ভাঁড় দেখেই এক লাফে দু পা পিছিয়ে গেল জওয়ানটি।—ওরে বাবা, বোমা নাকি।

না, ওটা বোমা যে নয় সেটা প্রমাণ করতে হিমসিম খেতে হ'ল ফিরোজকে। এবং শেষ পর্যন্ত ভেঙে দেখিয়ে তবে রেহাই পাওয়া গেল। লক্ষ্মীর আলপনা-দেওয়া সুন্দর গোল ভাঁড়টা-চারিদিক বন্ধ, কেবল একটি ফুটো দিয়ে ভেতরে পয়সা ফেলা যায়। ভাঁড়টা এলার ভারি পছন্দ হওয়ায় আজ সকালেই মিনাক্ষী ওটা তাকে উপহার দিয়েছেন। এবং খালা যখন, তখন তো আর এমনি দেওয়া যায় না। ওর মধ্যে পাঁচ টাকার একখানা নোটও দিয়েছিলেন। ফিরোজ ওটাকে ফুটপাথে ভেঙে দিতেই নোটটা ছিটকে পড়ল এক পাশে। তজ্জব কা বাত! বোমার ভেতর থেকে টাকা বেরিয়ে আসতে জওয়ানটি কখনো দেখে নি। তাড়াতাড়ি সে নোটখানা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরোজদের একখানা সালাম ঠুকে স'রে দাঁড়াল।—আপ চলা যাইয়ে।

তারা চলতে শুরু করল। চুপচাপ সকলে চ'ড়ে বসল গাড়িতে। কথা বলার প্রবৃত্তি কারো নেই। কিন্তু ফিরোজের মনের জোর বোধহয় মোটামুটি বজায় ছিল। নাকি সবাই যেখানে ঘাবড়ে যায় সেখানে কারো না কারো মনে কোনো অদৃশ্য একটা শক্তি উড়ে এসে বাসা বাঁধে। ফিরোজের মনে হচ্ছিল, তাঁর সঙ্গের এতোগুলি নারী পুরুষকে বাঁচানোর চেষ্টা তাঁকেই করতে হবে। তাতে আনন্দ আছে না! দায়িত্ব ঘাড়ে এসে চাপলে তা কি শুধুই বোঝা হয়? একটা পৌরুষ তখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। পৌরুষের উদ্বোধনই পুরুষের পক্ষে আনন্দের।

একটু এগিয়ে এক পাশে কতোকালের প্রাচীন কালি-মন্দির। আর-এক পাশে বাংলা একাডেমী। দু'টোই ছিল ওদের চক্ষুশূল। ওই দেখ না, গোলার

আঘাতে বাংলা একাডেমীর একাংশ কেমন ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছে। মাত্র একাংশ? কি জানি, শহীদ মিনারের দুর্ভাগ্য থেকে কি ক'রে যে বাঁচল ওটা! কী ক'রে এখনো টিকে রইল ওই কালিবাড়ি? অবশ্যই কালি-মন্দিরের সম্মান রক্ষা পায় নি। পাকিস্তানি দুর্বৃত্তরা ওর ভেতরে প্রবেশ করেছিল। সেখানে সেবায়েত কতোজন ছিলেন কেউ জানেন না। কিন্তু হানাদাররা জীবিত একটাকেও রাখে নি। শেষ পর্যন্ত কালি-মন্দিরটাকে রাখবে তো! না, রাখতেও পারে। বাইরের জগতের সামনে এতোগুলি সেবায়েত হত্যার কৈফিয়ৎ খাড়া করতে হবে না?

বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মন্দিরে প্রবেশ ক'রে সেখানে থেকে পাক-ফৌজের উপর গুলি চালাচ্ছিল। অগত্যা পাক-ফৌজকে তখন কামান দাগাতে হয়েছিল মন্দির লক্ষ্য করে। তার ফলেই মারা গেছেন মন্দিরের সেবায়েতগণ। বিশেষ ক'রে ঐ সেবায়েতগণকেই হত্যা করা আমাদের সেনাবাহিনীর অভিপ্রায় ছিল না।—এই ধরনের কোনো যুক্তির আড়ালে নিজের অপকর্মের সাফাই গাওয়ার দরকার ওই দুর্বৃত্তদের অতি শীঘ্রই হ'তে পারে। তখন প্রশ্ন উঠবে, তোমাদের কামানের গোলা বেছে গিয়ে কেবল মানুষ হত্যা করল, মন্দিরের গায়ে তার বিশেষ কোনো আঁচড়ই লাগল না। এ কেমন কথা! অতএব—

'শীঘ্রই হয়ত দেখবে' সুদীপ্ত কথা তুলেছিলেন, 'মন্দিরের কিয়দংশ ভেঙে রেখে দেবে ওরা।'

'অথবা গোটা মন্দিরটাকে গোড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলতে পারে, তখন বলতে পারবে—ওখানে মন্দিরই ছিল না কোনো কালে। অতএব সেবায়েত হত্যার কথা শত্রুদের বানানো কাহিনী।'

'বেকুবদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। ঐ মন্দিরের কত ছবি কতজনের কাছে আছে সে হিসেব হয়ত মনেই থাকবে না'

আর একটু এগোতেই শেরে-বাংলা ফজলুল হকের মাজার, তাঁর পাশে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিন। জীবদ্দশায় ফজলুল হক ও সোহ্‌রাওয়ার্দী পূর্ব বাংলার স্বার্থ নিয়ে কথা বলেছিলেন। নানাভাবে নানা সময়ে সেজন্য তাঁদেরকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কোপদৃষ্টিতে প'ড়ে লাঞ্ছনা সইতে হয়েছিল। পক্ষান্তরে খাজা নাজিমুদ্দিনের সমগ্র জীবনে একটি কর্মও নেই যার সঙ্গে বিশেষ ক'রে বাঙালির স্বার্থ জড়িত ছিল। অতএব এই দুই দেশ-নায়কের পাশে খাজা নাজিমুদ্দিনের নাম উঠতেই পারে না। এই নিয়ে ক্লাবের আড্ডায় একদিন তর্ক উঠেছিল—মাজারের কাছে আসতেই সে কথা সুদীপ্তর মনে পড়ল। না, নিজে তিনি তর্কে যোগ দেন নি। কেননা ঐ সব রাজনীতির ব্যাপার ভালো বোঝেন না তিনি। বস্তুতঃ নিজে তিনি তাই মনে করেন। তাই চুপচাপ তিনি শুনেছিলেন ওদের কথা। একজনের বক্তব্য ছিল—

'শেরেবাংলা-সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে নাজিমুদ্দিনের মাজার কেমন খাপ ছাড়া দেখায় বরং ওটা করাচীতে জিন্না কিংবা লিয়াকত আলির পাশে মানানসই হ'ত।

'তা যদি বলেন, তবে সোহ্‌রাওয়ার্দীর কবর হওয়া উচিত ছিল কলকাতায়। শরৎ বোসের সঙ্গে স্বাধীন যুক্ত-বাংলার কথা তুলে এক সময় ভদ্রলোক জন্মলগ্নেই পাকিস্তানকে ছুরিকাঘাত করতে চেয়েছিলেন।'

'এবং ঠিক ঐ কাজটির জন্যই সোহ্‌রাওয়ার্দীর আর সকল ভুলভ্রান্তি চাপা প'ড়ে যাবে। তিনি ভবিষ্যৎ বাঙালির কাছে ন্যাশনাল হিরোর মর্যাদা পাবেন।'

প্রতিপক্ষ এ কথায় ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। ঘটনাটা উনিশ শো উনসত্তরের মার্চের। তখন পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার কল্পনা কারো মাথায় ছিল না। কোনো কালেই কি সে কল্পনা কারো মাথায় জাগত? একাত্তরে এসে যদি ইয়াহিয়া-টিক্কার গণহত্যা শুরু না হ'ত তা হ'লে? পঁচিশে মার্চের ওই হত্যাকাণ্ডের পর সোহরাওয়ার্দী-শরৎ বসুর সেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের চিন্তা এখন অধিকাংশ বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে পেয়ে বসেছে। বুদ্ধিজীবীদের দোষ নেই। পাকিস্তানিরা তো প্রমাণ ক'রে দিয়েছে, বাংলা ও পাকিস্তান দুটো আলাদা দেশ। বাংলাকে ওরা যদি বিদেশই না ভাববে তা হ'লে এমন নির্বিচার গণহত্যা সেখানে চালাতে পারে! যতোই অমানুষ হোক, নিজের দেশের লোককে এমন কুকুর-শেয়ালের মতো তাড়িয়ে ধ'রে মারতে পারে কেউ?

ওরা হাইকোর্টের কাছে গাড়ি ঘুরিয়ে শান্তিনগরের দিকে মোড় নিলেন। রাজারবাগ পুলিশের সদর দফতর দেখলেন। দেয়ালে প্রকাণ্ড আয়তনের গর্তগুলি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিকট মুখভঙ্গির প্রতীক হয়ে তাদের দিকে ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশের বাড়িঘরগুলির উপর কি অবাধ অধিকার! যেখানে ইচ্ছে কামান দেগে বড়ো বড়ো ফুটো বানিয়ে দাও। যেখানে ইচ্ছে আগুন দাও। ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দাও। যা তোমার মর্জি।...মনে মনে অসম্ভব রকমের তেতে উঠলেন ফিরোজ। ওদের মর্জির উপর আমাদের জীবন? ইস্, কিভাবে আগুন দিয়ে সারা এলাকাটাকে জ্বালিয়েছে। পুলিশরাও সব আওয়ামী লীগের লোক ছিল নাকি! সকালবেলার হাসিম শেখের কথা সুদীপ্ত স্মরণ করলেন। আর ফিরোজ? তিনি তখন ভাবছিলেন, এখানে কয়েকটি ছবি নেওয়া যায় না? ওরে বাবা, লোহার টুপিধারী খবিশগুলো রাইফেল হাতে কিভাবে তাদের পানে তাকাচ্ছে দেখেছ। অন্য কেউ কোথাও না থাক, খবিশগুলো ঠিকই আছে। ফিরোজ তার গাড়ির গতি সামান্য একটু মন্থর করেছিলেন মাত্র। একেবারে

থামান নি। কিন্তু একজন সৈনিক তাঁকে একেবারেই থামবার নির্দেশ দিল। অগত্যা থামতে হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মতো এখানেও আবার গাড়ি-তল্লাশি হবে বোধ হয়। অতএব গাড়ি থামতেই ওরা নামলেন। প্রথমে নামলেন সুদীপ্ত, তারপর ফিরোজ। এবং ফিরোজ নেমে মেয়েদের নামার পথ ক'রে দিতে গেলেন। কিন্তু থমকে গেলেন সুদীপ্তর অবস্থা দেখে। সুদীপ্ত নামতেই রাইফেলের নল এসে ঠেকেছিল তাঁর বুকে। গুলি করবে নাকি! ফিরোজ বিবর্ণ হয়ে গেলেন। কি অদ্ভুত প্রশ্ন রে বাবা—

'তোম বাঙালি হ্যায়, না বিহারী হ্যায়, না হিন্দু হ্যায়? বোলো।'

তুমি বাঙালি? না বিহারী? না হিন্দু?—এ কোন ধরনের শ্রেণীকরণ? শ্রেণীকরণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকে কাদের? কিন্তু এতো সব প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলিত হবার অবকাশ তখন সুদীপ্তর ছিল না। এই মুহূর্তে সামান্য ভুলের মাশুল অতি চরম হ'তে পারে। তিনি এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কেমন একটা অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করেছেন যেন। ঠিক সময়ে ঠিক উত্তরটি মুখে এসে যায়। তিনি বললেন—

'হাম মুসলমান হ্যায়, হাম পাকিস্তানি হ্যায়।'

কিন্তু না। এ উত্তরে পাকিস্তানি জওয়ান খুশী হ'ল না। এ ধরনের ঘোরানো প্যাঁচানো জবাব সে জানেন, কেউ তেমন জবাব দিলে তা সে বরদাশ্‌ত্ করতেও রাজী নয়। অতএব সুদীপ্তকে একটা ধমক খেতে হ'ল। ওই সব চলবে না। সোজা আমার জবাব দাও।

'সিধা বাত কাহো।'

সুদীপ্ত তখন সিধা কথাই বললেন — না, সবটাই তার সত্য নয়। কিছুটা সত্য, এবং অনেকখানিই মিথ্যা। তিনি বললেন, তিনটের কোনোটাই তিনি নন। তিনি কলকাতা থেকে এসেছেন, তিনি মোহাজের। তবে তাঁর পূর্বপুরুষ বিহারী ছিলেন বটে। কিন্তু দাদার আমল থেকে ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছেন।

আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাকে তা হ'লে এখন ছাড়া যায় মনে হচ্ছে। সুদীপ্তকে ছেড়ে রাইফেলের নল এবার প্রসারিত হলো ফিরোজের পানে। ফিরোজ আবার উর্দু বলতে পারেন না। হয়তো শিখলে পারতেন। শেখেন নি। পশ্চিম পাকিস্তানিরা যেমন বাংলা শিখতে চায় না, তেমনি আমাদের উর্দু শিখতে চাওয়া উচিত নয়।—এমনি একটা যুক্তি ফিরোজের দিক থেকে ছিল। কিন্তু ফিরোজের যুক্তি সকল বাঙালি মানেন না। তাঁরা পাল্টা যুক্তি খাড়া করেন—তুমি অধম, তাই আমি উত্তম হইব না কেন? হাঁ, তাই হও। চিরকাল উত্তম হ'তে গিয়েই তো মরেছ বাবা।

কিন্তু এখন যে ফিরোজেরই মরণ। সুদীপ্ত চট্ ক'রে ব'লে উঠলেন—

'উন লোগ মেরা গাড়িকা ড্রাইভার হ্যায়।'

হাঁ, ড্রাইভার হ'তে পারে। প্যান্ট ও হাওয়াই সার্ট খুব একটা কেতাদুরস্ত

নয়। এমন পোশাক ড্রাইভারদেরও হ'তে পারে। সুদীপ্তকে একটা সালাম ঠুকে সৈনিকটি তার স্বস্থানে দাঁড়াতে গেল।

মালিবাগের মোড়ে এইখানে ফারুক ইকবালের কবর ছিল না? এই তো কয়েক দিন মাত্র আগে মিছিল পরিচালনা করার সময় পাকিস্তানি জওয়ানদের গুলিতে নিহত হয়েছিল তরুণ কলেজ-ছাত্র ফারুক ইকবাল। তার স্মৃতিকে অমর করার জন্য এই তো এখানে মালিবাগের মোড়ে এই ক্ষুদ্র গোল পার্কে তার কবর দেওয়া হয়েছিল। সে তো এই মার্চ মাসেরই কথা। কিন্তু কবরও চুরি যায় নাকি। সত্যই ওরা ফারুক ইকবালকে কবর থেকে চুরি ক'রে নিয়ে কেবল স্তূপাকার ইঁটগুলো কোনোমতে এখনো কবরের সাক্ষ্য বহন করছে মাত্র। হায় হায়, এতোদিন পরে কি ছিল কবরে! কয়েকখানা হাড় বৈ তো নয়। তা হোক, তবু সে তো বিপ্লবীর হাড়। প্রত্যেকটি বিপ্লবীই দধীচি। দধীচির হাড়ে বজ্র নির্মিত হয়েছিল, সেই বজ্র যা দিয়ে অসুর ধ্বংস ক'রে স্বর্গের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছিল দেবতাদের পক্ষে। পাকিস্তানিরা অসুর ছাড়া কি? কিন্তু একটি বিপ্লবীর কঙ্কাল চুরি ক'রে তারা করবে কি? ফারুক তো একজন নয়। ফারুকের মা তো কান্নাজড়িত কণ্ঠে সেই কথাই বলেছিলেন ফারুকের বন্ধুদের লক্ষ্য ক'রে—তোমাদের মধ্যেই আমার ফারুক বেঁচে রইল বাবারা। তোমরা আমাকে মা ডেকেছ। তোমাদের মধ্যেই ফিরে পেয়েছি আমার ফারুককে। হ্যাঁ, বাংলাদেশ আজ শত শত ফারুকে ভরতি হয়ে গেছে।

সুদীপ্ত মনে মনে ফাতেহা পাঠ করলেন। ফিরোজের কিন্তু সে কথা মনেই এল না। কি ক'রে প্রতিশোধ নেওয়া যায় সেই কথাটাই তীব্রভাবে কয়েকবার ঘুরপাক খেল তাঁর মনের মধ্যে। আর মেয়েরা? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কেন্দ্রের কাছেই তাঁরা মূক বধির হয়ে গেছেন। মীনাক্ষী তো বটেই, আমিনাও মনে মনে আল্লাহ্‌কে ডেকে চলেছেন চোখ-কান বন্ধ ক'রে। ফিরোজ তাঁর বন্ধু ও বন্ধু পত্নীকে নিয়ে তার চাচার বাসায় উঠলেন।

মালিবাগের একটা গলিতে ফিরোজের এক চাচা থাকেন, তাঁর বাপের চাচাত ভাই—জামাতে ইসলামের সমর্থক। কিন্তু তাতে কি। ওতে চাচা ভাইপোর সম্পর্কে কখনো ফাটল সৃষ্টি হয় নি। আওয়ামী লীগের প্রবল আধিপত্যের সময় চাচা দিব্যি দাড়িতে হাত বুলিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন—ভাইপো ফিরোজ থাকতে তাঁর ভাবনা কি? ভাইপোকে আভাসও দিয়েছিলেন জামাতে ইসলামের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন তিনি। মওলানা মওদুদী আর আগের মতো নেই। তিনিও খালি পশ্চিম পাকিস্তানেরই স্বার্থ দেখছেন। ঐ দলের সাথে আর সম্পর্ক রাখা যায় না।

না, এ সকল কথা ফিরোজ ষোল আনা বিশ্বাস করেছিলেন এমন নয়। কেবল এইটুকু বুঝেছিলেন যে, চাচা তাঁর সাহায্য চান। জামাতে ইসলামের কাজ করেছেন ব'লে আওয়ামী লীগকে ভয় পাচ্ছেন তিনি। হাঁ, যেভাবে ওই জামাতে ইসলাম নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের কুৎসা রটিয়েছিল তাতে

নির্বাচনের পর তার ভীত হওয়ার কারণ কিছু ছিল বৈ কি। কিন্তু আওয়ামী লীগ, চাচা, তোমাদের মতো পার্টি নয়—ফিরোজ মনে মনে বলেছিলেন, আর হেসেছিলেন। তোমরা বৃথাই ভয় পাচ্ছ চাচা। অবশ্য তোমরা জিতলে আওয়ামী লীগকে এবার যে সাতঘাটের পানি খাওয়াতে সেটা তোমরাও জান। তাই এখন নিজেরা সেই ভয়ে ভীত হচ্ছ। কিন্তু চাচা, আওয়ামী লীগ নির্ভেজাল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী—এটা মনে রেখো।

ফিরোজ মনে রেখেছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে চাচা তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী। সেই ধারণাতেই এসে উঠেছেন চাচার বাসায়। আমিনাকে নিয়ে নাজমা ভেতরে চ'লে গেছেন। এ বাড়িতে মীনাক্ষী নাজমা শুধুই নাজমা। 'মীনাক্ষী' শব্দটা চাচা-শ্বশুরের ভারি অপছন্দ। অতএব 'সুদীপ্ত' শব্দটাও চাচার পছন্দ হবে না—এটা ফিরোজ জানতেন। তিনি সুদীপ্তর পরিচয় দিলেন এইভাবে—

'ইনি শাহিন, ইউনিভার্সিটির একজন সিনিয়র লেকচারার, আমার বন্ধু!'

'ইউনিভার্সিটির টিচার? এ তো বহুত ভয়ের কথা বাপ। ইউনিভার্সিটির কথা শুনলেই মেলেটারি আজকাল ক্ষেপে উঠতেছে।'

তাই নাকি। তা হ'লে তো চাচা তোমার বাড়িতে রাত্রি-যাপনের বাঞ্ছাটা পরিত্যাগ করতে হয়। কিন্তু এসেই তো আর ওঠা যায় না। হাতের ঘড়ি দেখে নিলেন ফিরোজ, এবং ঠিক করলেন, পাঁচ মিনিট পরেই উঠে পড়বেন। কিন্তু দু'মিনিট পরেই চাচা তাঁর গাড়ির চাবি চেয়ে বসলেন—

'এই একটু বাপ যাব আর আসব। পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'কিন্তু চাচা আমরা বেরুবো এখনি।'

'আজকের রাতটা না হয় বাপ গরীবের বাড়িতে থেকেই গেলে। ক্ষতি হবে তাতে? আমার একটু বাইরে যাওয়া বিশেষ দরকার। অথচ গাড়িতে তৈল নাই। ভাইপো হয়ে আমার মুশকিলে আসান করবে না একটু।'

তা তো করতেই হবে। ভাইপো যখন হয়েছেন তখন চাচার সুবিধা অসুবিধা একটু দেখতে হবে বৈ কি। তা ছাড়া, একটা রাত চাচা তো থেকে যেতেই বলেছেন। হাঁ, থাকতেই হবে। আজ আর পথে বেরুনোর প্রবৃত্তি নেই। অতএব পাঁচ মিনিট কেন, পঁচিশ মিনিট কাটিয়ে আসুন না—কে বাধা দিতে যাচ্ছে। ফিরোজ চাবি বের ক'রে দিলেন। কিন্তু চাচার গাড়ি কি কেবলি তেলের জন্য অচল হয়ে আছে? এতো শীঘ্র দেশে তৈল-সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে নাকি! না বোধ হয়। কিন্তু সত্যই যদি এরি মধ্যে তেলের সঙ্কট সৃষ্টি হয়ে থাকে তা হ'লে বুঝতে হবে সত্যই পাকিস্তানি শাসকদের মনে বাংলাদেশকে ঘিরে কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না। অথচ দুরভিসন্ধি ছিল। ফেব্রুয়ারি মাসেই সারা এয়ারপোর্ট বিমান বিধ্বংসী কামান ও রাডার দিয়ে সাজানো হয়েছিল কি ওর শোভা বাড়ানোর জন্য? তখন থেকেই দেশের মাশরেকী মুল্লুকে তলে তলে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল বর্বর ক্ষমতা লোলুপ ইয়াহিয়া ও তার দলবল।

অতএব নিঃসন্দেহে গাড়ির তেলও প্রচুর পরিমাণে মজুদ রেখেছে তারা। অতএব তেলের সঙ্কট সৃষ্টি হ'তেই পারে না। হাঁ, ফিরোজের অনুমান সত্য ছিল। চাচার গাড়ি কিছুকাল থেকেই অকেজো হয়ে প'ড়েছিল। কেন থাকবে না। কিনলেন তো একখানা পুরোনো ফিয়াট গাড়ি। গাড়িই যদি কিনবে চাচা, তা হ'লে কি অত কৃপণতা করলে চলে!—এইভাবে চাচাকে কেন্দ্র করে ফিরোজ সুদীপ্তর কাছ থেকে যেন বহু দূরে সরে গিয়েছিলেন। অতএব ফিরোজের পাশের সোফাতে ব'সে থেকেও সুদীপ্ত এখন ভীষণভাবে একাকী হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো এখন একটা কথা ব'লে তিনি ফিরোজকে নিজের সঙ্গী ক'রে নিতে পারেন। এসো না ভাই যতোক্ষণ আছি, আমরা একসঙ্গে থাকি।...কিন্তু নাহ্, কিছু ভাল লাগছে না। একটি কথাও বলতে ইচ্ছে করছে না। কোনো মতে একটু ঘুমিয়ে পড়া যায় না এখন?...

মীনাক্ষী ভাবীর সঙ্গে মেয়েটিকে চেনা মনে হচ্ছে। হাঁ, তাঁরই এক ছাত্রী হামিদা। হামিদার কপালে সেই টিপ নেই। ফিরোজের চাচার বাড়ি টিপ প'রে আসার সাহস হয় নি বোধ হয়। কিন্তু বাড়িতে আসার তার দরকারটাই বা কি? চট্ ক'রে ফিরোজের চাচার সঙ্গে হামিদার কোনো আত্মীয়তার কথা সুদীপ্তর মনে এল না। হয়ত প্রতিবেশী হবে। হয়ত মীনাক্ষীদের সঙ্গে আগে থেকেই জানাশোনা আছে।

মেয়েটি সুদীপ্তর দিকে তাকাল না। নাকি তাঁর অজ্ঞাতে এক সময় তাকিয়েছিল। তিনি টের পান নি! না না, তা কি হয়? তাঁর কোনো ছাত্র বা ছাত্রী তাঁকে দেখে না চেনার ভান করবে এটা হ'তেই পারে না। নিশ্চয়ই মেয়েটি তাঁকে দেখেই নি।

মীনাক্ষী তাঁর স্বামীর সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় করিয়ে দিল—

'একে চেন? একটু দূর সম্পর্কে আমার মামাতো বোন। তোমার চাচা আবার এর মায়ের খালাত ভাই! এবার অনার্সে সেকেন্ড ইয়ার।'

আদাব দুলাভাই।

'আদাব। এখানে কবে এসেছ তোমরা?'

'তোমরা নয় তুমি। ও একাই এসেছে সপ্তাহ খানেক হ'ল। থাকত রোকেয়া হল্-এ।'

রোকেয়া হল থেকে অবশ্য নিজের ইচ্ছায় সে এখানে আসে নি। বোনের টেলিগ্রাম পেয়ে ফিরোজের চাচা নিজে গিয়ে হামিদাকে তার বাসায় নিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ বাঁচিয়েছেন। হল-এ থাকলে কি দশা হ'ত?' ফিরোজ জানেন না। আসবার পথে সাহস ক'রে হল-এর মধ্যে ঢুকতে পারলে তবু কিছুটা টের পেতেন। তিনি শুধালেন—

'শেষ পর্যন্ত তোমাদের হল-এ ক'জন মেয়ে ছিল জান নাকি?'

'ঠিক জানি নে। বারো-চৌদ্দ জন হ'তে পারে। ওদের ভাগ্যে কি যে ঘটেছে কে জানে।'

হাঁ, এখনো সব খবর সকলে জানে না। একটা জনরব ছড়িয়েছে, বারো-চৌদ্দটি মেয়ে মারা গেছে, আর ধরে নিয়ে গেছে দশ-বারো জনকে। কিন্তু হামিদার উক্তিতেই ফিরোজ বুঝলেন, অত মেয়ে হল-এ ছিল না।

'স্যারদের খবর কিছু জানেন নাকি দুলা ভাই?'

'শুনছি বারো থেকে পনেরো জন মারা গেছেন। আমি তো সকলকে চিনিনে। নামও মনে নেই সকলের।'

এই অবস্থায় মনে রাখা সম্ভবও নয়। তবু যে কয়েকজনের নাম মনে ছিল ফিরোজ ব'লে গেলেন—ডঃ গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ডঃ ফজলুর রহমান, ডঃ মুকতাদির আর নাম মনে আসছে না। ফিরোজ থামলেন। হামিদা শুধাল—

'সুদীপ্ত স্যার?'

সুদীপ্ত? মানে, সুদীপ্ত শাহিন? তারও মৃত্যু সংবাদ রটেছে নাকি। ফিরোজ বললেন—

'কোন সুদীপ্তর কথা বলছ তুমি? তোমার সামনেই তো একজন সুদীপ্ত ব'সে আছেন।'

ওমা, তাই তো! সুদীপ্ত স্যারই তো। হামিদা ভালো ক'রে তাকিয়ে এবার চিনতে পারল। কিন্তু প্রথমে চিনতে পারে নি। এ কি চেহারা হয়েছে স্যারের। হামিদা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। ফিরোজ বলল—

'হামিদার অন্যায় কিছু হয় নি সুদীপ্ত। এই ক'দিনে একেবারে অন্য রকম হয়ে গেছ তুমি। তার উপরে আজ শেভও কর নি। এবং দুপুর অবধি ঘুরে ঘুরে চেহারাকেও কেমন ক্লিন্ন ক'রে তুলেছ।'

'তুই সুদীপ্ত ভাইয়ের ছাত্রী!' মীনাক্ষী বললেন, 'তুই না হিস্ট্রি নিয়েছিলি শুনেছিলাম।'

প্রথমে তাই কথা ছিল বটে। তবে শেষ পর্যন্ত ইংরেজিতেই ভর্তি হয়েছে সে। কিন্তু সে কথা হামিদা আর বলতে পারল না বোনকে। সে ততক্ষণে কেঁদে ফেলেছে। যাঁর মৃত্যু-সংবাদ দ্রুত জেনে সারা চিত্ত বেদনামথিত হয়েছে, সহসা তাঁকে জীবিত দেখলে প্রাণে যে আনন্দ বাজে সেই আনন্দের আঘাতে উদ্‌গত অশ্রু হামিদার চোখে। কিন্তু হামিদা যা শুনেছিল তা শোনা কি অস্বাভাবিক ছিল? তেইশ নম্বর বিল্ডিং যেভাবে আক্রান্ত হয়েছিল তাতে ওর মধ্যে কারো কি বাঁচার কথা? ওই বিল্ডিংয়ের সকলেই মৃত ব'লে খবর রটেছিল। হামিদা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল।

'স্যার যখন শুনলাম, আমাদের ডিপার্টমেন্টের মুর্শেদ স্যার, গুহঠাকুরতা

স্যার এবং আপনি তিনজনেই জল্লাদদের হাতে খতম হয়ে গেছেন তখন কী যে অবস্থা হ'ল আমাদের!'

'মুর্শেদ স্যার নিখোঁজ, তার সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। তবে আমার ধারণা তিনি বেঁচে আছেন।'

আল্লাহ্ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন। আফিয়ার কথা মনে আছে স্যার?

'আফিয়া? দেখলে চিনতে পারব।'

ছাত্র-ছাত্রী অনেককেই দেখলে চেনা যায়। কিন্তু নাম বললেই গোলমাল বাধে। অনেক মুখ ভেসে উঠে, তার মধ্যে কোন নামটা কার তা ঠিক করা যায় না। স্যারকে নীরব দেখে হামিদা আরো পরিচয় দিল আফিয়ার।—

'সেই যে মেয়েটা স্যার, হাত ভ'রে চুড়ি পরে। আর কখনো ইংরেজিতে কথা বলে না।'

হাঁ মনে পড়েছে। হামিদা সেই মেয়ের কথা বলছে, যাকে ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী ব'লে মনে হয় না। বড়ো বেশি বাঙালিনী। আর—

'আমাদের সঙ্গেই এক গ্রুপে টিউটোরিয়াল ছিল।'

আর বলতে হবে না। এবার পুরোপুরি তাকে চিনেছেন সুদীপ্ত। তার স্বামী তো বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন শিক্ষক ছিলেন। কি হয়েছে তার?

'ওর স্বামীকে আর্মিরা মেরে ফেলেছে। ঘর থেকে ডেকে নিয়ে বাইরে আফিয়ার চোখের সামনে গুলি ক'রে মেরেছে। গতকাল পাশের বাড়িতে সে তার ভাইয়ের কাছে এসে উঠেছে।'

এ সংবাদের আজ যেন কোনোই গুরুত্ব নেই। কেউই গুরুত্ব দিল না আফিয়ার ট্রাজেডিকে। ছাত্র-ছাত্রীদের কোন দুঃসংবাদ সুদীপ্তকে আদৌ স্পর্শ করে নি এমন কখনো ইতিপূর্বে হয় নি। কিন্তু আফিয়া তো কেবলি ছাত্রী নয়। তাঁরই এক সহকর্মীর স্ত্রীও। তবু আফিয়ার জন্য মনে তেমন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কই? অন্য সময় হ'লে? ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সামসুজ্জোহা মিলিটারির গুলিতে মারা গেলে কতো বিক্ষোভ প'ড়ে গিয়েছিল! এবং তা কেবলি রাজশাহীতেই নয়, প্রদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই। আর এখন? যাক গে, সে কথা আর ভেবে লাভ কি।

সকলকে নিশ্চুপ দেখে হামিদা আবার বলল—

'আর সবচেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন স্যার! আফিয়ার স্বামীর লাশ পর্যন্ত ওরা দেয় নি। কোথায় নাকি গর্ত ক'রে পুঁতে ফেলেছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল অধ্যাপককেই ওরা অমনি ক'রে মাটি চাপা দিয়েছে। ধর্মীয় বিধান অনুসারে সৎকারটুকু পর্যন্ত করতে দেয় নি! কে জানে, হয়ত একই গর্তে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শুয়ে আছেন কোনো পকেটমারের সঙ্গে জড়াজড়ি হয়ে! এমনটা করা কি উচিত হয়েছে?—সুদীপ্ত ভাবছিলেন। আর ফিরোজ ভাবছিলেন—ঠিক ওই রকম ছাড়া ও খবিশরা আর

করবে কি শুনি! অধ্যাপক তো কখনো দেখে নি জীবনে। দৌড় তো সেই মক্তবের ওস্তাদজি পর্যন্ত। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে লেফ্‌টরাইট্‌। বর্বরদের সঙ্গে একত্র বাসের এই হচ্ছে জ্বালা। জীবনের মূল্যবোধ যাদের মধ্যযুগীয় তা'দের পাশে আধুনিক চেতনাকে পদে পদে বিড়ম্বনা সইতেই তো হবে। কিন্তু আর নয়। এর অবসান এখন চাই-ই।

'আচ্ছা দুলা ভাই, এই যে আপনাদের পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হ'ল, এর পর আপনারা করবেন কী?'

হামিদা প্রশ্নটা করতে চেয়েছিল খুবই সরল ভাবে। কিন্তু ফিরোজ সহসা যেন তাঁর চাচার মানসিকতা ঐ কণ্ঠস্বরে লক্ষ্য করলেন। সেটা অবশ্য ফিরোজেরই দোষ। তিনি যদি সকল ঝোপেই বাঘ দেখতে শুরু করেন তা হ'লে লোকে সে জন্য করবে কী? হামিদার একটি সরল প্রশ্নের উত্তরে ফিরোজ যা বললেন তা যেন তাঁর চাচাকে শোনানোর জন্য—

'কী আর করব! তোমার মামাদের প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে নাকে খত দিয়ে বলব—যা হবার হয়েছে, এবারের মতো মাফ ক'রে দিন; আর কখনো বলবো না যে, আমরা বাঙালি; আর কখনো গণতন্ত্র চাইব না; অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সমতা দাবী করব না; তা ছাড়া বাংলা ভাষা ভুলতে চেষ্টা করব। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে কানে আঙ্গুল দেব। পরিশেষে তোমার মামার মতো দাড়ি রেখে দেব।'

'এতো দুঃখেও সুদীপ্তর হাসি পেল। হাঁ, ফিরোজের ঐভাবে কথা বলার অধিকার আছে বটে। হামিদা তাঁর না হয় ছাত্রী, ফিরোজের তো শ্যালিকা। কিন্তু শ্যালিকার ভূমিকায় হামিদা ভয়ানক অযোগ্যা প্রমাণিত হ'ল। হয়ত সম্মুখে একজন শিক্ষকের উপস্থিতি তার কারণ। হামিদা শুধু বলল—

'আমি কিন্তু দুলাভাই রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালোবাসি। এবং ইংরেজি পড়ছি ব'লে বাংলা ভুলতে চাই তাও নয়। অতএব আমাকে আপনার এইভাবে কথা বলা উচিত নয়।'

সুদীপ্ত দেখলেন, এবার তাঁকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। ওরা দু'জনেই পরস্পরকে ভুল বুঝেছে। এবং এতক্ষণের স্বাভাবিকতা থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। একজন বন্ধু, আর একজন ছাত্রী—দু'জনের কথাই মনে রেখে সুদীপ্ত বললেন—

'ফিরোজের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটাকে মনে রেখে কথা বল হামিদা।'

কিন্তু হায়, কি উদ্দেশ্যে তিনি কথাগুলি বললেন, আর তার ব্যাখ্যা হ'ল কি রকম। মীনাক্ষী টিপ্পনী কাটলেন—

'আপনি বুঝি এখানেও মাস্টারি শুরু করলেন।'

'ওই বদ্ অভ্যাসটা যে ছাড়তে পারি নে, ভাবী।'

'বিশেষ ক'রে ছাত্রী পেলে।'

—কণ্ঠস্বরটা ফিরোজের। কিন্তু একজন ছাত্রীর সামনে কি এমন ক'রে বলাটা ঠিক হ'ল ফিরোজের! সুদীপ্তর তাকানোর ভঙ্গি দেখেই ফিরোজ বুঝেছিলেন, তাঁর বন্ধু মনে আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু বন্ধু! এখন আঘাত পেলে চলবে কেন? এই তো কিছুক্ষণ আগেই বেশ উপদেশ বিতরণ চলছিল। এখন সেই উপদেশটা নিজেকে দিলেই তো হয়। হামিদা তোমার ছাত্রী হ'তে পারে, কিন্তু আমার তো শ্যালিকা, এবং তুমিও আমার বন্ধু। অতএব তোমাদের দু'জনকে জড়িয়ে কোনো রসিকতার সুযোগ হাতছাড়া করি কেন?

কিন্তু সুদীপ্ত ঐ মুহূর্তেই অতখানি ভাবতে পারেন নি। তিনি তাই একটি গুরুতর কথা ব'লে ফেললেন—

'না না, আমরা ছাত্র-ছাত্রীতে কোনো প্রভেদ মনে রাখি নে। বিশ্বাস কর।'

মীনাক্ষী ও ফিরোজ দু'জনেই এবার হেসে উঠলেন। এবং কথাটা বলার পর সুদীপ্তর মনে হ'ল, তাই তো, এতো হাল্‌কা কথা তিনি তো সচরাচর বলেন না। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, গত দু-তিন দিনের ঘটনায় তাঁর সেই পরিচিত সত্তা ও ব্যক্তিত্বের সবটুকু ওলট-পালট হয়ে গেছে।

সুদীপ্ত কিছুক্ষণ আর বলতে পারলেন না। কিন্তু বোঝা গেল, হামিদা বাকপ্রিয় মেয়ে। কিছু না ব'লে ব'সে থাকা তার পক্ষে খুব কঠিন কর্ম। সে তার দুলাভাইয়ের সঙ্গে অনবরত কথা ব'লে যেতে লাগল। তার অনেকখানিই সুদীপ্ত শুনলেন না। এবং মাঝে মাঝে শুনলেনও। তাতে ছাত্রীটিকে তাঁর প্রিয়ংবদা মনে হ'ল। প্রিয় কথাই হামিদা বলেছে—

'আপনারা যে যাই বলুন দুলাভাই, শেখ সাহেবকে কিছুতেই ওরা ধরতে পারে নি।'

কিন্তু শেখ সাহেবকে তোরা তো চিনিস নে—ফিরোজ মনে মনে বললেন। মুখে বললেন—

'স্বেচ্ছায় তিনি ধরা না দিলে কেউ তাঁকে ধরতে পারে নি, এবং পারবেও না। তবে কথা হচ্ছে, ধরা না দেওয়ার ইচ্ছাটা তিনি করেছিলেন কি না।'

ফিরোজ জানতেন, শেখ সাহেব ধরা দিয়েছেন। কেউ তাঁকে বাড়ি থেকে বের করতে পারেনি। শেষ মুহূর্তে এমন কি জোর ক'রে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। তবু এই মুহূর্তে ওই গুজবটার কিছু মূল্য আছে। দেশবাসী জানুক, তাদের প্রিয় নেতা তাদেরকে পথনির্দেশ করার জন্য বাইরেই রয়েছেন।

বাইরে দরজা কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। ফিরোজ গিয়ে খুলে দিলেন।—

'কাকে চাই? কোথা থেকে আসছেন?'

লোকটি ভেতরে আসতেই সুদীপ্ত তাকে চিনলেন—

'আরে হাশমত খাঁ যে, কি খবর?'

হাশমত এক সময় তাঁদের নীলক্ষেত আবাসিক এলাকার দারোয়ান ছিল। মাত্র মাস দুয়েক আগেও ছিল। এখন করছে কি?

'বেবসা করি হুজুর।'

হাশমত খাঁ ব্যবসা করছে! ভালোই তো। বিহার থেকে মোহাজের হয়ে এসে হাশমত খাঁ পিওনের চাকরি করত একটা অফিসে। তাতে চলত না। অগত্যা রাত্রে দারোয়ানী। রাত্রে তাঁদের এলাকা পাহারা দেবার ভার নেওয়ার ফলে আরো অতিরিক্ত ষাট টাকা আয় হ'ত। এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ গত জানুয়ারিতে নীলক্ষেতের চাকরি সে ছেড়ে দেয়। কেন ছাড়ল, কোথায় কি কাজ পেল ইত্যাদি কোনো প্রশ্নই তখন কারো মনে জাগেনি। কিন্তু এখন তো শুধাতেই হয়—

'ব্যবসা করছ তুমি? কিসের ব্যবসা?'

'মহম্মদপুরে একঠো মনিহারী দোকান পেয়েছি হুজুর।'

পেয়েছি মানে কিনে পাওয়া নয়। সে ইতিহাস কয়েকটি প্রশ্ন ক'রে জেনে নিলেন তাঁরা, অর্থাৎ সুদীপ্ত ও ফিরোজ। মীনাক্ষী ও হামিদা বাইরের লোকের সমাগম হ'তেই ভেতরে চ'লে গেছেন।

হাশমতের কাছে সংক্ষেপে যা জানা গেল তাতে হাশমতের কোনো দোষ নেই।

'আমার কোনো দোষ নাই আছে হুজুর। জোর করে হামার কাছে দিয়ে গেল।'

লোকটির বাড়ি ছিল ময়মনসিংহে। গতকাল নাকি জোর ক'রে তার মনিহারী দোকানটা সে হাশমতকে দান ক'রে গেছে। হাশমত ছিল ওই দোকানের সেল্‌স্‌ম্যান। গত জানুয়ারি মাসে সব রকমের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে এই কর্মে ঢুকেছিল। মহম্মদপুর এলাকায় অবাঙালি সেল্‌স্‌ম্যান ছাড়া দোকানের পসার জমানো ছিল শক্ত। অতএব হাশমতকে নিযুক্ত ক'রে ভদ্রলোক ভারি সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। তা ছাড়া হাশমত বেশ চালাক চতুর লোক; এবং ভারি বিশ্বস্ত। হাশমতের চেষ্টায় এক মাসেই দোকানের আয় প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি

পেয়েছিল। সবি তো বোঝা গেল। কিন্তু সেই বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ গোটা দোকানটাই একেবারে দান ক'রে গেল। ওই রকম দান কেউ করে নাকি! সুদীপ্ত শুধালেন—

'লোকটা কি আর কখনো ফিরে আসবে না ব'লে গেছে?'

'তা কিছু বলেনি হুজুর। খালি কাল সকালে হামারে চাবি দিয়ে বলে গেছে—রোজ তুমি দোকান খুলবে, আর কেউ পুছ করলে কিংবা লুঠ করতে এলে তুমি বলবে দোকানটা তোমার, বুঝলে।'

'তাই নাকি! তারপর?'

'তারপর নিজের হাতে তিনি বাংলা হরফে লেখা সাইনবোর্ড নামিয়ে ফেললেন। হামারে বললেন, উর্দুতে একঠো সাইনবোর্ড লিখে এখানে টানিয়ে দিও।'

'তুমি তা দিয়েছ তো?'

'হাঁ, হাশমত সে আদেশ পালন করেছে। সে তার মনিবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারি। আগে দোকানের নাম ছিল 'মুক্তা মনিহারি'। এখন সেখানে গেলে দেখা যাবে, বাংলা হরফের কোনো চিহ্ন তার ধারে কাছে কোথাও নেই। তার পরিবর্তে উর্দু হরফে সবুজ কালি দিয়ে লেখা—'হাশমত ইস্‌টেশনারি'।

ফিরোজ এতক্ষণ কিছু বলেন নি। সব শুনছিলেন। এবং বুঝতে কোনোই কষ্ট হচ্ছিল না যে, দোকানটাকে নিছক বাঁচানোর জন্যই ভদ্রলোকের এতো সব চেষ্টা। দোকানের মালিক অবাঙালি—এমন একটা ধারণা বাইরে প্রচারিত থাকলে তবেই ওই এলাকায় তা লুটপাটের কবল থেকে রেহাই পেতে পারে। ঠিকই ভেবেছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু যে সর্ষে দিয়ে ভূত ভাগানোর আয়োজন করেছেন সেই সর্ষেতেই যে ভূত! ফিরোজ শুধালেন—

'আচ্ছা ধর, কয়েকদিন পর যদি দোকানের মালিক ফিরে আসেন।'

'তো হাম কিয়া কারে গা! দোকানের মালিক তো এখন হামি—ও তো এখন হামারা দোকান আছে।'

'তা আছে, থাক। কিন্তু সেই ভদ্রলোক এসে যদি ফেরত চান।'

'কিয়া বাত? খয়রাত ক'রে আবার তা ফেরত চাইবে! চাক্কু মেরে একেবারে হালাক ক'রে দিব না!

দু'জনেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন, হাশমত এখন আর সেই পিয়ন নয় যেন। এখন সে যেন এই এক দিনেই তাঁদের সঙ্গে সমমর্যাদাসম্পন্ন ভদ্রলোক হয়ে উঠেছে।.. তা যা খুশি হোক গে, আর ভাবা যায় না। কতো আর অত্যাচারের অবিচারের যন্ত্রণা পোহানো যায়! না, ঐ প্রশ্ন আর নয়! ফিরোজ কাজের কথা পাড়লেন—

'এখানে এসেছ কি উদ্দেশ্যে।'

'গাজী সাহেব কা লিয়ে একঠো খত্ হ্যায়।'

গাজী সাহেব অর্থাৎ ফিরোজের চাচার কাছে একটা চিঠি নিয়ে এসেছে হাশমত। কার চিঠি? সে কথা কি আর বলবে! এখন সে একটা দোকানের মালিক। অতএব বুদ্ধিমান হয়েছে বৈ কি। তবু একটু বাজিয়ে দেখা যাক না—

'খত পাঠাল কে?'

'মওলানা সাহাব ভেজ দিয়া।'

কোন্ মওলানা! দেখা গেল হাশমত খাঁ এই লাইনে একজন গবেট। সব কথা অকপটে বলে ফেলল। এমন কি যখন শুনল যে, ফিরোজ হচ্ছেন গাজী সাহেবের ভাইপো তখন বিনা দ্বিধায় চিঠিখানা ফিরোজের হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেল সে। গাজী সাহেবের মতো লোকের ভাইপো যখন তখন সে ঈমানদার না হয়ে যায় না—হাশমতের চিন্তার দৌড়—এর চেয়ে বেশি হবে কি ক'রে?

কিন্তু হাশমত বড়ো উপকার ক'রে গেল। চিঠিখানা তাঁর চাচার নয়, তাঁরই পাওয়ার দরকার ছিল বেশি। খোদ সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এই ব্যক্তিগত পত্রে মওলানার একান্ত বিশ্বাসভাজন গাজী সাহেবকে অত্যন্ত জরুরি কয়েকটি কথা লেখা হয়েছে। তার সারকথা হচ্ছে,সামরিক কর্তৃপক্ষের এই মুহূর্তেই কিছু দালাল দরকার। মুসলিম লীগ বা জামাতে ইসলামের লোক হিসাবে যারা চিহ্নিত হয়ে আছে তাদের কথার এখন খুব একটা দাম হবে না। সে জন্য খোদ আওয়ামী লীগের কোনো লোক পেলে ভালো হয়! গাজী সাহেব তাঁর ভাইপো ফিরোজকে যদি হাত করতে পারেন তা'হলে মওলানা জানিয়েছেন, সরকার তাকে একটা আমদানি লাইসেন্স দিতে রাজী আছে। ফিরোজকে কি করতে হবে তারও সামান্য ইঙ্গিত পত্রে আছে। আপাততঃ সামরিক বাহিনীর কাজ সমর্থন করে একটা বিবৃতি দিতে হবে—বলতে হবে,আওয়ামী লীগের কিছুসংখ্যক দুস্কৃতিকারী যে দেশকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল তার সাথে অধিকাংশ আওয়ামী লীগ সদস্যের কোন যোগ নেই। ওই দুস্কৃতিকারীদের দমন করতে গিয়ে সেনাবাহিনীকে যে ব্যবস্থা নিতে হয়েছে সেটা যথেষ্ট সময়োপযোগী হয়েছে; ওই ব্যবস্থা গৃহীত না হলে দেশ জাহান্নামে যেত.. ইত্যাদি। পরিশেষে বলা হয়েছে, ফিরোজ কথা শুনতে না চাইলে তাকে যেন ভয় দেখানো হয়—তার ঘর-বাড়ি, লুটপাট করা হবে, তাকে ধ'রে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গিয়ে পীড়ণ চালানো হবে, পরিশেষে সামরিক আদালতে বিচার ক'রে হত্যা করা হবে।

চিঠিখানা প'ড়ে তা নীরবে ফিরোজ সুদীপ্তর হাতে চালান ক'রে দিলেন। ইংরেজিতে টাইপ করা একখানা চিঠি , নিচে মওলানা নাম সই করেছেন আরবীতে। সুদীপ্ত পড়তে পড়তে শুনলেন, ফিরোজ বলছেন—

'খবিশদের এটা কি রসিকতা? নাকি এ বেকুবের স্পর্ধা? যা খুশি আমাদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায় বলে মনে করে নাকি?

'আবার কাকে গালাগালি শুরু করলে?'

—বলতে বলতে মীনাক্ষী এলেন ঘরে। তাঁর সঙ্গে হামিদার হাতে চায়ের সরঞ্জাম। চাচী সঙ্গে কিছু নাশ্‌তা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মীনাক্ষীই বাধা দিয়েছেন—

'এই মাত্র ওরা সব খেয়ে বেরুলো। আর কিছু লাগবে না। শুধু চা দিন।'

'স্যারকে শুধুই চা দেওয়া যায় নাকি!'

—হামিদা বাধা দিতে গিয়েছিল। কিন্তু মীনাক্ষীর ধমক খেয়ে থেমে যেতে হয়েছে তাকে।

'তোর স্যার যখন তোর বাড়ি যাবে তখন তোর ইচ্ছে মতো খাওয়াস। এখন আমাদের বাড়িতে কি খাওয়ানো দরকার সেটা আমরা বুঝব।'

মীনাক্ষী ঠিকই বলেছেন। তখন মাত্র চায়ের পিপাসা ছিল ওদের। চা খেতে খেতেই চাচা এলেন। পরদার ফাঁক দিয়ে চাচাকে দেখা গেল। কিন্তু চাচার পেছনে ওরা কারা? সশস্ত্র ফৌজের একটা ক্ষুদ্র দল যে। সকলেই শিউরে উঠলেন? চকিতে সকলের মনেই নানা কথার বিদ্যুৎ খেলে গেল।

চাচা আমাদেরকে আর্মির হাতে তুলে দিবে নাকি! আমার জন্য আমার বন্ধুও মরবে।.......

আর্মি এখানে! ভদ্রলোকের কোন আত্মীয় আর্মিতে থাকে নাকি! নাকি অন্য কিছু ব্যাপার আছে! কি থাকতে পারে এখানে!

ও মা মিলিটারি যেঁ! মামার বাড়ি সার্চ করবে নাকি! তা হ'লেই হয়েছে লোকগুলো এখনো তো ভরা আছে গ্যারেজে?......

লোকগুলো মানে তিনজন পুলিশ। রাজারবাগ পুলিশের লোক ওরা। আর্মির সাথে যুদ্ধ ক'রে কিছু ওদের মরেছে, কিছু পালিয়েছে। অনেকেই আশ্রয় নিয়েছে আশেপাশের বাড়িতে। চাচার বাড়িতে যে তিনজন এসেছিল তাদেরকে বেশ সমাদরেই চাচা বরণ করেছিলেন। কারফিউ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গতকাল ওরা পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু চাচা বলেছিলেন—

'না বাবারা, ওই কাজ করবেন না। অবস্থা একটু শান্ত হোক, আমি নিজে গাড়িতে ক'রে আপনাদেরকে সাভারে অথবা ডেমরার ওদিকে কোথাও রেখে আসব।'

এ কথায় খুবই আশ্বস্ত হয়েছিল পুলিশ তিনজন। আল্লাহ্‌র কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল মনে মনে। তারা যে এমন একজনের ঘরে ঠাঁই পেয়েছে সে একান্তই কপালের গুণে। আহা, মানুষ তো নয় গো, যেন ফেরেশতা একেবারে। নামাজ, কালাম, মুখভরা দাড়ি– দেখলেই ভক্তি হয়। গ্যারাজ থেকে অচল গাড়িখানা বের ক'রে সেইখানে জীর্ণ কম্বল ও তোসক বিছিয়ে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাতে অসুবিধা বিশেষ ছিল না। কারণ ঘরখানা প্রথমে তৈরি হয়েছিল চাকরদের বাসের জন্যই। অতএব ছোট একটি জানলা সেখানে ছিলই। পরে ওটাকে গ্যারাজ বানানোর জন্যে সামনের দিকটা

ভেঙে দরজা বড়ো করা হয়েছিল; কিন্তু জানলাটি বন্ধ করা হয় নি। পুলিশ তিনজনকে সেখানে পুরে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে রাখা হত, যেন কেউ সন্দেহ না করে। ঘরে দেওয়া হয়েছিল পেচ্ছাব ইত্যাদির জন্য একটা খালি কেরোসিনের টিন, এবং এক কলসী পানি। অতএব ব্যবস্থাটাকে পুলিশের কাছে যতোদূর সম্ভব নিখুঁত বলেই মনে হয়েছিল। খাবারের সময় ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়ানো হ'ত। সেইটেই ওদের নিকট প্রতীয়মান হত পরম সমাদর বলে।

আটাশে মার্চের বেলা প্রায় তিনটের দিকে পরম সমাদরে গ্যারাজের তালা খুলে ফিরোজের চাচা গাজী মাসউদ-উর রহমান বাঙালি পুলিশ তিনজনকে পাঞ্জাবি সৈনিকদের হাতে তুলে দিলেন। কর্তব্য সমাধা করে একটা পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে চাচা ঘরে এসে সোফার উপর বসলেন। হামিদাকে বিজলি পাখা চালিয়ে দিতে বললেন এবং ফিরোজদের দিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন— 'একটা দায় চুকল। উহ্! কী যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম বাবা!'

অতঃপর নিজেই আনুপূর্বিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন—

'তোমরা হয়ত ভাবছ, আমি বেঈমানী করলাম। আশ্রিতকে রক্ষা করা আশ্রয়দাতার কর্তব্য। হাঁ বাবা, আমি সে কথা একশো বার মানি। আশ্রিত যদি আমার নিজের জীবনের শত্রু হ'ত আমি তাকে জীবনের বিনিময়ে হ'লেও রক্ষা করতাম। কিন্তু এই পাক-ওয়াতানের সাথে বেঈমানী কিছুতেই আমরা সইবো না।'

ফিরোজ বা অন্য কেউ কিছুই বলেন না দেখে তিনি আবার বলা শুরু করলেন—

'আগে তো দেশ। তারপর মানুষ। বল এ কথা তুমি মান কি না।'

না। আর চুপ থাকা যায় না। কিছু বলতেই হয়। কিন্তু সোজা কথা তো বলা যাবে না। কে জানে, তাঁদেরও দশা ওই পুলিশের মতো হয় কি না। ফিরোজ একটু ভেবে বললেন—

'না চাচা, আগে ইসলাম। তারপর দুনিয়ার যা কিছু সব।'

'বল কি বাবা,! ঠেলা খেয়ে মতি ফিরল নাকি! এমন কথা তো এর আগে কখনো তোমাকে বলতে শুনিনি।—না। তা ব'লে সহজে বিশ্বাস করছিনে। তুমি ঠাট্টা করছ বোধ হয়।'

চাচা তবে ঠিকই ধরেছে তো। মনে মনে ফিরোজ একটু হাসলেন। এবং চুপ ক'রে গেলেন। সুদীপ্তও ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছেন ততক্ষণে। তিনি একটু অভিনয়ের চেষ্টা করলেন। ফিরোজকে সমর্থন ক'রে বললেন—

'জি না। ঠাট্টা করবে কেন। ঠিকই তো বলেছে। আপনাদের মতো বুদ্ধি-বিবেক যাদেরই আছে তারাই বলবেন, ইসলামকে বাদ দিলে এই পাকওয়াতানের অস্তিত্ব কোনোখানেই টেকে না।'

সুদীপ্ত ফিরোজের চাচাকে খুশি করতে চাইছিলেন। কিন্তু সব কাজ সকলে পারে? অন্ততঃ সুদীপ্ত যা করতে চাইছিলেন তা যে পারেন নি সেটা চাচার পরবর্তী কথাতেই বুঝা গেল। চাচার কণ্ঠস্বরে বেশ উত্তেজনা—

'কি বলছেন সাহেব। আমাদের বুদ্ধি বিবেক?—বুদ্ধি বিবেক আপনাদের নেই? আপনাদের বুদ্ধি-বিবেক কি কয়?'

'না, সুদীপ্তর মতো ভদ্রলোকের কাজ নয় চাচার মুখোমুখি হওয়া। অতএব সুদীপ্তকে আড়ালে দিয়ে ফিরোজ সামনে এলেন—

'আমাদের বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে তো চাচা আপনাদের পাকিস্তান চলবে না, সে জন্যই বলা হচ্ছে...

কিন্তু ফিরোজের আর বলা হ'ল না। তাঁর কথায় আরো তেতে উঠে চাচা আরো বেশি মাত্রাজ্ঞান হারালেন, এবং ফিরোজকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে না দিয়ে ব'লে উঠলেন-

'কিয়া বাত! আপনাদের পাকিস্তান!—পাকিস্তান শুধু আমাদের? তোমাদেরও নয়?'

মনে মনে চাচা এবার খুব খুশি। কেমন ঠেসে ধরেছি বাবা! পলিটিক্স আমাদেরও জানা আছে। তোমাদের ভেতরে কি আছে আমরা তা দেখতে পাই না মনে কর! পাকিস্তানকে তোমরা যে কখনো মেনে নিতে পার নি সে কি আমরা জানি নে! সামান্য একটু বিরতি দিয়ে চাচা আরো বললেন—

'সেই জন্যই তো ইয়াহিয়া খানকে এমন কঠোর ব্যবস্থা নিতে হ'ল। এ ছাড়া দেশকে বাঁচানোর আর কি পথ ছিল বল।'

তা ঠিক। তাঁর চাচার পক্ষে ঠিক এই রকমটাই ভাবা স্বাভাবিক। ইয়াহিয়া খানের এত নরহত্যার সমর্থনও তা হলে আছে দেশে। অবশ্যই চাচা বলবেন,

'নরহত্যার সমর্থক আমরা নই, তবে আমাদেরই কর্মের ফলে ইয়াহিয়া খানকে যে এই নরহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে সেই সত্যকে তো বাবা অস্বীকার করতে পারবে না।'

তাই নাকি চাচা! এ যে খোদ ইয়াহিয়া খানের কণ্ঠস্বর মনে হচ্ছে। এবং ইয়াহিয়া খানের শয়তানীর জবাব তো আজ একটাই, সেটা কোন মানব কণ্ঠের ভাষায় দেওয়া যাবে না আর, দিতে হবে অস্ত্রের ভাষায়। চাচা, তোমার জন্যও মনে হচ্ছে, তেমনি অস্ত্রের জবাব আবশ্যক হয়ে পড়েছে। হাঁ মাঝে মাঝে এমন এক-একটা সময় আসে যখন লাঠির যুক্তি ছাড়া আর কোনো যুক্তির পথে এগোনো যায় না। কিন্তু এই মুহূর্তেই ফিরোজ তার চাচাকে লাঠি দেখাতে চান না। তিনি প্রবল চেষ্টায় শান্ত কণ্ঠে বললেন—

'কিন্তু এহিয়ার কর্মের ফলেই যে আমাদেরকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হয়েছিল সেইটাই বা আপনি অস্বীকার করবেন কী ক'রে? অহিংস আন্দোলন দমনের জন্য...,

'অহিংস আন্দোলন?'—ফিরোজের কথা শেষ হবার আগেই চাচা প্রায় গর্জন ক'রে উঠলেন, 'বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা হয় নি ঢাকা শহরে? আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি।'

'তবু বলব দাঙ্গা হয় নি।' ফিরোজের কণ্ঠে উত্তেজনা আর গোপন থাকল না, 'দাঙ্গার চেষ্টা হয়েছিল মাত্র। এবং সে জন্য গোপন উস্কানী ছিল ওই এহিয়া-সরকারের। আমরা যথাসময়ে সে চেষ্টা বানচাল ক'রে দিয়েছি। তা না করলে এই ঢাকা শহরে একজনও বিহারি বেঁচে থাকত ভেবেছেন।'

না, ওই সব ভাবতে চাচা রাজী নন। তিনি কেবল সেইটুকু ভাবতে ও বলতে পারেন যেটুকু তাঁর মনিবরা তাঁকে শিখিয়ে থাকেন। অতএব কেবল সেই শেখানো কথার পুঁজি নিয়ে তিনি ভাইপো ফিরোজের সাথে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারেন না। কিন্তু সে তো অন্য সময়ের কথা। এখন যে সময়টা তাঁদের অত্যন্ত অনুকূলে যাচ্ছে ব'লে তারা মনে করেন সেই সময়ও তাঁকে ভাইপোর কাছে হার মানতে হবে? যুক্তিতে না পারলে শক্তিতে হারাবে কে? চাচা তাই ব'লে উঠলেন—

'কি বলছ বাবা! ঢাকা শহরে একজন বিহারিকেও রাখতে না! আমরা তা হ'লে কি ব'সে ব'সে তামাসা দেখতাম? বিহারিরা মুসলমান না! নিরপরাধ মুসলমানের রক্তে মাটি ভিজিয়ে তোমরা আমাদের হাত থেকে রেহাই পেতে ভেবেছ।'

শেষের কথাগুলি দাঁতে দাঁত চিপে এমন ভঙ্গিতে চাচা বললেন যে, মেয়েরা তো মুখে আচল দিয়ে হেসেই ফেললেন। ফিরোজ হাসলেন না। ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। ভণ্ডামীর একটা তো সীমা থাকা দরকার। এখনি বললেন, আমরা বিহারি মেরেছি ব'লে ইয়াহিয়া সৈন্য লেলিয়ে দিয়েছে আমাদের পেছনে। এখন আবার বলছেন, আমরা যদি বিহারিদের রক্তে ঢাকার মাটি ভেজাতাম তা হ'লে তাঁরা তা সহ্য করতেন না। আমরা তা হ'লে, চাচা, করেছি কোন্ কামটা? বিহারি মেরেছি? না, ভবিষ্যতে মারতাম?...কিন্তু এ প্রশ্ন ফিরোজ তুললেন না। অন্য একটি কথা তার মাথায় এসেছে। তিনি বললেন—

'কিন্তু এখন তো, চাচা মুসলমানের রক্তে ঢাকার মাটি সয়লাব হয়ে গেল। কি করেছেন সে জন্য? বা করছেন? উঠুন, ইসলামী জোস একটু দেখান।'

চাচা সহসা গম্ভীর হয়ে গেলেন। হাতের লাঠি আস্তে মেঝের উপর ঠুকে বললেন—

'বাবা ফিরোজ, তোমার সঙ্গে আমার রসিকতার সম্পর্ক নয়। তুমি বলছ, মুসলমানের রক্তে ঢাকার মাটি সয়লাব হয়েছে। আমি বলছি, হয় নি।'

বলতে বলতেই চাচার কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়ল আবার। আবার তেমনি দাঁতে দাঁত চিপে বললেন—

'যারা সব মরেছে তারা মুসলমান বলতে চাও? তারা দেশের দুশমন? তারা কাফের।'

সহসা হামিদা কি মনে ক'রে কথা ব'লে উঠল—

'কিন্তু মামা, আমাদের মনিরুজ্জামান স্যার সম্পর্কে শুনেছি, খুবই ঈমানদার ও পরহেজগার ছিলেন।'

তির্যক দৃষ্টিতে ফিরোজের চাচা হামিদার দিকে তাকালেন। কিন্তু ধীর কণ্ঠে বললেন—

'ওটা তুই বুঝবি নে মা। আল্লাহ্ পাক ওটা ঈমানদারের ঈমান পরীক্ষা করেছেন।'

এই সময় বেলা এসে তার আব্বার কোলে চ'ড়ে গলা জড়িয়ে ধরল—

'চল, বাড়ি যাবে না আব্বু।'

তাই তো মা, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। চাচার সঙ্গে ফিরোজের আলোচনা এখন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে মাঝখানে কাউকে এসে দু'জনের দু'কান ধ'রে দু'দিকে সরিয়ে দেওয়াই তো কর্তব্য। হ্যাঁ, সে কর্তব্য পালনের উপযুক্ত ব্যক্তি এখানে বেলাই হ'তে পারে।

'হ্যাঁ মা, চল যাই। তোমার আম্মাকে ডাক।' তারপর ফিরোজের পানে তাকিয়ে—'চল উঠি।'

ফিরোজ এই কথাটির প্রতীক্ষাতেই ছিলেন যেন। যদিও এ বাড়িতে আজকের রাতটা থাকবেন ব'লেই এসেছিলেন, তবু এখন এখান থেকে বেরোতে পারলেই যেন বাঁচেন। পুলিশ তিনজনকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিতে দেখেও 'এখানে রাত্রি যাপন করবেন এতোখানি সাহস কিংবা নির্বুদ্ধিতা কোনটাই ফিরোজের ছিল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলেন—

'আরে তাই তো। হাতের ঘড়ির পানে তাকিয়ে ঘড়ি দেখতে দেখতে এখনই তো বেরোনো দরকার মীনাক্ষী, ভাবীকে ডাক।'

মীনাক্ষী? বৌ-মার ঐ নাম রাখা হয়েছে বুঝি? গাজী সাহেব কেবল 'নাজমা' নামটাই জানতেন। কী সুন্দর নাম—নাজমা! তাও পছন্দ নয় ছেলের। ও যে মুসলমানের নাম। তা বাবা, হিন্দু মেয়ে বিয়ে করলেই পারতে, একটা মুসলমান মেয়েকে হিন্দু বানানো কেন! নাহ্, কথাটা চেপে রাখা যায়া না। গাজি সাহেব বলেই ফেললেন–

বাবা ফিরোজ, একজন মুসলমানকে হিন্দু বানানো যে কতো বড়ো কবীরা গুনাহ্, তা জান?'

নাজমা ততক্ষণে ভেতরে চ'লে গেছেন, পেছনে পেছনে হামিদাও গেছে। বেরিয়ে পরার জন্য ফিরোজ মন প্রস্তুত ক'রে ফেললেন। হাঁ, বেরোতেই হবে। থাকবেন ব'লে এসেছিলেন। কিন্তু থাকাই যখন হবে না, তখন আর এক মুহূর্তও না। পথ যে কি ভয়াবহ সে অভিজ্ঞতা আসবার সময়ই হয়েছে। এতোক্ষণে তা আরো ভয়াবহ হওয়ার কথা। কারফিউ শুরু হ'তে কতো দেরি আর? এখনো পঁয়তাল্লিশ মিনিট। না, সময়টা কম নয়। তবু যতো তাড়াতাড়ি বেরোনো যায়-----ফিরোজ ভাবছিলেন। এমন সময় চাচার ঐ প্রশ্ন—

মুসলমানকে হিন্দু বানানো যে কবীরা গুনা তা কি জান? হা জানি, কিন্তু বাঙালিকে খোট্টা বানানোর চেষ্টা তার চেয়েও জবর গুনা। কিন্তু থাক, কথা বললে কথা বেড়ে যাবে। কথা বাড়িয়ে এ বাড়িতে আর তিনি সময় নষ্ট করতে চান না। তাই, তিনি যেন শুনতেই পান নি এমনিভাবে অন্যমনস্ক থাকতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু চাচা তা থাকতে দেবেন কেন। তবে চাচা আর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কিছু বললেন না। যেন স্বগতোক্তি করলেন—

'এই জন্যই তো বাপ তোমাদের দলকে এখানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হ'ল।'

ফিরোজ মনে মনে ঠিক করেছিলেন, কিছু বলবেন না কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়? ব'লে উঠলেন—

'মনে হচ্ছে যেন আপনিই আমাদের দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন?'

'আলবৎ করেছি। কেন করব না? তোমরা ব'সে ব'সে এখানকার মুসলমানগুলোকে হিন্দু বানাবে আর আমরা তাই দেখব হা ক'রে! আমাদের ঈমান কি এতোই কমজোর হয়ে গেছে!'

না। আর কিছু বলা হবে না। তাঁর বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, বাংলা শব্দে নাম রাখলেই যদি মুসলমানীত্ব চ'লে যায় তবে সে তো যাওয়াই উচিত চাচা! কিন্তু না। থাক। যাবার সময় আর তিক্ততা বাড়িয়ে লাভ নেই। ওই তো মেয়েরাও সব বেরিয়ে এসেছে। চল যাওয়া যাক।

'আচ্ছা আসি চাচা। আস্‌-সালামো আলায়কুম্‌।'

'ওয়া আলাইকুম্‌ উস্‌-সালাম। মাঝে মাঝে এসো বাবা। আজ এসে যা উপকারটা করেছ!'

'কি ভাবে?'

'ওই যে তোমার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। শহরের যা অবস্থা। গাড়ি না হ'লে বেরোনোই দায় এখন। ফোনও অচল হয়ে আছে সারা শহরে। অথচ দেশদ্রোহী ক'জন গাদ্দার পুলিশকে যে বাড়িতে ধ'রে রেখেছিলাম সে খবরটা ওদেরকে দেওয়া দরকারও ছিল খুবই।'

তাই নাকি! তা সে খবরটা এতো ঘটা ক'রে দেবার দরকারটা কি শুনি। বাড়িতে আর্মি আসা দেখে তো সেটা অনুমান করা গিয়েছিল। তবে? মনে কোনো বদ্‌ মতলব আছে নাকি! এখনও তোমার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আছে? এ জন্য তো এখনো তুমি জাত রাজনীতিক হ'তে পার নি—ফিরোজ নিজেই নিজেকে শোনালেন। এতোখানি বোকামির কোনো মানে হয়। চাচাজি জামাতে ইসলামের লোক, ওখানে আপাততঃ আত্মগোপন ক'রে বাইরে যাবার পথ খুঁজবেন—ছেলের কি আশা! এখনো যদি জামাতে ইসলাম না চিনে থাক রাজনীতি ছেড়ে দাও গে।

গাড়ি ছেড়ে দেবার মুহূর্তে চাচা শুধিয়ে বসলেন—

এখন তোমার বাড়িতেই যাচ্ছ তো বাবা। মানে, দরকার পড়লে তোমার বাড়ি গেলেই তোমাকে পাব তো?'

চাচার মুখের দিকে তাকালেন ফিরোজ। কি ধরনের দরকার চাচা? তোমার চোখে ওটা কি? ঐ ধূর্ত হায়েনাটাকে এখনো চিনতে ভুল হবে ভেবেছ! ফিরোজ মুখ ফিরিয়ে নিলেন।—

'হাঁ, পাবেন। তবে দেশ যেদিন স্বাধীন করতে পারব সেইদিন।'

ব'লেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। আর একটা কাগজের ঢেলা ছুড়ে দিলেন চাচার গায়ে। ওটা সেই হাশমত খানের বয়ে-আনা চিঠি। কিন্তু চিঠি চাচার হাতে রইল। কি সেটা?—সে কৌতূহলের চেয়েও বড়ো একটা বিস্ময়-বিমূঢ়তা ছিল চাচার মনে। এ্যা, বেতমীজ ভাইপো বলে কি! এখনো তবে বিষদাঁত ভাঙেনি। আচ্ছা...। কিন্তু হায়, ভাইপো যে নাগালের বাইরে! এখন যে হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে করে। জাহেলটাকে এমনি ছেড়ে দিলাম! এটা কী দিয়ে গেল! চিঠিখানা চাচা পড়লেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ছিড়ে ফেলে দিলেন। তারপর কোরানের একটি আয়াত প'ড়ে ব'লে উঠলেন—ওরে, আল্লাহ্ ওদের অন্তঃকরণ সীলমোহর ক'রে দিয়েছে, ওদের কি আর সুপথে ফেরানো যায়। ওরা জাহেল।

কিন্তু একটা জাহেলকে ছেড়ে দিলেন তিনি? হায় হায়! মিলিটারি তো এসেই ছিল বাড়িতে। একই সঙ্গে দুই কাজ হয়ে যেত। লাভের মধ্যে গাড়িখানা মাঙ্না পেয়ে যেতেন। কিন্তু এখন যে পস্তানোই সার। এক কাজ করা যায়...কিন্তু ছাই ফোনও তো অচল। সচল থাকলেই বা হত কি! গাড়ির নম্বর জানা আছে? ওই দেখো, গাড়ির নম্বরটাও নেওয়া হয় নি। যাঃ, সব হাত-ছাড়া হয়ে গেল।

'হামিদা আমার সঙ্গে চ'লে আসতে চাইছিল।'

-মীনাক্ষী গাড়ির মধ্যে কথাটা ফিরোজকে জানাবার অবকাশ পেলেন। ফিরোজ খুব সহজভাবে নিলেন কথাটা। এখন আর ঐ কথার কোন মানে হয় না। অতএব যেন একটা সংবাদ শুনলেন, যেন হামিদা নামে একটি মেয়ের মনের ইচ্ছাটাকে জানা গেল মাত্র—এমনি একটা ভাব নিয়ে তিনি শুধু বললেন—

'ওখানে থাকা তো হামিদার পক্ষে কষ্টকরই বটে।'

'শুধুই কষ্টকর, হামিদার পক্ষে ওটা আস্ত একটা জাহান্নাম।'

—আমিনা তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলেন। তিনি সারাক্ষণ অন্দরমহলে ছিলেন, বাইরের ঘরে একবারও আসেন নি। সেখানে ভেতরের ঘরের প্রতিটি জানলা পুরু পর্দা দিয়ে ঢাকা; মুহূর্তের জন্যও তার কোনো-এক প্রান্তও একটু ফাঁক করার হুকুম নেই। বারান্দা ঘন চিক দিয়ে ঘেরা। মানুষ ওখানে থাকে কি ক'রে? শুধুই আলো-বাতাসের অভাব যে, তা-ই নয়, ভীষণ নোংরাও বটে। আর বাতাস ওর মধ্যে ঢুকতে না পারলেও মাছি ঠিকই ঢুকে—এতো মাছি সারা ঘরে! ছি-ছি, সারা গা ঘিন ঘিন করে এখনো সেই দৃশ্য মনে পড়লে। ওর মধ্যে

স্বাস্থ্য বাঁচে? কিন্তু চাচার ইসলাম তো বাঁচে। আমিনার বাঁচতে ইচ্ছা করেনি। অন্ততঃ একটা রাতও যে এখানে কাটাতে হবে মনে তেমন সম্ভাবনার উদয় হ'তেই আমিনার ম'রে যেতে ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু প্রাণ পেয়ে যেন বেঁচেছেন যখন মীনাক্ষী গিয়ে খবর দিয়েছেন—

'না ভাই, এখানেও থাকা হচ্ছে না আমাদের। আবার যে কোথায় যাই।'

'চলুন না সকলে আমার খালার বাসায় যাই। বেশ বড়ো বাড়ি ওদের।' ফিরোজের চাচী তখন সেখানে ছিলেন না। কিন্তু হামিদা ছিল। মীনাক্ষীদের চ'লে যাবার কথা শুনে হামিদার মন খারাপ হয়েছিল খুবই। সে মীনাক্ষীকে অনুরোধ জানিয়েছিল—

'আমাকেও সুদ্ধ আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন না বুবু।'

এখন মীনাক্ষীর বার বার মনে হ'তে লাগলো, মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে এলেই ভালো হ'তো। কিন্তু নিজেরাই তাঁরা কোথায় যাবেন—সেই অনিশ্চয়তার মধ্যে তখন হামিদার অনুরোধকে গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় নি।

এত বেশি নির্জনতা কি সহ্য করা সম্ভব? বড়ো রাস্তায় নামতেই নির্জনতার বিভীষিকা তাদেরকে চারপাশ ঘিরে আক্রমণ করল। এই বিভীষিকার মধ্য দিয়ে বোধ হয় তাঁদের এ যাত্রা আর ফুরোবে না—এমনি মনে হ'তে লাগল। কিন্তু সব যাত্রাই তবু ফুরোয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা মানুষের দেখা পেলেন।

শান্তিনগর বাজারের কাছে-বহু মানুষ। আসবার সময় তো এখানে একটি জনপ্রাণীও ছিল না। কিন্তু এখন এতো মানুষ! এক সঙ্গে অনেক মানুষ, মানুষের চীৎকার এবং সারি সারি ট্রাক। এ দেখে মনে বল পাবার কথা। কিন্তু ফিরোজের বুক কেঁপে উঠল। কোনো বিজন প্রান্তরে একটি মানুষের জন্য সমস্ত চিত্ত যখন পিপাসিত তখন যদি মানুষের দেখা মেলে! কিন্তু পরক্ষণেই যদি বোঝা যায়, সে মানুষেরা সব মানুষ উড়ে! প্রথমে যাদের মানুষ মনে হয়েছিল, ফিরোজরা দেখলেন, একটিও তারা স্বাভাবিক মানুষ নয়। কিছু সৈনিক এবং অধিকাংশ লুটেরা। আপনিই গাড়ির গতি মন্থর হয়েছিল-মূলতঃ ভয়ে সামান্য কৌতূহলও তার সঙ্গে ছিল। এতোগুলো মানুষ এখানে করছে কি? বাজার লুট করছে। বুঝতে বেশি বিলম্ব হয়নি ফিরোজের। প্রথমেই বুঝলেন জনতার ভাষা-বাংলা নয়। উর্দু ভাষার প্রবল বাক্যস্রোত অনর্গল প্রবাহিত হচ্ছে আর বোঝাই হচ্ছে ট্রাকগুলি। গম, ছোলা, গুঁড়ো দুধের টিন, চা, চিনি, কেরোসিন, ঘি, সোয়াবিন এবং সেই সঙ্গে আরো কতো কি। পাঁচটা ট্রাক ইতিমধ্যেই বোঝাই হয়ে গেছে। ষষ্ঠটি বোঝাই হচ্ছে। আর একটি জওয়ান মুভি ক্যামেরায় সেই বাজার লুটের ছবি নিচ্ছে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। কিন্তু কেন? কারণটা সেই মুহূর্তেই ফিরোজ বুঝতে পারেননি। বুঝেছিলেন বহু পরে যখন একটি সাংবাদিক-সম্মেলনে ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, বাঙালিরা বিহারীদের প্রাণ নিতে এবং সম্পত্তি লুটপাট করতে শুরু করলে তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে সেনাবাহিনী

শহরে নামাতে হয়েছিল। ....ওরে হারামজাদা! ফিরোজ উত্তেজিত হয়েছিলেন সেদিন।

কিন্তু আজ কেমন যেন একটু ভয় করতে লাগল। অবশ্যই বাজারে উর্দুর সংলাপ-বিচিত্রা চিরদিনই ফিরোজের মনে একটা অদ্ভুত রসের সঞ্চার করে কিন্তু আজ রসাপ্লুত হওয়ার অবকাশ ছিল কোথায়।

...আবে চান্দু, ই ধার লে আও, ই ধার...আরে চাউল নেহি, গম লে আও, ছোলা লে আও, জলদি করো জলদি...গুঁড়া দুধ? জরুর লেগা...

হরেক রকমের কথা। ফিরোজরা বুঝলেন, যেহেতু এরা অবাঙালি, অতএব লোভটা গমের প্রতি। চাল রেখে দিয়ে গম নিয়ে যাচ্ছে। তবু রক্ষে। চাল থাকলেই বাঙালির চলবে। চলবে নাকি? অবাঙালিদের এতোই বোকা পেয়েছ? তারা যুদ্ধ ক'রে ঢাকা শহর জয় ক'রে নিয়েছে না! বিজিত সম্প্রদায়ের সমুদয় মাল-মাত্তা, মায় আওরাতগুলি পর্যন্ত, বিজয়ী সম্প্রদায়ের জন্য সেরেফ হালাল তা নিয়ে তারা যা খুশি করতে পারে। চাউল পছন্দ নয়। ভালো কথা। ইচ্ছে হ'লে পুড়িয়ে দেবে। তোমাদের জন্য রেখে দেবে কেন শুনি!

কিন্তু এটা কি ধরনের কাণ্ড! সামরিক বাহিনীর প্রহরায় বাজার লুট হচ্ছে!

'কেন হবে না?' সন্ধ্যার পর উঠেছিল কথাটা, 'ইসলামের আইনে এ তো জায়েজ।'

বলেছিলেন আব্দুল ওদুদ সাহেব। ফিরোজের চাচাত ভাইয়ের এক শ্যালক। চাচার বাড়ি থেকে ফিরোজ অন্য এক চাচাত ভাইয়ের শ্যালকের বাসায় গিয়ে উঠেছিলেন। সন্ধ্যার পর সেই বাড়ির ছাদ থেকে সকলেই তাঁরা দেখেছিলেন, শান্তিনগর বাজার জ্বলছে। লুটপাট শেষ করতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। এবং লুণ্ঠন শেষ হওয়ার পরেও ছিল কয়েক শো মণ চাল ও বাঙালিদের ব্যবহার্য অন্যান্য জিনিসপত্র। সেগুলো নিয়ে অবাঙালিরা করবে কি? অতএব তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল তারা। এই সব লুটপাট ও আগুন সম্পর্কেই মন্তব্য করেছিলেন ওদুদ সাহেব। ফিরোজ প্রতিবাদ করেছিলেন—

'ওই শালাদের ইসলামে ওটা জায়েজ হ'তে পারে। ওই ইসলাম আমরা মানি নে।'

বস্তুতঃ ফিরোজ ও ওদুদ সাহেবের মধ্যে ও বিষয়ে বিরোধের অবকাশ প্রায় ছিলই না। অতএব কোন তর্ক ওঠেনি। এমনিই আলোচনা চলেছিল অনেকক্ষণ। কিন্তু সেটা সন্ধ্যার পরের ঘটনা।

বর্তমানের ঘটনা হচ্ছে, গাড়ির গতি মন্থর হ'তে দেখে একজন সৈনিক এগিয়ে এল তাঁদের পানে। এবং সৈনিকটিকে এগিয়ে আসতে দেখে ফিরোজের গাড়ি একেবারে থেমে গেল।

'কিয়া মাঙ্গতা?'

চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল সুদীপ্তর মাথায়। বিশুদ্ধ উর্দুতে প্রশ্ন

করলেন—এইখানে গুল আহমদ কিরমানি সাহেবের বাসাটা কোথায় বলতে পার?

স্বয়ং ফেরেশতারও সে কথা বলার সাধ্য ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানি সৈনিকের অসাধ্য কিছু থাকে নাকি! সে নির্দ্বিধায় ব'লে দিল—আগে বাঢ়হ্। এগিয়ে যাও, এগিয়ে গেলেই পাবে। ফিরোজ গাড়ি নিয়ে এগোলেন। কিছু দূর এগিয়ে ফিরোজের মনে হ'তে লাগল, তিনি যেন একটা ভূতুড়ে শহরের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে চলেছেন।

এইখানে একটা মসজিদ ছিল না? হাঁ, ঐ তো। ভূতুড়ে পোড়া বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে মসজিদটা। ঐ মসজিদে সারাক্ষণই মানুষ থাকত-ফিরোজ বরাবর দেখেছেন। সে একটা দেখার মতো জিনিস। হয় নামাজ চলছে, না হয় ওয়াজ, না হয় মিষ্টান্ন কিংবা গোশ্‌ত-রুটি বিতরণ। তা মানুষ কি পাঁচ দশ জন? পঞ্চাশ-ষাটের কম কোনো সময়ই নয়। এ না হ'লে দেশ গোল্লায় যাবে কি ক'রে-ফিরোজ ভাবতেন আর এতো যে মিষ্টান্ন-গোশ্‌ত-রুটি এদের কে দেয় সেও ছিল ফিরোজের কাছে এক পরম বিস্ময়। সুদীপ্ত এ সব জানতেন না। কেন না? এ পথে কখনো তাঁর আসার দরকার হয় নি। অতএব গোটা মসজিদ শূণ্য দেখে ফিরোজের মনে যে ভাবান্তর হ'ল সুদীপ্তর সেটা হয় নি। এবং সেই জন্যই বোধহয় হবে, সুদীপ্তর চোখে যা পড়ল ফিরোজ তা দেখেন নি। এমন কি মসজিদের বারান্দায় একটা কুকুরকে আমিনা যে শুয়ে থাকতে দেখলেন তাও ফিরোজের নজরে পড়ে নি। চকিতের মধ্যে কেবল এটুকু তিনি দেখলেন, গোলাগুলির ভয়ে লোকে মসজিদ ছেড়েছে। আমিনা দেখলেন, হায় হায়, যে মসজিদে মুসল্লি যায় সেখানে কুকুর! কিন্তু সুদীপ্তর দৃষ্টি গিয়েছিল ওপরে, মিনারের পানে—ওই যেখানে দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন আজান দিয়ে থাকেন। কিন্তু ওখানে একটা মৃতদেহ যেন। গাড়ি দ্রুত চলে গেল। বেশি কিছু দেখা গেল না আর।

তা হ'লে সুদীপ্ত ঠিকই দেখেছিলেন। ওরা গাড়ি থামিয়ে নেমে খোঁজ নিলে একটি মৃতদেহকেই সেখানে দেখতেন। মসজিদের মিনারে মুয়াজ্জিনের প্রাণহীন দেহ। মুয়াজ্জিন কি মিনারে উঠে রাইফেল তাক করেছিলেন শত্রুর পানে?

অবশ্যই রাইফেলের আওয়াজ ওই এলাকায় গত দু'দিনে বিস্তর শোনা গেছে। এবং একবারও আজান শোনা যায় নি। পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ ছাব্বিশে মার্চের ভোরে ফজরের আজান শোনে নি। কেউই শোনে নি? সকলের কথা ওঠে না। যারা ফজরের সময় ঘুমিয়ে থাকে তারা কোনোদিনই আজান শোনে না। কিন্তু ওই সময় ঘুমোয়নি যারা? তারা নামাজ না পড়লেও আজানটা শোনে। ওই দিন আর তা শোনে নি। একেবারেই শোনে নি বললে কিছুটা ভুল বলা হয়। পাড়ার পেনশন প্রাপ্ত সাবরেজিস্টার বৃদ্ধ আব্দুল আলিম সাহেব প্রতিদিনের মতোই শুনেছিলেন-আল্লাহু আকবার...। গোলাগুলির কর্কশ আওয়াজের মধ্যে সেই মোলায়েম 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি বৃদ্ধের নিকট ঠিক

রোজকার মতো সঙ্গীতময় মনে হয়েছিল কি? না ঠিক অন্য দিনের মতো নয়—সেদিনের 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি বৃদ্ধের কানে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের মধ্যে বেহেশতের আশ্বাসবাণীর মতো মনে হয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। 'আল্লাহু আকবার' আর দ্বিতীয়বার আলিম সাহেব শোনেননি। কিন্তু বিস্তর গুলিগোলার আওয়াজ শুনেছিলেন। পরহেজগার আলিম সাহেবের ভাষায় ওইগুলো ছিল শয়তানের গোঙানি—ওই শয়তানদেরকে মৃত্যুদশায় ধরেছে। তারি আলামত এই সব। কিন্তু শয়তানের গোঙানির কাছে আল্লাহ্‌র ডাক যে সয়লাব হয়ে গেল! সে থেকে আজ পর্যন্ত আর আজান পড়ে নি মসজিদে। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে বৃদ্ধ সকল প্রকারের রাজনীতিচর্চা বাদ দিয়ে কেবলই নামাজ কালাম নিয়ে ছিলেন। কিন্তু হায় হায়, এ কি হ'ল! জুমার নামাজের সময়ও কারফিউ উঠল না। হায় আল্লাহ, জীবনে এই প্রথম তাঁকে জুমার নামাজ বাদ দিতে হ'ল। নাসারা ইংরাজের অধীনে দীর্ঘকাল চাকরি করেছেন, কখনো নামাজে কোনো প্রকারের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি একদিনও। ওই বিধর্মিদের রাজত্বে কখনো যা হয়নি, আল্লাহ্, তাই হ'ল ইসলামী রাজ এই পাকিস্তানে। হিন্দুস্থান থেকে হিন্দুদের অত্যাচারে পালিয়ে এসেছেন এমন কিছু মুসলমানের সাথে তাঁর দোস্তি আছে। কিন্তু তাঁরাও কেউ কোনোদিন বলে না যে, সেখানে হিন্দুরা কোথাও মুসলমানদের জুমার নামাজ বন্ধ ক'রে দিয়েছে। হিন্দুস্থানের মুসলমানদের নসিবে যা ঘটেনি তাই ঘটল এই পাকওয়াতনে! আফসোস, ইয়া মাবুদ। সাতাশ তারিখে কারফিউ উঠে গেলে লোকে যখন আক্রান্ত এলাকা ছেড়ে দিক-বিদিকে নিরাপদ এলাকার সন্ধানে বেরিয়েছিল বৃদ্ধ আলিম সাহেব তখন বেরিয়েছিলেন মসজিদের পানে। মুয়াজ্জিন হঠাৎ আজান বন্ধ করেছিলেন কেন? কিছু ঘটেনি তো। মানে, কি আবার ঘটবে! তিনি তো আজানই দিচ্ছিলেন। আর কিছু তো করেননি। তবে?

মসজিদে ঢুকে আলিম সাহেব কেঁদে ফেলেছিলেন হাউ হাউ ক'রে। আল্লাহ্‌র ঘরের এই দশা! মসজিদের মেঝেতে রক্তের দাগ। অনেক রক্ত। এবং রক্ত এক জায়গায় নয়—সারা মসজিদ জুড়ে, নানা স্থানে। বিশেষ ক'রে থামের পাশে এবং কোণগুলোতে। মসজিদের মধ্যেও ওরা মানুষ হত্যা করেছে! আহা ওদের কি দোষ! মোয়াজ্জিন সাহেবই তো যতো গোলটা পাকালেন! আজান দিতে উঠে সকলকে জানিয়ে দিলেন, আমরা এখানে আছি। ওখানে তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় পনেরো-ষোল জন। যথারীতি এবাদত বন্দেগী চলছিল। শুক্রবারের রাত—এই রাতের ফজিলত বিস্তর। কেউ কোরআন পড়ছিলেন কেউ তসবিহ্ জপ করছিলেন, কেউ পড়ছিলেন নফল নামাজ। এমন সময় বোধহয় ইসরাফিলের শিঙ্গা বেজে উঠল। দুনিয়া ফানা হ'তে শুরু করল নাকি! বাতি নিবিয়ে দোর বন্ধ করে সকলে আল্লাহ্‌কে ডাকতে শুরু করলেন। আল্লাহ্‌কে ডাকতে ডাকতেই ভোর হ'ল। এখন ফজরের নামাজ। সকলে চাইল,

ঘরের মধ্যেই চুপি চুপি আজান দিয়ে নিঃশব্দে নামাজ সেরে নেওয়া যাক। কিন্তু মোয়াজ্জিন শুনলেন না। তিনি নিয়মমাফিক ওজু সেরে মিনারে উঠলেন। এখন আল্লাহ্‌র নামে ঘোষণা করবেন তিনি। আল্লাহ্‌র নামে সকল বালা-মসিবত দূর হবে। হবে নাকি! তোমরা যে আসলে সবাই ভণ্ড মুসলমান তা পাকিস্তানিরা জানেন না? গভর্ণর ফিরোজ খান নুন জানতেন, তোমাদের কারো খাত্‌না হয় না! অতএব সেই খান সাহেবের দেশবাসিগণ জানে তোমরা আদিতেই অমুসলমান থেকে গেছ। আয়ুব খান জানতেন, তোমরা সবাই হিন্দুদের গোলাম ছিলে, এখন আজাদ হওয়ার পরও সেই গোলামীর প্রবৃত্তি তোমাদের মধ্য থেকে যায় নি। অতএব তোমাদের মুখে আজানের ধ্বনি খাঁটি মুসলমানের মতো শোনায় না। পাকিস্তানি জওয়ানদের কানে সেই রাতের আজান কেমন শুনিয়েছিল? ভূতের কানে রাম নামের মতো! অন্ততঃ খুব-অসহ্য লেগেছিল তাতে সন্দেহ নেই? এবং অসহ্যকে সহ্য ক'রে নেবার উদারতা জওয়ানদের কাছে আশা কর নাকি! অতএব এখন দেখ, সারা মসজিদ জুড়ে রক্ত। সেই রক্তের লোভেই এসে থাকবে কুকুরটা। এসে ফিরে যাবার সময় কি মনে ক'রে মল ত্যাগ ক'রে গেছে। কিন্তু কোথায়? হায় হায়, ঐখানে দাঁড়িয়ে যে এমাম খুতবা পাঠ করেন! আলিম সাহেব শিশুর মতো কাঁদলেন খানিক। তারপর গেলেন মিনারে। মৃত মোয়াজ্জিনের রক্তে ভেজা লাশ—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। দেখলেন এবং চ'লে এলেন। মসজিদে কুকুর প্রবেশের দুঃখ ভুলে গেলেন। হাঁ, লাভ ওইটুকুই। একটা বেদনাকে তো চাপা দিতে পারে আর একটা বেদনাই।

ঠিক এই জন্যেই হবে, প্রেস ক্লাবের দেয়ালে যে প্রকাণ্ড গর্ত ছিল তা আর বিশেষ কিছু মনে হ'ল না তাদের কাছে। রাজারবাগ পুলিশের সদর দপ্তর দেখার পর ওটা আর আদৌ আকর্ষণীয় ছিল না। তবু ফিরোজ তাঁর গাড়ির গতি মন্থর ক'রে এক সময় প্রায় থেমেই গেলেন।

এখানেও কামান দাগতে হয়েছিল নাকি! কেন? এখানে তো ছাত্র ছিল না, পুলিশ ছিল না। তবে?

আবার যুক্তি চাও! এই জন্যই মরেছ তোমরা। যা দেখছ সব মেনে নাও, তবে পেছনে কোনো যুক্তি দেখতে চেয়ো না।

তাই তো। সতর্ক হলেন ফিরোজ। The Peole, সংবাদ, ইত্তেফাক-এ সব সংবাদপত্র অফিস যে একেবারে ধুলিসাৎ ক'রে দিয়েছে তার হয়ত কোনো কারণ থাকতেও পারে। কিন্তু প্রেস-ক্লাব থেকে কোনো পত্রিকা বেরোত নাকি! তা-না বেরুলেও সাংবাদিক তো বেরুত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁচা ছেলেগুলো ওইখানে ঢুকে আড্ডা দিতে দিতে সব এঁচড়ে পাকা হয়ে যেত না! অতএব এটাকে মূল সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দাও। দেশের মধ্যে ঝানু বদমাইশের দল হচ্ছে—শিক্ষক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। নচ্ছারগুলো কেবলি দেশপ্রেম

দেখানোতে ব্যস্ত হয়ে উঠে। কেন? তা হ'লে এসো বাছাধনরা, দেশপ্রেমের পরীক্ষা দাও। কে কত মরতে পার দেখি। কতো শিক্ষক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ঢাকা শহরে মরেছেন?

হিসেবটা দিতে পারতেন সাংবাদিকরাই। সেই জন্যই তো সাংবাদিকদের উপর এতো রাগ। দেখলে না, যতো বিদেশী সাংবাদিক ঢাকায় ছিলেন সকলকে ঝেঁটিয়ে বের ক'রে দিয়ে তারপর ওরা শুরু করেছে ধ্বংসযজ্ঞ। কিন্তু ঝাঁট দেবার সময়ও কিছু তো এড়িয়ে যায়। দু-একজন সাংবাদিকও যদি এড়িয়ে গিয়ে থেকে থাকেন! আল্লাহ্, বিদেশের অন্ততঃ একজন সাংবাদিক যেন থাকেন, শহরে। তাতে লাভ? কিচ্ছু লাভ নেই। বাইরের লোক একটু শুধু জানবে। কিভাবে আমরা সবাই মরলাম সেইটুকু শুধু জানবে সকলে।

শুধু সকলকে জানানোর জন্যই মাঝে মাঝে ছবি নিতে ইচ্ছে করছে ফিরোজের। এই স্থান ও কাল থেকে কিছু দূরে যাঁরা আছেন, বা থাকবেন তাঁদের জন্য এর কিছু ছবি তো নিয়ে রাখতেই হয়। তা নইলে তারা আমাকে ক্ষমা করবেন কেন? ইতিহাস তথ্যপঞ্জী দেবে। কিন্তু কিছু দেখতে পারবে তো। দেখাতে জানে সাহিত্য এবং ছবিও। ফিরোজ তো ছবি আঁকতে জানেন না? অতএব বৃষ্টির ধারাজলের তৃষ্ণা কলের জলেই মেটানো যেতে পারে। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে রাখা যেতে পারে। কিন্তু মেয়েদের যে প্রবল আপত্তি।

'ভাই, চারপাশে দেখেছেন না, একটা জনপ্রাণী নেই। গাড়ি থামাবেন না।'

'তুমি আমাদের সকলকে মারবে। সবখানে গোঁয়ারতুমি চলে নাকি! তুমি হলফ্ ক'রে বলতে পার, এইখানে কোথাও আর্মি লুকিয়ে নেই।'

তা থাকতে পারে। মীনাক্ষীর যুক্তি ফেলে দেওয়া যায় না। ফিরোজ আর নামলেন না গাড়ি থেকে। তবে গন্তব্যস্থলে পৌছানোর সোজা পথও ধরলেন না। গন্তব্যস্থল তাঁর কোন্‌টা? হাঁ, পুরোনো ঢাকাই বটে। এবং আমিনাও জানিয়ে দিয়েছেন, তিনিও পুরানো ঢাকাতেই যাবেন। স্বামী-সন্তান নিয়ে আপাততঃ খালার বাড়িতে উঠবেন। রাস্তার নাম ও বাড়ির নম্বর শুনে ফিরোজ বুঝলেন আমিনারা যেখানে যেতে চাইছেন সেটা অন্য রাস্তায় হ'লেও তাঁর গন্তব্যস্থল থেকে সামান্যই দূরে। গাড়িতে দু তিন মিনিটের বেশি লাগবে না। অতএব হাতে যেটুকু সময় আছে এই রাস্তাটা দিয়ে একটু ঘুরে যাওয়া যাক। অবশ্যই স্বাভাবিক অবস্থায় এই ইচ্ছেটা ফিরোজের মনে জাগত না। সুদীপ্তও বাধা দিতেন। হাঁ বটে, কারফিউ আরম্ভ হ'তে এখনো দেরি আছে। এবং দুষ্কর্ম তারা যা শুরু করবে সেই কারফিউ শুরু হ'লে পর। যেন কোনো দিক দিয়ে কেউ পালাতে না পারে। তা হ'লেও ঘরের বাইরে এখন যত কম থাকা যায় ততই ভালো। অতএব সোজা পথ ধ'রে কোনো-একটা ঘরে পৌছানোই তো বুদ্ধিমানের কর্ম। সুদীপ্তও সেই কথা বলতেন। কিন্তু এখন কিছুই বললেন না। তাঁদের সকলকেই কেমন একটা নিশীতে পেয়েছে যেন! নিশী-পাওয়া ব্যক্তির

মতো ফিরোজ গাড়ি চালিয়ে চললেন, এবং অন্যেরা দেখতে দেখতে চললেন।

জনমানবহীন রাস্তার দু পাশে মাঝে মাঝে গুলিবিধ্বস্ত বাড়ি, মানুষের লাশ, পুড়িয়ে-দেওয়া জনপদের চিহ্ন-কয়েকটা দেখলেই আর কোনো বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। ধ্বংসের কোন বৈচিত্র্য থাকে? বৈচিত্র্য সৃষ্টির মধ্যে কিন্তু এই বৈচিত্র্য-হীন ধ্বংসলিলা দেখে বেড়ানোর মধ্যে কী একটা নেশা আছে যেন।

সারি সারি স্বল্পমূলধনের দোকান—নিম্ন মধ্যবিত্তেরা কোনোমতে টিন দিয়ে বানিয়ে ব্যবসা ক'রে খাচ্ছিল। সব ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে।...একটা দেয়াল ঘেরা বাড়ির বিপুল আঙিনায় পোড়া মোটর গাড়ি দেখা গেল অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশখানা। ভিতরে একটা গাড়ি মেরামতের কারখানা ছিল। একজন রিক্সাচালকসহ রিক্সাটা পথের পাশে কাত হয়ে প'ড়ে আছে। দেখেই বুঝা যায়, রিক্সা নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় পাশ থেকে গুলি করেছে। তার শিথিল মুঠিতে রিক্সার হ্যাণ্ডেল তখনও লেগে ছিল।....আহ্, ওই দেখ দেখ, গাছের ডালে কিশোর বালকের লাশ ঝুলছে ঘন ঝাঁকড়া গাছ দেখে সেখানে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছিল বালকটি। কিন্তু ঝাঁকড়া গাছ দেখলেই সেখানে এলো-পাথাড়ি গুলি করেছে ওরা। সেই গুলিতে সে মারা গেছে। কিন্তু ঘন ডালের ফাঁকে শরীর আটকে গিয়ে মাথাটা নিচের দিকে ঝুলছে।...এখানে এটা? একটা স্কুল ছিল। আর ওখানে ওইটে দৈনিক পত্রিকার অফিস ছিল। ছিল কিন্তু নেই। আর্মি ধ্বংস ক'রে দিয়েছে। কিন্তু ধ্বংস মানে যে, এতোখানি তা এখানে না এলে বিশ্বাস করা শক্ত হ'ত। দরজা জানলা থেকে শুরু ক'রে প্রত্যেকটি মেশিন, কাগজপত্র সব গ'লে পুড়ে একাকার হয়ে গেছে—শ্মশানের কঙ্কালের মতো উলঙ্গ দেয়াল কোনোমতে দাঁড়িয়ে।...এবং এমনি সব দৃশ্যাবলির অপূর্ব মিউজিয়াম সমগ্র ঢাকা নগরী।

পুরোনো ঢাকার এইখানে, হা এইটেই তো-এই তো তাঁর খালার বাড়ি কতো এসেছেন। তবু যেন আমিনা বাড়িটাকে চিনতে পারছেন না। কি ক'রেই বা চিনবেন? কখনো তো লোহার গেট এমন ক'রে বন্ধ দেখেন নি। লোহার গেটে বিরাট তালা ঝুলছে। কোথায় গেছেন তাঁর খালা-আম্মা! কিংবা তাঁর খালাত ভাইয়েরা? স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে আমিনা যেন অকুল সমুদ্রে পড়লেন। আর তো সময়ও বেশি নেই। বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই কারফিউ শুরু হয়ে

যাচ্ছে। ফিরোজকে ছেড়ে দিয়ে কি ভুলটা যে হয়ে গেল! এবং সে জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমিনা। এখানে সঙ্কীর্ণ গলিতে গাড়ি ঢোকালে বেরুতে অসুবিধা হ'তে পারে বিবেচনা ক'রে বড়ো রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এটুকু পথ, পথ সামান্যই, ফিরোজ তাঁদের এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।—

'চলুন ভাবী, আপনাদের পৌছে দিই।'

'না ভাই, কিচ্ছু দরকার নেই। এটুকু আমরা দিব্বি পৌছে যেতে পারব। পারলে কাল সকালে একবার খোঁজ নেবেন।'

সুদীপ্তদের বড়ো সুটকেশটা হাতে নিয়ে ফিরোজ তাঁদের সাথে পা বাড়িয়েছিলেন। মীনাক্ষীও বেরিয়ে এসেছিলেন গাড়ি থেকে। বেশ তো, ওঁদের একটু পথ হেঁটে গিয়ে আমরা একেবারে তাঁদের পৌছে দিয়ে আসি।

কিন্তু আমিনা এ ব্যবস্থায় কিছুতেই রাজি হলেন না।—

এই তো সামান্য দু পা গিয়ে সাত নম্বর বাড়ি। অকারণে আর কষ্ট করতে দেব না আপনাদের। সুটকেশটা আপনি ওকে দিন।'

ব'লেই অবলিলাক্রমে একটা ব্যাগ তিনি কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন, এবং অন্যটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে এলাকে ধ'রে পথ চলা শুরু করলেন। অতঃপর স্ত্রীকে অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর কি? তাঁর একটা হাত বেলা ধ'রেই ছিল, অন্য হাতে ফিরোজের কাছ থেকে সুটকেশটা তিনি নিয়ে নিলেন। এবং খুব একটা মলিন হাসি হেসে বিদায় নিলেন বন্ধুর কাছ থেকে। আমিনা ব'লে দিলেন—

'কাল কিন্তু ভাবীকে নিয়ে আসবেন। এই সামনের সাত নম্বর বাড়ি।'
'আসব।'

হয়ত ফিরোজ আসবেন। কিন্তু সে তো সেই আগামী কাল নটার আগে নয়। তাঁরা এমনি বেকুবের মতো কাজ করেছেন যে, ফিরোজের বাড়ির নম্বরটাও নেন নি। তালা-ঝুলানো লোহার গেটের সামনে স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে আমিনা তখন কি ভাবছিলেন?

না, কিছুই ভাবেন নি। অত ভেবে কাজ করা মেয়েদের অভ্যাস নয়। তিনি সোজাসুজি স্বামীকে বললেন।

'এখন কি করবে কর। আমি তো আর ভাবতে পারছি নে।'

কেন পারবে না শুনি! সেই দুপুর থেকেই তো খালার বাড়ি খালার বাড়ি করছিলে। ঠেলাটা সামলাও এবার। কিন্তু ঠেলাই যদি সামলাবেন তা হ'লে আর স্ত্রীলোক হতে গেলেন কেন? এতোক্ষণ তো বেশ প্রবল পরাক্রম দেখানো হচ্ছিল? এখন যে বেকায়দায় পড়েছেন, অমনি অবলা সেজে বসলেন—কি করবে কর, আমি তো আর পারি নে। হাঁ, আমরা সব পারি। পুরুষ যখন হয়েছি। তোমরা দয়া ক'রে কেবলি তালগোল পাকাবে, আর আমরা খুলব। সেই জন্যই তো আছি আমরা।

সুদীপ্ত পাশের বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লেন। বেশ কয়েকবার জোরে জোরে কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে একটা নারীকণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল—

'কে? কাকে চান?'

আপনাদের সাথে আমরা একটু কথা বলতে চাই, আমরা বিপদে পড়েছি। একটু খুলবেন?'

'আপনারা কারা? বাড়িতে কোন পুরুষ নেই!'

'তা হ'লে আপনার কাছেই না হয় দুটো কথা শুধিয়ে নিতাম। একটু যদি খুলতেন!'

'আপনি কেমন ধারা ভদ্দর লোক! বলছি বাড়িতে পুরুষ নেই।'

তাও কপাট খুলতে বলেন! তাও আবার এই কারফিউ আওয়ারে!'

'না, না দেখুন...মানে আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী আছেন'। আমিনার দিকে তাকিয়ে'—এই যে, 'তুমি একটু কথা বল না।'

খুব আস্তে বিড় বিড় ক'রে আমিনা বললেন—

'আমি কি বলব! তোমারই বুদ্ধির দৌড় একটু দেখা যাক।'

কিন্তু স্বামীকে এ কথা তিনি শোনালেও বুঝতে তাঁর কোনোই অসুবিধা ছিল না যে, এই অবস্থায় তাঁর এখন এগোনো কর্তব্য। সত্যিই তো, কারফিউ আওয়ারে কোন স্ত্রীলোক কোনো পুরুষকে বাড়ির দরজা খুলে দেবে এটা ভাবা যায়? কথাটা শুনতে তো কেমন। আমিনা একটু এগিয়ে বললেন—

'আমরা ভাই হঠাৎ বড়ো বিপদে প'ড়ে গেছি। একটু যদি খুলতেন।'

একটু খানিই খুলল-কপাট নয় জানলা! জানলার ফাঁক দিয়ে মহিলা আমিনার সাথে কয়েকটি কথা বললেন। আমিনা তাঁর খালার কথা শুধালেন। পাশের বাড়িতে থাকতেন। অতএব কোথায় গেছেন সেটা যদি জানা যেত! কিন্তু জানা গেলেই বা কি লাভ!

'তাঁরা তো ভাই বুড়ি গঙ্গার ওপারে সেই জিঞ্জিরায় চ'লে গেছেন।'

'কালই গেছে নাকি?'

'না, কাল যেতে পারেন নি। আজ সকালে গেলেন। আমরা কত মানা করলাম। সবাই মিলে আসুন, এক সাথে থাকি। কপালে যা আছে তার তো আর রদ হবে না। কিন্তু কে শোনে ভাই।'

আমরা তা হলে কি মুশকিলে পড়লাম বলুন তো! এখন তো আর ফিরতেও পারিনে। বাসা থেকে বেরিয়ে কি ভুলটাই করলাম!'

'কোথায় বাসা ছিল আপনাদের?'

'আর বলবেন না ভাই। নীলক্ষেতে থাকতাম আমরা। উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।'

'কে রে বুলা?' বলতে বলতে একজন প্রৌঢ়া এসে দাঁড়িয়েছিলেন ঘরের

মধ্যে। বুলা মুখের কাছে আঙুল এনে সঙ্কেতে আমিনাকে চুপ থাকতে বললেন। এবং প্রৌঢ়াকে যা বলার তা নিজেই বললেন। খুব চাপা স্বর। কিছু তার শোনা গেল, কিছু গেল না। অবশেষে বুলা নামক মেয়েটি তাঁদেরকে একটু অপেক্ষা করতে ব'লে প্রৌঢ়াকে নিয়ে ভেতরে চ'লে গেলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন। বুলা নিজেই কপাট খুলে তাঁদেরকে ভেতরে নিয়ে বসালেন। ঘরে একখানা টেবিল, এবং কয়েকখানা কাঠের চেয়ার ছিল। সেখানে তাঁদের বসতে দিয়ে তিনি বললেন—

'একটা কথা। কেউ এসে কড়া নাড়লে খুলে দেবেন না! কিংবা কোন প্রকারের সাড়া দেবেন না যেন।'

আমিনা শুধু সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। বুলা আবার যথারীতি ঘরে খিল তুলে দিয়ে ভেতরে চ'লে গেলেন। হাঁ, মাত্র এইটুকুর জন্যই এখন খোদার কাছে মনে মনে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন সুদীপ্ত। আমিনা কিন্তু খোদার অবিচারকে স্মরণ করলেন। এতো বিপদের পরও ভাগ্যের এই পরিহাস। কাল কতো ক'রে বললাম, চল খালার ওখানে যাই। কাল এলে তো এই বিপদটা হ'ত না। দিব্যি খালাদের সাথে ওপারে জিঞ্জিরায় চ'লে যেতাম! কেমন নিরাপদে থাকতাম! কিন্তু নিরাপদ আশ্রয় খোদা আমার কপালে লেখেনি। এখন কি সারারাত এখানে ছেলে-মেয়ে নিয়ে ব'সে কাটাতে হবে?

ইতিমধ্যেই বেলা তার আব্বার কাছে আবেদন জানিয়েছে—

'আব্বু কি খাব?'

সত্যিই তো, কি খাওয়ানো যায় ছেলেমেয়েদের! সঙ্গে বিস্কুট ও গুঁড়ো দুধের টিন আছে। কিন্তু পানি? বাংলাদেশে পানি চাইলে অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু সে চাওয়ার ভার তো আমিনাকে দিতে হয়। আমিনাকে বলবে নাকি ভেতরে থেকে একটু পানি চেয়ে আনতে! না, সে সাহস সুদীপ্তর হ'ল না। নিজের জন্য চাইলে আমিনা কিছু বলবে না। চেষ্টা ক'রে হয়ত জোগাড় ক'রে এনে দেবে! কিন্তু মেয়ের দরকারে উঠতে বললে দেবে ধমক। মেয়েকে এ দুঃসময়ে ধমক খেতে দেওয়ার চেয়ে একটু সোহাগ দেওয়া উত্তম বৈকি। সুদীপ্ত মেয়েকে সোহাগ দিয়ে ভোলাতে চাইলেন—

'একটু কষ্ট ক'রে থাক মা মণি। একটু খানি।'

মায়ের কাছে একটা চেয়ারে ব'সে ছিল অনন্ত। ছেলে মানুষ হ'লেও এখন কিছু একটা বলা উচিত ব'লে তার মনে হ'ল—

'ছী ছোট আপা, যেখানে সেখানে খেতে হয় না। আমরা তো খাচ্ছি নে। তোমার বড়ো আপা খাচ্ছে না।'

ছোট বোনকে অনন্তর সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিটা অন্য সময় হ'লে হাসি জাগত—একটু কৌতুকের সঙ্গে মা-বাবা উভয়ে সেটা উপভোগ করতেন। কিন্তু এখন? উভয়েরই মনের গভীরে কোনো জমাট তুষার যেন গলতে শুরু

করেছিল। এবং তা অশ্রু হয়ে বেরোতে চাইলে উভয়েই ছেলেমেয়েদের সামনে প্রখর সতর্কতায় তাকে গোপন করলেন।

অনন্ত তার মায়ের কাছে, আব্বার কাছে বেলা। মাঝখানে বেচারা এলাটা কারো সঙ্গ পায় না সে একবার তার মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, একবার বাপের কাছে। বাপের কাছে এলা শুধায়—

'এখানে কেন এলে আব্বু! নানীরা কই?'

নানী অর্থাৎ আমিনার খালার বাড়ি ইতিপূর্বে একাধিকবার এলা এসেছে। এলা তাই চেনে বাড়িটা। সে বাড়ি বন্ধ থাকলে চল ফিরে যাই। তা না, এখানে কেন?

সুদীপ্ত এক হাতে কোলের বেলাকে জড়িয়ে ছিল। আর-এক হাতে এলাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—

'তোমার নানীরা একটু বাইরে গেছেন আম্মু। ফিরে এলেই আমরা তোমার নানীদের বাড়ি যাব, কেমন?'

সেটা ছোট্ট একখানি বাইরের বসার ঘর। পুব-দক্ষিণ দু'দিকে দুটি জানলা, এবং দুটি দরজা। পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে অন্দরমহলে যাওয়া যায়, পুব দিকেরটা রাস্তায় বেরুবার। উত্তর দেয়াল-সংলগ্ন একটি টেবিল এবং খান চারেক কাঠের চেয়ার। তাতেই ঘরের অর্ধেক জায়গা জুড়ে ফেলেছে। এই ঘরে তাঁদের রাত্রিবাস করতে হবে? হয়ত হবে। নিশ্চয়ই হবে। সেজন্য মনে শঙ্কা লাগছে নাকি! এর চেয়েও ছোট ঘরে মানুষ বাস করে না? তবে ইতিমধ্যেই তাঁরা যে ঘেমে উঠেছেন। মার্চের শেষ সপ্তাহের গরম, তদুপরি সারা দুপুর প্রায় পথে পথে কেটেছে। ছেলেমেয়েদের মুখগুলো কেমন শুকনো আর করুণ দেখাচ্ছে। সুদীপ্তর বুকের মধ্যে একটি 'আহা' ধ্বনির হাহাকার খেলে গেল। কি যে ভয়াবহ রাত্রি সামনে আসছে! আল্লাহ্‌কে ডাকলেন সুদীপ্ত। কিন্তু আমিনা তখনো ভাবছেন, কাল যদি আসতাম! কথা তো শুনবেন না। বন্ধুর বাড়ি যাবেন। কেমন দিব্বি আজ ঢাকার বাইরে গ্রামের খোলা-মেলা জায়গায় ছেলেমেয়ারা ঘুরে বেড়াত। খালা কি তাকে ফেলে যেতে পারতেন!

আমিনার ধারণায়, জিঞ্জিরাতে গিয়ে খালারা বেঁচে গেছেন। এবং পরম সুখে আছেন। সুখে ছিলেন। কিন্তু ওই একটা দিন। পরদিনই সেখানে পাকিস্তানিরা তাদের কারবার শুরু করেছিল। সেটা তাঁদের নীলক্ষেতের চেয়ে কম কিছু ছিল না। কিন্তু তাতে এখন কি। ভবিষ্যতকে তো মানুষ দেখতে পায় না। পেত যদি? অন্ততঃ আমিনা যদি সেই ভবিষ্যতের কিঞ্চিৎ কল্পনাও করতে পারতেন তা হ'লেও এতোবার জিঞ্জিরার কথা এখন স্মরণ করতেন না। একদিন তো আমিনাকে স্মরণ করতে হয়েছিল– জিঞ্জিরাতে যাওয়া হয়নি যে, সেটা আল্লাহ্‌র অপার কৃপা। আল্লাহ্‌র কৃপাতেই তাঁরা বেঁচেছেন। তাঁর খালারা কেউ বাঁচেন নি। সারা জিঞ্জিরা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শ্মশান হয়ে গিয়েছিল।

এক ঘন্টা পর প্রায় পাঁচটার দিকে সেই বুলা নামে মহিলাটি আবার এসেছিলেন।

'চারটে থেকে কারফিউ শুরু হয়ে গেছে এ অবস্থায় আপনাদেরকে যেতে বলতেও পারি নে। আবার থাকবেন যে তারও অসুবিধা বিস্তর।

সুদীপ্ত বললেন—

'আমাদের অসুবিধা কি বলছেন! আপনাদের যে অসুবিধা সৃষ্টি করেছি সেইটেই ভাবতে লজ্জা পাচ্ছি।'

'কিন্তু কি আর করবেন! ইচ্ছে ক'রে তো আর করেন নি। তবে কথা কি জানেন, আমরা কেউ এখন নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর চলছিনে। অবস্থা আমাদের চালাচ্ছে।'

বাহ্ ভদ্র মহিলা কথাটা ভারি সুন্দর বলেছেনতো! নিঃসন্দেহে খুব বুদ্ধিমতী মহিলা। বাঁচা গেল। সুদীপ্ত মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মহিলার যে বুদ্ধি আছে এটা তাদের অনুকূলে না গিয়েই পারে না। বিপক্ষে গেলে? এতোক্ষণ এখানে প্রবেশাধিকারই মিলত না।

আমিনা তাঁদের আলোচনায় যোগ না দিয়ে কাজের কথা তুললেন—

'বোন, একটু গরম পানি দিতে পারেন। শুধু খানিকটা গরম পানি। সামান্য গরম হ'লেই চলবে।'

'কেন?'

'বাচ্চাদের একটু দুধ খাওয়াতাম।'

'তা হ'লে পারি নে।'

আমিনা একটু বোকা ব'নে গেলেন। এবং সুদীপ্তও। এখানে কি যে তাঁরা বলবেন, পুনর্বার গরম জলের অনুরোধ শোভনীয় হবে কি না, কেননা ওটা যে না হ'লেই নয়, বাচ্চাদের তো খাওয়াতেই হবে—তাঁরা ভাবছিলেন। এমন সময় বুলা বেরিয়ে গেলেন। আমিনা স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। সুদীপ্তও তাকিয়েছিলেন স্ত্রীর মুখের দিকে। দু'জনেই দু'জনকে নীরবে প্রশ্ন করলেন—ব্যাপরটা কি হ'ল?

ব্যাপার কিছুই হয়নি। আধ ঘন্টা পর বুলা একটা বড়ো কেত্‌লিতে দুধ আর রেকাবীতে ডজনখানেক বিস্কুট নিয়ে এলেন।—

'এ সবের মধ্যে কিছু আবার আবিষ্কার করতে যাবেন না যেন। ছোট ছেলেদের যেমন কোনো জাত নেই, তেমনি তাদের বিশেষ কোনো ঘরও নেই। ক্ষিধে পেলেই তাদের খাবার অধিকার আছে। তা সে যে ঘরেই হোক।'

'ক্ষিধের সময় ও থিওরিতে আমরাও বিশ্বাসী'– আমিনা বললেন।

'সেই জন্যই আপনাদেরকে মেরে ফেলা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই সব কথা আপনারা দেশের যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। দেশের সর্বনাশ ডেকে আনছেন আপনারা।'

এবার সুদীপ্ত বললেন—

'কিন্তু আপনি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকেও কথা কম জানেন না দেখছি।'

'আপনাদের কাছেই শেখা। বিশ্ববিদ্যালয়ে এককালে পড়েছি তো।'

এককালে? মানে, কোন্ কালে? কোন্ সাবজেক্টে? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি?– প্রশ্ন সুদীপ্তর মনে একরাশ থাকলেও কোনোটাই তিনি তুললেন না। কোনোটারই উত্তর চাইলেন না। তিনি চুপচাপ দেখে গেলেন—বুলা ও আমিনা আলাপ করতে করতে বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছেন।

'যতোটা পার, শুধু দুধ খেয়ে থাকতে হবে বাছারা! তোমাদের খালার ঘরে আর কিছু নেই।'

'ভাত?—এলা প্রশ্ন ক'রে বসল।

প্রবল দুঃখের মধ্যেও একটু হাসতে হ'ল সকলকে। এবং সুদীপ্ত শুধুই একটু হাসলেন। আমিনা বললেন—

'দেখলেন, ইংরেজির অধ্যাপকের মেয়ে হ'লে হবেকি! একেবারে খাঁটি বাঙালি। খালা হ'তে চান, ডাল ভাত খাওয়ান।

বুলা এই সময় মুখের কাছে আঙুল এনে যেন আমিনাকে সাবধান ক'রে দিলেন।—

'দিদি আস্তে। কথা যেন বাইরে শোনা না যায়।'

সুদীপ্ত যেন অনেক দূরে থেকে মহিলা দু'জনকে দেখছিলেন। শাশ্বত বঙ্গজননী। একজন খাওয়াচ্ছেন এলাকে, একজন বেলাকে। অনন্ত নিজেই খাচ্ছে। কিন্তু বসেছে বুলার কাছে। বুলাই তাকে কাছে বসিয়েছেন।

নাহ্, বাঙালি মরবে না। এতো প্রীতি মমতার মৃত্যু হয় না।

কিন্তু শুধুই তুমি প্রীতি-মমতা দেখলে? ঈর্ষা-কলহ দেখনি? আর প্রকাণ্ড পরশ্রীকাতরতা?

হাঁ, তাও তো ঠিক ঈর্ষা-কলহ– বিশেষ ক'রে পরশ্রীকাতরতা এবং ক্ষুদ্রতা- ---সুদীপ্তকে কে যেন কানে ধ'রে কেবলি বাঙালি-চরিত্রের দীনতা ও তুচ্ছতাগুলিকে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াল অনেকক্ষণ! ততক্ষণে বুলা চ'লে গেছেন। কিন্তু অতীতের দীনতাসঙ্কুল ঈর্ষাকুটিল গলিপথ পরিক্রমণ যেন সুদীপ্তর ফুরোচ্ছে না।

কিন্তু তিনি কি বুলার প্রতি অবিচার করছেন না! বুলাকে কেন্দ্র ক'রে তোমার মনে একই ধরনের চিন্তার উদয় হওয়া অন্যায় সুদীপ্ত। খুবই অন্যায়। অন্যায় বৈ কি। গতকাল থেকে বাঙালি বাঙালিকে কম সাহায্য করেছে! ফিরোজের চাচারা সংখ্যায় ক'জন? বোধ হয়, শতকরা একজন হ'তে পারে। এবং তাঁরা হয়ত দুর্ভাগ্যক্রমে ওই একের কবলেই পড়েছিলেন। তার জন্য সমগ্র জাতিকে অপবাদ সইতে হবে?

এক মীরজাফরের জন্য সমগ্র বাঙালীকে যুগে যুগে অপবাদ সইতে হচ্ছে না?

ননসেন্স। মীরজাফর আবার বাঙালি কবে ছিলেন? ওই যে মীরপুর-মোহাম্মদপুরে অবাঙালিরা আছে না! ওরা তো প্রায় পাইকারী হারে আজ পশ্চিম

পাকিস্তানের সাথে হাত মিলিয়ে বাংলার দুর্দশা ঘটাচ্ছে। সেজন্য ইতিহাসের কাঠগড়ায় আসামী হ'তে হবে বাঙালি জাতিকে? না, তা হবে কেন। এবং এও ঠিক যে, ওই জন্য সকল অবাঙালিকেই বেঈমান বিশ্বাস-ঘাতক বলারও কোনো যুক্তি নেই। তাঁর মাও তো অবাঙালি ছিলেন। আহ্, ভারত ছেড়ে আসার ছমাসের মধ্যেই তিনি জান্নাতবাসিনী হলেন। ঐ শোকটা সুদীপ্তর ভুলতে অনেক সময় লেগেছিল। সুফিয়ার শোক ভুলতে না পেরে মা সব সময় কেমন যেন হয়ে থাকতেন। সেই শোকেই তো মারা পড়লেন এত তাড়াতাড়ি। বড়ো ভাই বদলি হয়ে গেছেন রাজশাহীতে। সেখানে কেমন আছেন কে জানে। এখনো তো কোনো খারাপ খবর পাওয়া যায়নি। তবে সবচেয়ে নিরাপদে আছে ছোট ভাই প্রদীপ্ত হাসান। প্রদীপ্ত ভারত থেকে আসেনি। ভালো করেছে। অথচ এই ক-দিন আগেও নক্সাল-পন্থীদের খবরে সুদীপ্তর মনে হয়েছিল, প্রদীপ্ত এখানে চলে এলে ওই সব হাঙ্গামা থেকে বাঁচত। কি জানি কখন কি দুর্বিপাকে পড়তে হয়। হিংসার রাজনীতিতে ভারত এখন কলুষিত। এখন ওখান থেকে স'রে আসাই তো ভালো। কিন্তু কেন যে প্রদীপ্তটা আসে না? সুদীপ্ত ভাবতেন। ভাবতেন সামান্য ক'দিন আগেও। কিন্তু এখন? সুদীপ্তর আজ মনে হচ্ছে, নক্সালপন্থীরা পাকিস্তানিদের তুলনায় ফেরেশ্‌তা।

বুলা যাওয়ার সময় পূর্ব দিকের জানালাটিও বন্ধ ক'রে দিয়ে গেছেন। অযৌক্তিক কিছু করেন নি। পথের দিকের জানলা খুলে রাখা যায় না। এখন একটি কেবল দক্ষিণের জানালা খোলা। তাতে বাতাসের সমাগম বিশেষ হচ্ছে না। ঘরে সুতীব্র গরম। ছেলেমেয়েদের গরম সহ্য করার অভ্যাস নেই। তারা কষ্ট পাচ্ছে খুব। কিন্তু সেই পরিমাণে জ্বালাচ্ছে না। ছেলেরাও যেন এক রকম ক'রে টের পেয়ে গেছে, এ অবস্থায় কান্নার ফলে ঘোরতর বিপদ হ'তে পারে।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ঠাঁই ব'সে থাকতে থাকতেই এল সন্ধ্যা। তাতে অবস্থার পরিবর্তন কেবল এইটুকু হ'ল যে ঘরের স্বল্পশক্তিসম্পন্ন বিজলি বাতির আলো আরো স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হ'ল। দিনের ভীরুতা কেটে সে যেন রজনীর স্বচ্ছন্দচারিণী নায়িকা হয়ে উঠল। দেয়ালের একটি কালো দাগে দু'চোখ নিবদ্ধ ক'রে সুদীপ্ত সেটাকে একটা বাঘের মুখবায়ব দান করতে চেষ্টা করলেন। দুরন্ত বাঘের প্রবল প্রাণকে আর বিপুল অরণ্যকে সেই মুহূর্তে মনে মনে তিনি প্রার্থনা করছিলেন। কিন্তু আমিনার অসুবিধা হচ্ছিল চরম। নিভৃত আত্মসংলাপ, ধ্যান কল্পনা-এ সবের কোনটাতেই অভ্যস্ত নন তিনি। কাজে ও কথায় সময় কাটানো তাঁর অভ্যাস। আর অভ্যাস আছে সামান্য তাস খেলার। এমনি ক'রে বসে থাকা, স্বামীর সম্মুখে হ'লেও, তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কর্ম। বুলাও যে আসে না ছাই। তিনি কি ভেতরে যেতে পারেন না! কিন্তু বুলা ডাকলেন না যে। শুধু ডাকলেন না তাই নয়, যাবার সময় মেয়ে ব'লে গেলেন-

'আচ্ছা দিদি, আপনারা এখন বসুন। আমি খানিক পরে আসছি।'

এরপর এমনি ব'সে না থেকে উপায়? ব'সেই আছেন তারা। কিন্তু ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যেই অবস্থাটাকে যেন সহজ ক'রে নিয়েছে। আর পকেট থেকে রুমাল নিয়ে তিনজনে কী-একটা খেলা শুরু ক'রে দিয়েছে তারা।

কিন্তু বুলার ব্যাপারটা কি? এমনি ক'রে বসিয়ে রাখবে নাকি! বাড়িতে এক জায়গা না দাও সেটা বুঝি। জায়গা দেবার পর এমনি ঠাঁই বসিয়ে রাখাটা কি ধরনের কাণ্ড! রসিকতা?

হাঁ রসিকতাই। তবু রসিকতাও নয়। এখন কি রসিকতার সময়? অন্য সময় হ'লে রসিকতা করা যেত। পাশের বাড়ির মাসিমার জামাইকে শ্রীমতী বুলা কি ছেড়ে কথা কইতেন? ভগিনীপতি হওয়ার ঠেলা টের পাইয়ে দিতেন পদে পদে। জমিলা খালাকে বুলাও তো খালা ডাকেন। অতএব আমিনা তো সম্পর্কে দিদিই হবেন। অতএব সুদীপ্ত! বুলার রাজ্যে তোমার দশাটা কি হ'তে পারত ভেবে দেখ। কিন্তু সেই দশা সৃষ্টির সময় বুলার কোথায়?

দু দণ্ড কথা বলার সময়ও বুলার ছিল না। দেশের এই দুঃসময়ে এখন কি একটি মুহূর্তও বাজে কাজে ব্যয় করার সময় আছে? অবশ্যই সময় ও কথার বাজে খরচকে পুরোমাত্রায় পাপ মনে করার মতো পিউরিটান বুলা নন। মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদে দীক্ষা নেয়ার পরও এখনও তাই গল্প-কবিতার বই পড়ার এবং আড্ডা দেওয়ার জন্য সময়ের অভাব তার হয় না। কিন্তু সে কথা শান্তির সময়ে চলে। এখন জরুরি অবস্থায় সব কথা অচল। এখন শুধু ঐ কথাটা সত্যি– ঐ যে মোক্ষম কথাটা বুলা শুনিয়েছেন–আমরা কেউ এখন নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর চলছি নে। অবস্থা আমাদের চালাচ্ছে। তবু অবস্থাকে আয়ত্তে আনার জন্যই তো চলছে যতো দুর্মর সাধনা। তাই সময় নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা কাটিয়ে এখনি তো রুখে দাঁড়ানোর সময়। কিন্তু বুলার কোনো পরিচয়ই যে সুদীপ্তর জানা নেই।

সাতটা বাজতেই বুলা ভাত-তরকারি নিয়ে হাজির হলেন। স্নেহমমতাময়ী একজন বঙ্গ ললনা।—

'অধ্যাপক সাহেবকে একটু কষ্ট করতে হবে। এই অসময়ে চারটে খেয়ে নিতে হবে।'

'খেয়ে নিতে আর কষ্ট কি? আনন্দের সাথেই খাব।'

'আনন্দ আপনার কাছে খুব সস্তা মনে হচ্ছে। আমি কিন্তু সত্যিই আপনাদের কষ্ট দিয়ে খাওয়াব। এই দেখুন, তরকারি কিচ্ছু নেই।'

তবু খেতে কোনো কষ্ট হ'ল না সুদীপ্তর। ডাল আর সামান্য বেগুনের সাথে মাগুর মাছের একটা টুকরো। কিন্তু টুকরো এত ছোট করা সম্ভব? আঙুল কেটে যায়নি? না কাটেনি। তবে কাটতে পারতো। এবং কাটলেও কিছু করার ছিল না। বুলার তো দোষ নেই। সেই পঁচিশ তারিখের সকালে কেনা হয়েছিল দশটা মাগুর। আজকে আটাশ না, বেশিদিন হয়নি। এবং মাগুরগুলো বেশ বড়ো

সাইজেরই ছিল। কিন্তু কাল থেকে খাচ্ছে কতো লোক? সুদীপ্ত সেটা জানেন না। বাইরে যে ঘরটাতে তাঁরা আছেন, সেখানে থেকে এ বাড়িতে মানুষের সংখ্যাটিকে নির্ণয় করা যাবে না। কোনো শব্দ নেই– অথচ বাটির অভ্যন্তরে এখন বাস করছেন তেত্রিশ জন। গতকাল এসেছিলেন আঠারো জন। তার মধ্যে বারো জন আজ চ'লে গেছেন। এবং এসেছেন তার দ্বিগুণ, চব্বিশ জন।আর বুলারা তিনজন। তার উপরে সুদীপ্তরা পাঁচজন। এই সুদীপ্তদের নিয়েই যতো সমস্যা হয়েছে বুলার। সমস্যা হয়েছে বাচ্চা তিনটিকে নিয়ে। তাদের জন্য দুধ চাই। তা গুঁড়ো দুধের টিন প্রায় ভরতিই আছে। কিন্তু চিনি আছে অতি সামান্য। দুবেলা কম করে হ'লেও অমন তিরিশ-চল্লিশ কাপ চা হচ্ছে। তাতে কতো চিনি লাগে? বাচ্চাদের চিনি না হ'লে চলে? তাছাড়া, অমন, দুধের ছেলেরা—দুধের সঙ্গে পাকা কলা দিতে না পারলে বড়োদের কখনো তৃপ্তি হয়? ছেলে-মেয়েদের সামনে শুধু দুধ এনে ধরতে বুলার খারাপ লেগেছিল। কিন্তু এলা তাঁকে বাঁচিয়েছে। এলা ভাত খেতে চেয়েছে। বুলা শুনেছেন– এলা যেন বলেছে, অত কি দরকার মাসি। শুধু ডাল-ভাত দাও না। আমরা ডাল-ভাত খেয়ে থাকব।

কোনো মতে ডাল-ভাত খেয়ে এখন বাঁচলে হয়! এবং বাঁচতে হবেই। আর বাঁচতে হ'লে মরতেও হবে। মরতে শেখে নি যাঁরা, তারা বাঁচতেও শেখেনি।

'বাঙালিরা এখন মরতে শিখেছে, অতএব তাকে মেরে নিঃশেষ ক'রে দেবার ক্ষমতা এখন পৃথবীতে কারো নেই। জানবে, মৃত্যুকে ভয় ক'রে যারা মৃত্যুকে এড়াতে চায় তারাই মরে।'

দলপতি তাঁর দলের ছেলেদেরকে বুঝাচ্ছিলেন কথাগুলি। সকলেই জোয়ান ছেলে। কেউ ছাত্র, কেউ পুলিশ, কেউ ই.পি. আর-এর লোক। পঁচিশে মার্চের ভয়াবহ রাত্রির নারকীয় কাণ্ডের মধ্যে কোনো মতে যারা পালিয়ে বেঁচেছে এরা তাদের মধ্যে। না, এরা বুলাদিকে চেনে না। বুলাদির কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে এঁদের যোগ বিশেষ ছিল না। বুলা যে একটি গোপন বিপ্লবী সংস্থার সদস্য সে কথা জানেন এক দলপতি জামাল আহমেদ স্বয়ং। আর কেউ না। অবশ্যই জামাল আহমেদের রাজনৈতিক মত বুলাদির নয়– একজন ন্যাশনালিষ্ট হ'লে অন্য জন কমিনিষ্ট। জামাল সাহেব আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত। বুলাদির যোগ পূর্ব

বাংলার বেআইনী গোপন কুমিনিষ্ট পার্টির সঙ্গে। বিপ্লবে বিশ্বাসী জামাল সাহেবও এককালে কমিনিষ্টদের সঙ্গে অনেক উঠাবসা করেছেন– কমিনিষ্ট পার্টির কাজও করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসে যুক্ত হয়েছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে।

'জাতীয়তাবাদের চর্চা দেশে কিছুদিন চলতেই হবে, তারপর আপনিই সমাজতন্ত্রবাদের চাকা ঘুরতে শুরু করবে।'

জামাল সাহেবের এ মতের বিরোধিতা করে বুলা যুক্তি দেন–

'সারা বিশ্বে জাতীয়তাবাদ যখন মুমূর্ষু দশায় উপনীত, আমরা তখন তারই চর্চা শুরু করলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। চরম লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য হবে দেশের মানুষের ভাগ্যলিপি।'

'কিন্তু দেশটা আগে তো আমাদের হোক, তারপর এ সব তর্ক ওঠাবেন। এখন যখন দেশের এক বিপুল জনগোষ্ঠী কেবলই ধর্মের নামে পশ্চিমাদের ঔপনিবেশিক শাসনকে স্বাগত জানাচ্ছে তখন চিত্তের মোহমুক্তির জন্য জাতীয়তাবাদই হচ্ছে একমাত্র দাওয়াই।'

–এই ধরনের বিতর্ক জামাল আহমেদের সঙ্গে বুলাদির অনেক হয়েছে। কিন্তু সে সব অন্য দিনের কথা। নানা মতবাদ দেশের মধ্যে থাকবেই– একে অন্যের মতবাদ সম্পর্কে সহিষ্ণু হবে। এবং জনগণের সমর্থন যেদিকে যাবে, সেই পক্ষই আখেরে জয়ী হবে। কিন্তু এও তো গণতন্ত্রেরই কথা আর গণতন্ত্র ছাড়া শেষাবধি মানুষের পথই বা কই? একটা আছে লাঠির যুক্তি। সভ্যতার দাবি উপেক্ষা ক'রে একটা পক্ষ যখনই স্বেচ্ছাচারী হ'ল অন্য পক্ষের তখনই লাঠি ধরা ছাড়া পথ থাকে না। আজ বাঙালির সেই লাঠি ধরার দিন এসে গেছে। এইখানেই বুলাদি ও জামাল সাহেব এক।

পঁচিশে মার্চের পর বাংলাদেশের দল এখন দুটো– এক, সর্বপ্রকার অসম্মান শিরোধার্য ক'রে এখনো যারা পাকিস্তানের মোহকে চিত্তে পুষে রেখে পাঞ্জাবীদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে চায়। দুই, বাংলাদেশকে পুরোপুরি স্বাধীন দেখতে চায় যারা। জামাল সাহেব ও বুলাদি দু'জনেই একমত যে–

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আমরা যারা একমত তাদের এখন সম্মিলিতভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। মতাদর্শের পার্থক্য যা আছে সে নিয়ে বোঝাপড়া হবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর।'

তাই বুলাদি এখন জামাল সাহেবের সহায়ক।

বুলাদি গোপন কমিউনিষ্ট পার্টির একজন অসাধারণ কর্মী। ঢাকা শহরের অনেকেই তাঁকে চেনে না আবার যারা চেনার তারা ঠিকই চেনে। বাইরে তিনি একজন নিরপরাধিনী শিক্ষয়িত্রী, অত্যন্ত সংযত শোভন ব্যবহার,কারো সাতে-পাঁচে নেই। বোরখা প'রে বাইরে বের হন, বাইরে তিনি জামাতে ইসলামের সমর্থক। মেয়েদের মধ্যে জামাতে ইসলামের পুস্তিকা ইত্যাদি

বিতরণের জন্য রাশি রাশি বান্ডিল আসে তাঁর কাছে। তিনি সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে বুড়ো মায়ের জন্য দুধ গরম করেন। সরকারী মহলের কোনো সন্দেহ এঁর বাড়ির ত্রিসীমানাও ঘেঁষে না। এবং সেই সুবিধাটুকুর পুরো সদ্ব্যবহার করেন পাকিস্তান সরকারের সন্দেহভাজন বাঙালি দেশকর্মীগণ। জামাল সাহেব গতকাল থেকে সে সুবিধাটুকু না পেলে অনেকখানি বেকায়দায় পড়তেন বৈকি। কাল থেকে তিনি পুলিশ–ই.পি.আর ও ছাত্রদের যতো জনকে পেয়েছেন ঢাকা শহরের বিভিন্ন বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন, এবং সুযোগ বুঝে পার করে দিচ্ছেন মফঃস্বলের বিভিন্ন এলাকায়। সেখানে এদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হবে। হাঁ, সরাসরি যুদ্ধই করতে হবে। যুদ্ধের ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা যখন তারা বোঝে না তখন আর উপায় কী?

সুদীপ্তরা আসার মাত্র দশ মিনিট আগে জামাল সাহেব এসেছেন এ বাড়িতে। তার আগেই একজন দু'জন ক'রে তেইশ জনকে পাঠিয়েছেন। সে এক অদ্ভুত কৌশল। একটা কোড নম্বর শিখিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়– সেই নম্বর বললে জায়গা মেলে বাড়িতে। কিন্তু সুদীপ্তরা তো কোন কোড নম্বর নিয়ে আসেননি। তদুপরি এসেছেন জামাল সাহেবের আগমনের প্রায় পরে পরেই। কে জানে জামাল সাহেবের পেছনে পেছনে কোনো গুপ্তচর এল কিনা! কিন্তু সঙ্গে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে। এইভাবে কোনো গুপ্তচর আসে নাকি! কি জানি বাবা, দেশের যা অবস্থা। কিছুই তো বলা যায় না। বিশেষ ক'রে জামাল সাহেব এই তো এলেন। –এইসব ভাবনা থেকেই তো বাইরের এই অন্ধকূপে বসিয়ে রাখা হয়েছে সস্ত্রীক সুদীপ্তকে।

কিন্তু বুলার মনে সন্দেহ বিশেষ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তো বহু জনেরই চেনার কথা। নিজেকে সেই অধ্যাপক ব'লে পরিচয় দিতে যাবে' এমন গবেট হ'লে গোয়েন্দাগিরি করা যায় না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্র ছিল ওই বাড়িতে। আড়ালে থেকে সুদীপ্তকে তারা দেখল। এবং চিনতে পারল না। তা হ'লে? তা হলেও বুলা তাদেরকে সন্দেহ করলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিও তো এককালে পড়েছেন। পড়তেন পদার্থবিদ্যা নিয়ে। কিন্তু কলাবিভাগের ক'জন শিক্ষককে তিনি চিনতেন। ছাত্র দুজনেরও একজন ভূগোলে, একজন রসায়নে। ইংরেজির অধ্যাপককে না চেনা তো খুবই সম্ভব। তাঁর যুক্তি কেউ অস্বীকার করতে পারল না। কিন্তু অস্বীকার না করলেও তো কথা থাকে। এতোগুলো যে লোক এখানে আছে তাদের সম্পর্কে সরকারি মনোভাবটা কি? এরা সবাই সরকারি দৃষ্টিতে প্রচণ্ড দেশদ্রোহী না? পেলে সকলকে সার ক'রে দাঁড়িয়ে দিয়ে গুলি ক'রে মারবে। তাই এদের সম্পর্কে একটু অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে বৈ কি। সহসা এদের মধ্যে কোনো অচেনা ভদ্রলোককে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি?

তা বটে। তবু কি কারফিউ–এর সময় কাউকে পথে বের করে দেওয়া

যায়? বিশেষ করে পাশের বাড়ির জমিলা খালাদের জামাই। কথাটা সত্য হওয়া খুবই সম্ভব। তাঁর এক বোনের জামাই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন—জমিলা খালা প্রায়ই বলতেন। তবে পরিচয় হয়নি। তার কারণ যে তিন মাস হ'ল বুলারা এ বাড়িতে এসেছেন সেই তিন মাসের মধ্যে আমিনা মাত্র দুবার এসেছিলেন তার খালার বাড়ি। এবং একবার ছিলেন মাত্র ঘন্টা খানেক, সেবার খালাদের নতুন প্রতিবেশীর সাথে আলাপের সময় ছিল না। দ্বিতীয়বার স্বামী সন্তানসহ একটা পুরো দিন আমিনা এখানে কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু সেদিন আবার বুলারা গিয়েছিলেন মানিকগঞ্জে দেশের বাড়িতে। অতএব তারা বুলাদের অপরিচিতই থেকে গেছেন।

কিন্তু সুদীপ্ত যে খোদ জামাল সাহেবেরই পরিচিত ব্যক্তি। সেটা জানা গেল বেশ দেরিতে। ভদ্রলোকদের যখন এ বাড়িতে থাকতেই দিতে হবে তখন একটু বাজিয়েই দেখা যাক। জামাল সাহেব ভেবেছিলেন। কিন্তু এ কী! এ যে সেই ফিরোজের বন্ধু। সেই নির্ভেজাল অধ্যাপকটি যে! কিন্তু অধ্যাপক সাহেব জামালকে চিনলেন না। কারণ পাজামা-চাপকান পরিহিত ও নকল গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত জামাল আহমদকে সুদীপ্ত কেবল কোরাইশী নামেই জানতেন। অবশ্যই 'কোরাইশী' জামাল সাহেবের পৈত্রিক পদবী। কিন্তু নিজে কখনো তিনি নামের পরে কোরাইশী লেখেন না। তবে ছদ্মবেশ নিলে জামাল সাহেব বন্ধুমহলে পারভেজ কোরাইশী হয়ে যান। কিন্তু জামাল সাহেবকে দেখে পারভেজ কোরাইশীকে কল্পনা করা ঝানু গোয়েন্দার পক্ষেও ছিল অতি কঠিন কর্ম। ইচ্ছে করেই জামাল সাহেব সুদীপ্তর কাছে তার পারভেজ কোরাইশী পরিচয়টিকে গোপন রাখলেন। এবং আলাপ শুরু করলেন নীলক্ষেত এলাকার এক ভদ্রলোকের প্রসঙ্গ তুলে। সুদীপ্ত বিস্মিত হলেন—

'তাকে চেনেন নাকি। কিন্তু তিনি ভাগ্যবান। আগেই দেশে চলে গেছেন।'

'তিনি যান নি। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল।'

এইরকম একটা অবস্থা যে আসছে সেটা কিছু আগেই জামাল সাহেবরা আঁচ করেছিলেন। সেই জন্য বিভিন্ন জেলায় কর্মসূচী স্থির ক'রে লোক পাঠানো হচ্ছিল। মনে হচ্ছে, আর-কোন পথ না পেয়ে ওরা এবার গায়ের জোর দিয়ে বাঙালিকে পদানত করতে চাইবে। যদি তাই হয়, তার যথোচিত উত্তর এবার দিতে হবে। জোর যার মুল্লুক তার? ঠিক আছে, বাঙালির জোরটাই এবার তবে দেখো। বাঙালি গায়ের জোরের চেয়ে মনের মায়া-মমতাগুলোকেই এতোকাল বেশি মূল্য দিয়ে এসেছে। তার ফলে যদি তাকে মার খেয়েই যেতে হয় চিরদিন? না। সেটা মেনে নেওয়া যায় না। মার এতোকাল কাউকে দিই নি ব'লে কোনো কালেই দেব না! আমরা প্রস্তুত। মরতে প্রস্তুত। মারতে প্রস্তুত।

সুদীপ্ত একটি প্রশ্ন করলেন–

'আপনারা যদি বুঝেছিলেন, এমন অবস্থা সৃষ্টি হ'তে যাচ্ছে তা হ'লে সে

সম্পর্কে আমাদেরকে পূর্বাহ্নেই কিছুটা আভাস দিলেন না কেন। তা হ'লে নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে বাঁচতাম।'

'এই অভিযোগ শুধু আপনার কেন, আমারও। আমরা অবস্থাটা আঁচ করলাম অথচ জনসাধারণকে সে সম্পর্কে হুঁশিয়ার ক'রে দেবার প্রয়োজন অনুভব করলাম না কেন? কেন জানেন। বহু বর্বরতা বাঙালি দেখেছে, কিন্তু এবারের বর্বরতা সব কিছুকে হার মানায়। আমাদের কল্পনা হার মেনেছিল।'

জামাল সাহেবদের কল্পনা ছিল সুসভ্য ভদ্রলোকের কল্পনা। আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য এবং যাদের নিয়ে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধে নামতে হবে কেবল তাঁদের উপরেই প্রতিপক্ষের সশস্ত্র হামলা প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁরা। তাঁরা একটা সাবধান বাণী প্রত্যাশা করেছিলেন। নিশ্চয়ই চরম ব্যবস্থা কিছু নেবার আগে প্রেসিডেন্টের কোনো একটা ঘোষণা প্রচারিত হবে। তাতে নতি স্বীকারের হুমকি থাকবে– এবং নতি স্বীকার না করলে তখনই..........। সত্যিই তো, একটুও সতর্ক না ক'রে নিরস্ত্র মানুষকে কোন সশস্ত্র বাহিনী আক্রমণ করে এমন শুনেছ কখনো?

'তা ছাড়াও, জামাল সাহেব বললেন, 'ওরা যে ঘরে ঘরে ঢুকে মানুষ মারবে, রাতের আঁধারে এসে ঘুমন্ত পল্লীকে জ্বালিয়ে দেবে এ সব ছিল আমাদের কল্পনারও অতীত। এইসব বীভৎসতার শতকরা একভাগ মাত্র কল্পনা ক'রেই তা থেকে স্বদেশবাসীকে বাঁচাবার জন্য সে রাতে মুজিব ভাই ধরা দিয়েছিলেন।'

'এখন মনে হচ্ছে, তিনি ধরা না দিলেই ভালো হ'ত।'

কিন্তু ঢাকা শহরে এখন জোর গুজব, মুজিব ভাই ধরা দেন নি। অবশ্য গুজবটাকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ সুদীপ্তর ছিল না। তিনি বরাবর ছিলেন ফিরোজের সঙ্গে, এখন জামাল সাহেবের সঙ্গে –এঁরা দু'জনেই শেখ মুজিবুর রহমানের কাছের মানুষ। বিশেষ ক'রে জামাল সাহেব মুজিব ভাইয়ের চরিত্রকে ভালো ক'রেই চেনেন। অতএব বিপ্লবের নেতৃত্বদানের জন্য গোপনে শহর ত্যাগ করবেন এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। গণতন্ত্রসম্মত রাজনীতিটুকুই তাঁর জানা। এবংএখন যখন সেই গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে তখন পরবর্তী দায়িত্ব এসে চেপেছে আমাদের উপরে। জামাল সাহেবের চিন্তায় কোন জটিলতা নেই। এবং জামাল সাহেবেরও ধারণা –মুজিব ভাই ধরা না দিলেই ভালো করতেন।

'তিনি যে ভেবেছিলেন, তাঁকে পেলে ওরা আর সাধারণ মানুষকে মারবে না, সেটা এই দু'দিনেই মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তা ছাড়া তিনি আজ বাইরে থাকলে আমাদের কাজ কতো সহজ হ'ত।'

'কিন্তু ভবিষ্যতে প্রমাণিত হবে, তার রাজনৈতিক দর্শন অনুসারে তিনি ধরা দিয়েই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন'–ব'লে উঠলেন বুলা।

তাই তো বুলা এসে দাঁড়িয়েছেন। দু'জনের কেউ তারা টের পান নি। সেই যে খানিক আগে জামাল সাহেবকে সঙ্গে এনে সুদীপ্তর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছেন সেই অবধি ঘরে তারা দু'জনেই ছিলেন। বুলা যাবার সময় আমিনা ও তাঁর সন্তানদের সঙ্গে করে ভেতরে নিয়েছিলেন।

'আসুন দিদি, আপনাদের শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিই গে।'

এই সন্ধ্যাবেলায়? বিস্মিত হয়েছিলেন আমিনা। কিন্তু অনেকক্ষণ এই অন্ধকূপের মতো ঘরে কাটিয়ে তিনি এতোই অস্থির ছিলেন যে, অন্যত্র যাবার প্রস্তাবে তিলমাত্র প্রশ্নও তোলেন নি। বুলাকে অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু সুদীপ্তকে এই ঘরে ফেলে যাওয়াটা স্বার্থপরতা নয়? না, ঠিক এই প্রশ্নটাই বেলার মনে ছিল না। তবু এই ধরনের একটা অনুভূতি তার শিশুচিত্তে ছিল। সে ব'লে উঠেছিল—

'মা, আব্বু।'

'উনি এখন মানুষের সাথে কথা বলছেন, দেখছ না।'

হাঁ, সুদীপ্ত এখন গল্প করার লোক পেয়ে গেছেন। আব্বাকে ফেলে যেতে তার মন কেমন করছে। মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে সে বলেছিল–

'আমি আব্বার কাছে থাকি আম্মু।'

বেলার দিক থেকে কথাটা খুবই সিরিয়াস ছিল। তবু সকলে সেটা খুবই হালকাভাবে নিলেন। অন্য সময় হলে হাসতেন। কিন্তু এখন সহজে হাসি আসতে চায় না।

আমিনা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভেতরে গিয়ে দেখেন, ও মা এ কি এলাহী কাণ্ড! এতো মানুষ বাড়িতে! এতোগুলো মানুষের এতো কাছাকাছি তাঁরা এতোক্ষণ ছিলেন। অথচ এতো দূরে!

'আপনি ভীষণ ডেন্‌জারাস্‌ মেয়ে দেখি,' বহু মানুষের দেখা পেতেই আমিনার মধ্যে স্বাভাবিকতা ফিরে এল –'এতো মানুষের বাড়িতে আমরা ছিলাম,অথচ এতো একাকী!'

সামান্য একটু হাসলেন বুলা। বললেন—

কোয়ার‍্যানটীনে রেখেছিলাম, বুঝলেন না!

আমিনাকে তাঁর ফুফু–আম্মার ঘরে দিয়ে বুলা ফিরে গেলেন। দু'তালার ঘর, কোনো খাট কিংবা তক্তপোষ কিছু নেই। সারা মেঝেতে বিছানা পাতা। ওইখানে মেয়েরা থাকবেন। নিচে দু'খানা ঘরে থাকবেন পুরুষেরা। থাকবেন মাত্র এই এক রাত্রির জন্য।

বুলা নীচে এসে খবরটা দিলেন—

'চারপাশে ঢাকা শহর জ্বলছে।'

সঙ্গে সঙ্গে সুদীপ্তকে নিয়ে জামাল সাহেব ছাদে চ'লে গেলেন। এ দুজনেই কেবল গেলেন, অন্যদের খবরটা দেওয়া হয়নি। এতো আগুন না দেখাই ভালো। এখনো এতো আগুন? গত তিন রাত সমানে জ্বালিয়ে পুড়িয়েও কি ঢাকা শহর শেষ হয়নি! জামাল সাহেব বললেন–

'ঐ আগুনটা শান্তিনগরের দিকে মনে হয়!'

'শান্তিনগরের বাজার হতে পারে।'

'ঠিক ধরেছেন।' জামাল সাহেব বললেন, 'আজ ওই বাজারে লুট হয়ে গেছে খবর পেয়েছি। লুটপাট করে নিয়ে এখন ওখানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।'

তা হ'লে লুট হয়ে যাওয়ার খবর জামাল সাহেবও জানেন। সুদীপ্ত বললেন–

'লুটপাট না হয় করল। কিন্তু আগুন দিল কেন?'

'ওখানেই তো মজা। কালই দেখবেন, ওরা রেডিওতে প্রচার করবে, আমরা আওয়ামী লীগের লোকেরা ওই বাজারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি।'

'কিন্তু এই মিথ্যাচারে ওদের লাভ?'

লাভ? বুঝতে পারলে না অধ্যাপক। এই জন্যই অধ্যাপক হয়েছ। শয়তানদের মতলব বুঝবে সেই সাধ্য যদি তোমাদের থাকত! জামাল সাহেব বুঝিয়ে দিলেন–

'প্রথম লাভ, বিনা পয়সায় অত গম, চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি পেয়ে গেল ওরা। বঙ্গাল মল্লুকে আপনাদের মারতে এসে পয়সা খরচ করে খেতে হবে নাকি! দ্বিতীয় লাভ, জিনিসপত্র যে লুটপাট হয়ে গেছে সেটা বলতে হল না। তা হ'লে আর্মির অকর্মণ্যতা প্রমাণিত হয়। তৃতীয় লাভ,ভয় দেখানো হ'ল আপনাদের। চতুর্থ লাভ, আওয়ামী লীগের লোকেরা যে গুণ্ডা-বদমায়েশ এটা প্রচার করা গেল। পঞ্চম লাভ, খাদ্যের অভাব সৃষ্টি করা হ'ল।'

শিক্ষকতা করলে মানুষের দৃষ্টিশক্তির একটা দিক অসাড় মেরে গিয়ে মানুষ বোধ হয় কিছুটা বোকা হয়ে যায়। সুদীপ্ত সেই বোকামীর পরিচয় দিলেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন–

'খাদ্যের অভাব সৃষ্টি করলে তো সরকারেরই অসুবিধা। সে কাজ তারা করবে কেন?'

'এই জন্য করবে যে, ওই সরকার এখন আর আপনাদের সরকার নয়। আপনাদেরকে গায়ের জোরে পদানত রাখা ছাড়া সরকারের গত্যন্তর নেই। অতএব খাদ্যাভাব সৃষ্টি করতে পারলে সরকারের এখন ভাল হবে দু'দিক থেকে। কল্পনা করতে পারেন সেই দুটো দিক কি কি?'

'না, আপনি বলুন।'

'প্রথমতঃ খাদ্যাভাবে আপনারা দুর্বল হয়ে পড়বেন। তখন আর লড়াইয়ের ক্ষমতা থাকবে না। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেন। দ্বিতীয়তঃ যে সকল খাদ্য এখন তারা লুট ক'রে নিয়ে রেখে দিচ্ছে, পরে তা থেকে কিছু কিছু আপনাদের ক্ষুধার মুখে তারা তুলে দেবে। এইভাবে তারা আপনাদের উপকার করবে। আপনারা উপকৃত হবেন। এবং উপকৃত ব্যক্তির মানসিকতা লাভ করবেন।'

'অর্থাৎ কৃতজ্ঞ থাকব ওদের কাছে।'

'ঠিক তাই। দেখছেন না, যে অবস্থা ওরা সৃষ্টি করেছে তাতে আমাদের সামনে পথ এখন দুটি– হয় বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে হবে, না হয় ওদের দান হাত পেতে নিয়ে অসম্মানের জীবনে আধমরা হয়ে বাঁচতে হবে।'

জামাল সাহেবের যুক্তি, সুদীপ্তর মনে হ'ল, অকাট্য ও অভ্রান্ত। একটু ভেবে বললেন–

'কিন্তু যে ঘৃণা ওরা আমাদের মনে সৃষ্টি করল কোনো দিন তা কি আর প্রীতিতে রূপান্তরিত হবে?'

'হল না হ'ল বয়েই গেল। শুধু চাই মদ-মাগী ও হালুয়া-রুটির ব্যবস্থা। সেজন্য পূর্ব-বাংলাকে শোষণ অব্যাহত রাখতে হবে। প্রীতি চাইলে শোষণ চলে না–এটুকু বুদ্ধি ওদের আছে।'

তা আছে। এবং এই বুদ্ধির তারিফ করতে হয় বৈ কি। প্রীতি-ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলেই সামনে মর্যাদার প্রশ্ন উঠে। অতএব ওইসব ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না? হরিণকে যেখানে হত্যা করে মাংস খেতে হবে সেখানে কি প্রীতিমন্ত্র আওড়ালে চলে? সেখানে চাই রাইফেল।

সেই রাইফেল নিয়ে ওরা পূর্ব বাংলায় নেমেছে সেই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দেই। নেমেছে মৃগ-শিকারে—স্বর্ণমৃগ। কিন্তু স্বর্ণমৃগের সন্ধানে বেরুলে গৃহলক্ষ্মী সীতাকে হারাতে হয় না। কিন্তু সীতা থাকলে তো তাকে হারাতে হবে! সীতা থাকেন সুসভ্য মানুষ রামচন্দ্রের ঘরে। কোনো অসভ্য বা অর্ধ-সভ্যের ঘরে সীতা থাকবেন কী ক'রে এবং কোনো অর্ধ-সভ্য জোর ক'রে সীতা হরণ করতে গেলে তার পরিণতি কি হয়?--------

—আপনারা স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর শুনছেন........

স্বাধীন বাংলা? সচকিত হলেন সুদীপ্ত। বুলা কখন ট্রানজিস্টর নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সেই ট্রানজিস্টরে স্বাধীন বাংলার বাণী বেজে উঠল। মা ভৈঃ। আর ভয় নেই। স্বাধীন বাংলার বাণী এখন বাংলার আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রানজিস্টরে কান পাতলেই তা শোনা যাবে।

সকল বঙ্গবাসি! তোমরা শোনো! অবশ্যই এখনো কণ্ঠ খুব ক্ষীণ,হয়ত এখনই দেশের আকাশ সীমা ছাড়িয়ে দূরান্তে পৌছানোর ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু সেই ক্ষমতা পেতে কি তার খুব দেরী হবে? ট্র্যানজিস্টারে খবর শেষ হয়ে গান শুরু হ'ল— আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।...

হ্যাঁ, এই ভালোবাসাই বাঙালিকে পথ দেখাবে। বাঙালির অস্ত্রের শক্তি আজ সীমিত হতে পারে, কিন্তু ভালোবাসার সম্পদ তো অফুরন্ত। সেই প্রীতি ভালোবাসার সঙ্গে এবার অস্ত্রের সম্মেলন হয়েছে—এবার বাঙালি দুর্জয়।...

অনেক রাতে সুদীপ্ত শুতে গেলেন। মেঝেতে ঢালাও বিছানা। সারি সারি তাঁরা শুয়েছেন যতো জনের শোয়া সম্ভব। আর এদের একজনকেও তিনি চেনেন না। সব থেকে বেশি চেনেন জামাল সাহেবকে, কিন্তু সে পরিচয়েই সূত্রপাত হয়েছে মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে। হ্যাঁ, ঠিকই, তো হয়েছে। নব পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছে। পুরোনো জীবনটা সেই পঁচিশের রাতেই লয় পেয়েছে। আহা তাই সত্য হোক। নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাত। সে আর কতো দূরে। বেশি দূরে হ'তে পারে না। মাত্র এই রাতটুকু তো! মা ভৈঃ। কেটে যাবে।